যে দেশ মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ ঘর্ঘরনদ প্রবাহিত হইতেছে, যে নদকে কোন কোন পণ্ডিত ব্রহ্মপুত্র বলিয়া থাকেন, তাহার পূর্ব্বদিকে অত্যুচ্চ ভূমিতে তাহারা উৎসাহের সহিত নয়খানি পর্ণনির্ম্মিত গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন। গৃহের চতুর্দ্দিকে ভল্লাতক, আম্রাতক, বিল্ব, বারুণ, প্লক্ষ, ধাত্রী, কদম্ব, হিজ্জল, অশোক, আম্র, জম্বু, কিংশুক প্রভৃতি গ্রাম্য বৃক্ষ সকল শোভা পাইতে ছিল।

সেই দেশ বর্ষাকালে জলমগ্ন থাকে, গমনাগমনের পথে প্রচুর জল হয়। ইহা দেখিয়া, তাহারা একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইবার জন্য কদলী বৃক্ষের দ্বারা ছোট ও বড় নানাপ্রকার ভেলা নির্ম্মাণ করিলেন। তাহারা বাঁশ, বেত, মুঞ্জা, কন্দুল, ও কাশ দ্বারা অতি দৃঢ় গৃহ সকল নির্ম্মাণ করিলেন।

প্রাচীন কোটালীপাড়ের অবস্থা আর এখন নাই, উহা এখন ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। এখন, সেখানে বর্ষাকালে গমনাগমনের বিশেষ সুবিধা না হইলেও বহু রাস্তা, খাল, পোষ্টাফিস, থানা, সবরেজিষ্টারী আফিস্, স্কুল, এবং কয়েকটী চতুষ্পাঠী ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বেও সেখানে পাণ্ডিত্যের জ্যোতিঃ বঙ্গদেশকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল। তন্মধ্যে নৈয়ায়িক—৺মহামহোপাধ্যায় রামনাথ সিদ্ধান্ত পঞ্চানন, ৺জয় নারায়ণ তর্করত্ন, ৺তারিণীচরণ শিরোমণি, ৺চন্দ্রকান্ত ন্যায়ালঙ্কার, ৺শশিকুমার শিরোরত্ন ও ৺আশুতোষ তর্করত্ন প্রভৃতি, স্মার্ত্ত—৺নীলকান্ত তর্কবাগীশ ও ৺বিশ্বেশ্বর তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি, পৌরাণিক ও বৈয়াকরণ ৺কাশীচন্দ্র বাচস্পতি, ৺দুর্গাধন চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি পণ্ডিতগণের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। বলা বাহুল্য, পূর্ব্বাবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে "প্লবঙ্গহীনঃ" ইহারও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন বানরের উৎপাতে সেখানে বাস করাই দুরূহ। পূর্ব্বে স্থান বিশেষে সীমাবদ্ধ থাকিলেও, এখন প্রায় সর্ব্বত্রই বানরের উপদ্রব বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। তবে, অন্য বন্য

পশুর কোন উপদ্রব নাই। বর্ত্তমানকালে, অনতিক্রমণীয় অবিদ্যার ন্যায়, "কচুরীপানা" কোটালীপাড়াকে অবরোধ করিয়া রাখিয়াছে।

এই কোটালীপাড়া বর্ত্তমান ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত সুপ্রতিষ্ঠিত একটী পরগণা বিশেষ। এই স্থান পূর্ব্বে বর্ত্তমান বরিশাল জেলা বা বাখরগঞ্জের অন্তর্ভুক্ত ও বাকলা চন্দ্রদ্বীপের রাজার অধীন ছিল বলিয়া, বাকলা সমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই স্থানটী চতুর্দ্দিকে সলিলবেষ্টিত দ্বীপের ন্যায়, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও নানাবিধ গ্রাম্য ফল, বিমল পানীয় জল, অনায়াস লভ্য খাদ্য দ্রব্য এবং উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্যের জন্য মহানুভব পুরন্দরাচার্য্যের চিত্তবৃত্তি আকর্ষণ করে। তিনি রুচিকর ও মনোনীত এই দেশের প্রশস্ত ক্ষেত্রে "ঊনবিংশতি" বা "ঊনশীয়া" নামক গ্রামে বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়া, পরম সুখে, নির্ভয়ে, ধর্ম্ম ও শাস্ত্র চর্চ্চার সহিত সসম্মানে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার বহু শিষ্য শাখা ছিল। তিনি ধন সম্পদেও নিতান্ত হীন ছিলেন না। তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ অদ্যাপিও তাহার সাক্ষী দিতেছে।

নিষ্ঠাবান্ ও নানাশাস্ত্রকুশল আচার্য্যস্থানীয় এই সকল ব্রাহ্মণেরা যে দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহার ফল ক্রমে পরিপক্ক হইতে লাগিল। ধার্ম্মিক, সদাচার সম্পন্ন, নানাবিদ্যাবিশারদ মনীষিগণ, তপোভ্রষ্ট ঋষির ন্যায়, এই পবিত্র বংশে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিতে লাগিলেন।

পুরন্দরাচার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা পুত্র সম্পদেই ভাগ্যবান্ ছিলেন। মূর্ত্তিমান্ ষড়্‌দর্শনের ন্যায় তাঁহার ছয়টি পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তিনি কত পুণ্যবলে সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেবের ন্যায় জগদ্বিখ্যাত এই সকল পুত্ররত্ন লাভ করিয়াছিলেন, তাহা কে বলিতে পারে? তাহার পুত্রগণের নাম—

১। শ্রীনাথ আচার্য্য চূড়ামণি। ২। যাদবানন্দ ন্যায়াচার্য্য। ৩। পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য যতিবর মধুসূদন সরস্বতী। ৪। বাগীশ গোস্বামী। ৫। জগদানন্দ তর্কাচার্য্য। ৬। রাম নারায়ণ ভট্টাচার্য্য।

পুরন্দরাচার্য্য একটী প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা খনন করেন, তাহা অদ্যাপি "পুরন্দরের দীঘী" নামে প্রসিদ্ধ আছে। এই দীঘী সম্বন্ধে একটী অদ্ভুত কিংবদন্তী আছে। তাহা এই ;—

পুরন্দরাচার্য্য একটী প্রকাণ্ড দীঘী খনন করাইলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! বহু চেষ্টাতেও তাহাতে জল উঠিল না। পরে, তিনি নানা দেব-দেবীর অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইলেন, দীর্ঘকালব্যাপী বরুণ মন্ত্র জপ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কোন ফলোদয় হইল না। পরে, একদিন স্বপ্নাদেশ হইল, "তোমার কোন পুত্র যদি অশ্বারোহণে দীর্ঘিকা মধ্যে প্রবেশ করে, তবে জল উঠিবে"। ধ্যানমগ্ন ঋষির ন্যায়, এই স্বপ্নাদেশ তাহার হৃদয়ে সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইল। তিনি পুত্রগণের নিকট এই স্বপ্নবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন। ছোট পুত্রটী সকলের অগ্রেই "আমি যাইব" বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। পরে অশ্বের অনুসন্ধান করিয়া, অশ্বারোহণে কনিষ্ঠ পুত্র দীর্ঘিকা-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কি দৈব মহিমা! তখনই হিমালয়ের প্রস্তরভেদী গঙ্গাপ্রবাহের ন্যায় কোথা হইতে প্রবল তরঙ্গমালা বিস্তার করিয়া,মুহূর্ত্তকাল মধ্যে কলকলনাদে নাচিতে নাচিতে স্বয়ং দ্রবময়ী জগন্মাতাই যেন আবির্ভূত হইয়া দীর্ঘিকাকে পূরণ করিলেন, এবং এই সঙ্গে ঘোটকের সহিত পুরন্দরের প্রিয় কনিষ্ঠ পুত্রকেও যেন নিজ ক্রোড়ে টানিয়া লইলেন। বহু অনুসন্ধান করিয়াও ঘোটক বা পুত্রের কোন সন্ধানই মিলিল না। সকলে হাহাকার রবে মেদিনী পূর্ণ করিয়া বিষণ্ণ মনে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

কোন বৃদ্ধের মুখে শুনিয়াছি যে, দীঘির উৎসর্গ কার্য্য সম্পাদিত হইলে, পুরন্দরের কনিষ্ঠ পুত্র ধেনুর পুচ্ছ ধরিয়া পরপারে যাইতে ছিলেন। দেখিতে দেখিতে অকস্মাৎ তিনি জলমগ্ন হইলেন। বহু অনুসন্ধানেও তাহাকে আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। যাহা হউক, পুরন্দরাচার্য্য যে নিজের প্রাণপ্রতিম কনিষ্ঠ পুত্রের বিসর্জ্জন দিয়া, সর্ব্বভূতের জন্য উৎকৃষ্ট পানীয় জলের ব্যবস্থা

করিয়া উদারতা ও মহত্ত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

রাঘবেন্দ্র কবিশেখর লিখিয়াছেন—

"শ্রীরামমিশ্রান্বয়সম্ভবো যঃ পুরন্দরাচার্য্য ইতি প্রসিদ্ধিঃ
স দীর্ঘিকাং দীর্ঘতয়া চখান সা চাতিখাতা ন পয়োঽন্বিতাসীৎ ॥

সুদুঃখিতঃ সংক্রমতোঽধিমাসং জজাপ মন্ত্রং বরুণস্য বিদ্বান্।
স্বপ্নাগমস্তেঽবরজঃ সুতোযস্তস্যাগমে বারি ভবিষ্যতীহ ॥

স্বপ্নং নিশম্যাথ পিতুশ্চ পুত্রোঽয়াভিরূঢ়ঃ কিল দীর্ঘিকায়াং।
বিবেশ সদ্যোবহুজীবনোঽভূত্তেনৈব তজ্জীবনমাপ নাশং ॥

পুরন্দরস্যানুজ এক আসীৎ সরস্বতী শ্রীমধুসূদনাখ্যঃ।
অসার সংসার-বিরক্তবুদ্ধিঃ কাশ্যাং স দণ্ড্যাশ্রমমাবিবেশ ॥

জ্ঞানপ্রবীণঃ পরমার্থবেত্তা শিষ্য-প্রশিষ্যৈঃ সমুপাস্যমানঃ।
গ্রন্থাননেকান্ বিরচয্য কালে স যোগযুগ্ ব্রহ্মণি সংবিলিল্যে ॥

পুরন্দরেনাপি পুরা নিযুক্তঃ সমিৎ-কুশাদ্যাহরণে করঙ্গঃ।
ভরদ্বাজঃ স কিলাসীদ্ যজুর্বিদদ্যাপি তদ্বংশধরাঃ করঙ্গাঃ ॥"

ইত্যাদি।

পুরন্দরাচার্য্য যে কেবল একজন অসাধারণ পণ্ডিত ও সমৃদ্ধ গৃহস্থ ছিলেন তাহা নহে, তিনি একজন প্রসিদ্ধ সাধকও ছিলেন। তিনি বহু অর্থ ব্যয়ে নির্জন অরণ্য মধ্যে তপঃ সিদ্ধির জন্য ৺কালী মাতার প্রতিষ্ঠা করেন। সেই কালী আজিও "পুরন্দরের কালী" বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। তাঁহার বংশধরেরা নিজ হস্তেই ঐ ৺কালীমাতার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন

পুরন্দরাচার্য্যের নিত্য নৈমিত্তিক দেবার্চ্চনা ও যজ্ঞাদি কার্য্যের উপযোগী

সমিৎ, কুশ ও পুষ্পাদি আহরণের জন্য একজন ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ নিযুক্ত ছিলেন, তাহার বংশধরেরা "করঞ্জ ভরদ্বাজ" নামে প্রসিদ্ধ।

ইনি নানা শাস্ত্রের অধ্যাপনায় ও ধর্ম্মোপদেশে প্রাবীণ্য লাভ করিয়া "আচার্য্য," গৃহস্থ হইয়াও জিতেন্দ্রিয় বলিয়া "ব্রহ্মচারী", এবং সাধারণকে প্রমুদিত অর্থাৎ হৃষ্ট বা আনন্দিত করিতে পারিতেন বলিয়া "প্রমোদন" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। এজন্য তিনি "আচার্য্য ব্রহ্মচারী প্রমোদন পুরন্দরাচার্য্য" নামে খ্যাত হন।

যাদবানন্দ ন্যায়াচার্য্য।

ইনি নানাশাস্ত্রাচার্য্য পুরন্দরাচার্য্যের দ্বিতীয় পুত্র। ইহার বংশাবলী ন্যায়াচার্য্যের সন্তান বলিয়া প্রসিদ্ধ। বৈদিকসমাজে ইহাদের বিশেষ সম্মান অদ্য পর্য্যন্ত ও বর্ত্তমান আছে। ইহার বংশাবলীও বিস্তৃত। এই বংশে অনেক খ্যাতনামা পণ্ডিত ও সাধক জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার সম্বন্ধে একটী কৌতুহলজনক কিংবদন্তী আছে। তাহা এই—

যাদবানন্দ নবদ্বীপে মধুসূদনের সহিত মিলিত হইয়া, ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। পরে বাটী আসিয়া পিতার আদেশে মধুসূদনকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য ৺কাশীধামে গমন করেন। তিনি নিখিলগুণ-নিলয়, স্নেহেরআধার, মধুসূদনকে ফিরাইয়া আনিতে অকৃতকার্য্য হইয়া বিষণ্ণ-বদনে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন, এবং জপ, তপস্যায় জীবন অতি-বাহিত করিবার সঙ্কল্প করিলেন। তিনি আর দারপরিগ্রহ করিলেন না। জপ, হোম ও পুরশ্চরণে সর্ব্বদা ব্যাপৃত রহিলেন। পুরন্দরাচার্য্যের একজন ফুলতোলা ব্রাহ্মণ ছিল, সে রোজ পুরন্দরের পূজার ফুল যোগাইত।

তাহারা বৈদিক হইলেও বৈদিকসমাজে তাহাদের বিশেষ কোন মর্য্যাদা ছিল না। এই ব্রাহ্মণের একটী কন্যা ছিল। ঐ কন্যাটী প্রায়ই পিতার সহিত পুরন্দরের বিস্তৃত ফুল বাগানে ফুল তুলিতে আসিত। সে ঐ ফুল দিয়া নানা প্রকার সুন্দর মালা গাথিয়া দেব পূজার জন্য রাখিয়া দিত। যে সকল স্থানে বিগ্রহ আছে, সেই সকল স্থানেই ঐ সকল মালা নিয়া দিত। কন্যাটী গ্রাম্য সম্পর্কে যাদবানন্দকে ঠাকুর দাদা বলিয়া ডাকিত। যাদবানন্দ মেয়েটীকে প্রায়ই বলিতেন, তোর সন্ধ্যা পূজা ত কিছুই নাই, তুই এত ফুল দিয়া কি করিস্? আমার পূজার ফুল কম হয়। তিনি প্রায়ই তাহাকে ফুল নিতে নিষেধ করিতেন, কিন্তু সে গ্রাহ্য করিত না। আর একদিন যখন বালিকাটী ফুল তুলিতে আসিয়াছে, তখন যাদবানন্দ বলিলেন, অরে! তুই এত ফুল দিয়া কি করিস্? মেয়েটী বলিল—মালা গাঁথি। যাদবানন্দ বলিলেন, মালা গাথিয়া কার গলায় দিবি? "আপনার গলায় দিব" বলিয়া মেয়েটী হাসিতে হাসিতে বাড়ী চলিয়া গেল। যাদবানন্দের গৃহের নিকট কয়েকটি স্থলপদ্ম, গন্ধরাজ ও মালতী প্রভৃতি সুগন্ধি পুষ্পের গাছ ছিল। তাহাতে বহু ফুল ফুটিত। মেয়েটী বাগানের ফুল তুলিয়া, এই ফুল নিতে আসিত। তাহার পিতা বাড়ীর মধ্যের ফুল তুলিতেন না, কেবল বাগানের ফুলই তুলিতেন, সুতরাং, তিনি কন্যার সহিত আর বাড়ীর মধ্যে যাইতেন না।

আর একদিন, মেয়েটী বাগানের ফুল তুলিয়া, বাড়ীর মধ্যে গিয়া ফুল তুলিতেছে, এমন সময়ে যাদবানন্দ রহস্যচ্ছলে বলিলেন, আরে মাগি! তোকে রোজ নিষেধ করি, তবু তুই আমার এই গাছের ফুল তুলিয়া নিস্। আজ কিছু বলিলাম না, যদি আবার নিতে আসিস্, তবে তোকে বিয়ে করিয়া ফেলিব। মেয়েটী একটু হাসিয়া ফুল লইয়া চলিয়া গেল। যাদবানন্দ রহস্যচ্ছলে ২।৩ দিন এইরূপ বলার পর, কোমল-হৃদয়া সরলা বালিকা পিতার নিকট এই কথা ব্যক্ত করিল। পরদিন আর ফুল আনিতে

যাইতে স্বীকৃত হইল না। বলিল—বাবা! আমি আর ওবাড়ীতে ফুল আনিতে যাইব না। যে দিন যাই, সেই দিনই ঠাকুরদাদায় বলে, যদি আবার ফুল নিতে আসিস্, তবে আমি তোকে বিবাহ করিয়া ফেলিব, আমি যাব না। কন্যার পিতা একটু হাসিয়া বলিলেন, মা! আজও তুমি আমার সঙ্গে চল, আমি তোমাকে একটী মন্ত্র শিখাইয়া দি, ঐ মন্ত্র পড়িলে, আর তোমাকে সে ঐ কথা বলিবে না। যদি আজও সে তোমাকে ঐ কথা বলে, তুমি তখন এই মাত্র বলিবে যে "আপনার কথা যেন মিথ্যা হয় না"। আজও বালিকা ফুল তুলিতে গেল, তাহার পিতা তাহার পশ্চাতে অলক্ষ্যভাবে থাকিলেন। আজিও যাদবানন্দ ঐ কথাই বলিলেন, সরলা বালিকা পিতার উপদিষ্ট মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, একটু হাসিয়া দৌড়িয়া গেল। কন্যার পিতা সব কথাই শুনিলেন, মনে একটু আশার সঞ্চার হইল, কন্যাটী সৎপাত্রে দান করিবেন। কেননা, যাদবানন্দের ন্যায় নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের কথা কখনও মিথ্যা হইবার নহে। বিধাতার বিচিত্র বিধান! প্রজাপতির অখণ্ডনীয় নির্বন্ধ কে খণ্ডন করিতে পারে? যাদবানন্দ দারপরিগ্রহ করিবেন না ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু বালিকার কথা শুনিয়া চিন্তিত হইলেন, এবং বুঝিলেন, ইহার পশ্চাতে নিশ্চয়ই একজন সুচতুর কৌশলী পুরুষ আছেন, নচেৎ সরলা বালিকার এইরূপ বচন চাতুর্য্য কখনও সম্ভবপর নহে।

এ বিষয়ে আরও একটী কৌতুকাবহ প্রবাদ আছে—

ন্যায়াচার্য্য মহাশয় দারপরিগ্রহ না করিলেও, কৃষিকার্য্যে তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল। তিনি আম, কাঁঠাল, সুপারি, নারিকেল প্রভৃতি গাছের চারা স্বহস্তে রোপণ করিতেন। পূর্ব্বে যে মেয়েটীর কথা বলিয়াছি, তাহার পিতৃগৃহ যাদবানন্দের বাড়ীর নিকটেই ছিল। সুতরাং, সে বৃদ্ধা রমণীগণের সহিত যাদবানন্দের বাড়ীতে প্রায়ই বেড়াইতে আসিত, কিন্তু এখন আর ফুল তুলিতে আসে না। একদিন বৈকালবেলা মেয়েটী তাহার বাড়ীর

প্রাচীন স্ত্রীলোকদিগের সহিত বেড়াইতে আসিয়াছে, যাদবানন্দও ঐ সময়ে একটী নারিকেলের চারা রোপণ করিতে ছিলেন। মেয়েটী বেড়াইতে বেড়াইতে সেখানে গেল। যাদবানন্দকে ঐরূপ কার্য্যে ব্যাপৃত দেখিয়, সরল-হৃদয়া বালিকা বিধাতার ইঙ্গিতেই যেন বলিতে লাগিল, "ঠাকুরদাদা! আপনি এতকষ্ট করিয়া নারিকেল গাছ লাগা'ন কার জন্য ? ইহার নারিকেল কে খাবে ?" যাদবানন্দ বালিকার বাক্য শ্রবণ করিয়া, দৈব প্রেরিত হইয়াই যেন বিবেচনা না করিয়াই তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, "তোর্ ছেলে খাবে"। এই কথা শুনিয়া, বালিকার সঙ্গিনী রমণীগণ হাসিয়া উঠিল, বালিকাটীও "আচ্ছা" বলিয়া একটু একটু হাসিতে হাসিতে পিত্রালয়ে চলিয়া গেল। বিধাতার চক্রান্তে বিবাহের সকল উপকরণই প্রস্তুত হইল, কেবল কন্যাদাতার প্রার্থনাটীই অবশিষ্ট রহিল।

যাহা হউক, ক্রমে কন্যাটী বয়স্থা হইল। বিবাহের বয়স হইয়াছে, সুতরাং, এখন আর নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে মনে করিয়া, কন্যার পিতা বৈদিকসমাজের নিয়মানুসারে একটী আত্মীয় লোকদ্বারা যাদবানন্দের সহিত কন্যার সম্বন্ধ উপস্থিত করিলেন। যাদবানন্দ ত শুনিয়াই অবাক্, তিনি যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহাই আজ কার্য্যে পরিণত হইতে চলিল, বিধাতার দুর্বিভাবনীয় বিধান, কে খণ্ডন করিতে পারে? তিনি কেবল ভাবিতে লাগিলেন, কি উপায়ে এই বিপদ্ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। একেত বিবাহ না করাই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছি, তাহার পর এইরূপ ঘরে সম্বন্ধ করাও আমাদের মর্য্যাদা-হানিকর। এখন উপায় কি?

যাদবানন্দ বলিলেন, মেয়েটী আমাকে ঠাকুর দাদা বলিয়া ডাকে, তাই আমি উপহাসচ্ছলে ঐরূপ কথা বলিয়াছি, ইহাতে বাস্তবিক বিবাহের প্রতিশ্রুতি হয় না। দেশের সর্ব্বত্রই দেখা যায়, পৌত্রী বা দৌহিত্রীকে উপহাস করিয়া বিবাহ করিবার কথা সকলেই বলে, কিন্তু তাই বলিয়া কি কেহ তাহাদিগকে বিবাহ করে? বিশেষতঃ, মধুসূদনের বিরহের পর হইতেই

আমি বিবাহ করিব না বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছি। এ অবস্থায় আমাকে অনুরোধ করা কোনরূপেই সঙ্গত নহে। আরও দেখুন, সম্বন্ধের বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করা আবশ্যক, যেখানে সম্বন্ধ উপস্থিত হইয়াছে, ঐরূপ ঘরে কাজ করিলে, আমাদের মর্য্যাদার হানি হইবে, আমাদের পক্ষে উহা অকরণীয় ঘর, সুতরাং, এইরূপ অসম্ভব প্রস্তাব করা তাহাদের দুঃসাহস মাত্র। যাদবানন্দের সকল কথা শুনিয়া সম্বন্ধের উপস্থাপক কন্যার পিতার নিকট সকল কথাই ব্যক্ত করিলেন কিন্তু এই সকল যুক্তিযুক্ত কথা শ্রবণ করিয়াও কন্যার পিতা ধীর, স্থির, গম্ভীর, অচল ও অটল। তাহার দৃঢ় সঙ্কল্প ও ঐকান্তিকতা যে, যাদবানন্দের নিকটেই কন্যা সম্প্রদান করিবেন।

কন্যার পিতা এ বিষয়ের উপায় চিন্তা করিতে করিতে কয়েক দিন অতিবাহিত করিলেন। পরে একদিন গ্রামের প্রাচীন, বুদ্ধিমান্ ও পণ্ডিত-বর্গকে লইয়া যাদবানন্দের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। যাদবানন্দ দেখিয়াই অবাক্। তিনি মনে করিলেন, বোধ হয় ইহারা মিলিত হইয়া আমাকে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছে। এই দুর্ভেদ্য চক্রব্যূহ ভেদ করা বোধ হয় আমার সাধ্যায়ত্ত হইবে না। যাহা হউক, তিনি তাহাদিগকে বিশেষ সম্বর্দ্ধনা করিয়া বসিবার আসন দিলেন এবং তাহাদের পদধূলিতে যে গৃহ পবিত্র ও সৌভাগ্যের সূচনা হইয়াছে, তাহাও বিনীতভাবে ব্যক্ত করিলেন। সকলে নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলে, কন্যার পিতা বলিলেন—মাননীয় ভূদেবগণ! আজ আপনাদের উপর আমি একটী বিচারের ভার অর্পণ করিব, আপনারা ন্যায় ও ধর্ম্মানুমোদিতভাবে তাহার বিচার করিবেন। বলা বাহুল্য, ন্যায়-বিচারে জয় বা পরাজয়, উভয়ই শ্লাঘ্য হইয়া থাকে।

আমার কোমল-হৃদয়া অবোধ-বালিকা পুরন্দরের ফুল বাগানে প্রত্যহ ফুল তুলিতে আসে, বাড়ীর অন্যের গাছ হইতেও ফুল নেয়। ন্যায়াচার্য্য মহাশয় প্রত্যেক দিনই উহাকে ফুল তুলিতে নিষেধ করেন। একদিন তিনি

উপহাসচ্ছলে জিজ্ঞাসা করেন, তুই এত ফুল দিয়া কি করিস্? মেয়েটী বলিল,"মালা গাঁথি"। ন্যায়াচার্য্য বলিলেন, মালা গাঁথিয়া কার গলায় দিবি? মেয়েটী বলিল, আপনার গলায়ই মালা পরাইয়া দিব। এই বলিয়া মেয়েটী হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। সে প্রত্যেক দিনই ফুল তুলিতে আসে, ন্যায়াচার্য্য মহাশয় ও নিষেধ করেন, কিন্তু সে নিষেধ মানে না। ন্যায়াচার্য্য মহাশয় প্রত্যেক দিনই বলেন, দেথ্? তোকে প্রত্যেক দিনই নিষেধ করি, তুই নিষেধ শুনিস্ না, প্রত্যেক দিনই আমার পূজার ফুল কম হয়। তুই আবার ফুল নিতে আস্‌বি তো, তোকে বিয়ে করে ফেল্‌ব। একদিন নয়, দুইদিন নয়, তিনদিন নয়, ন্যায়াচার্য্য মহাশয় বহুদিন বহুবার ঐরূপ কথা বলিয়াছেন। মেয়েটী কিন্তু ফুল তোলা বন্ধ করে না। যাদবানন্দ আরও একদিন ঐ কথা বলিলে, মেয়েটী হাসিয়া বলিল, ঠাকুরদাদা! কেবল মুখেই বলেন, কই বিয়ে তো করেন না, আপনার কথা যেন মিথ্যা না হয়, এই কথা বলিয়া মেয়েটী হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। তাহার পর, আর বালিকা ফুল তুলিতে আসে না। কোমলমতি বালিকার এই উক্তিতে নিশ্চয়ই বিধাতার ইঙ্গিত আছে। ন্যায়াচার্য্য মহাশয় মালা প্রার্থনা করিয়াছেন, মেয়েটীও সরল হৃদয়ে গলায় বরমাল্য অর্পণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছে। তিনি বিবাহ করিতে চাহিয়াছেন, মেয়েটী তাহাতেও সম্মতি দিয়াছে। বিশেষতঃ, অল্প কয়েক দিন হইল, আমার বাড়ীর স্ত্রীলোকদিগের সহিত মেয়েটি বেড়াইতে আসিয়াছিল, তখন ন্যায়াচার্য্য মহাশয় একটী নারিকেলের চারা রোপণ করিতেছিলেন। তখন মেয়েটী জিজ্ঞাসা করিল, ঠাকুর দাদা! এত কষ্ট করিয়া নারিকেল গাছ লাগা'ন কার জন্য? ইহার নারিকেল কে খাবে? ন্যায়াচার্য্য মহাশয় উত্তর করিলেন, "তোর্ ছেলে খাবে"। এই কথায়ও ন্যায়াচার্য্য মহাশয়ের পূর্ণ প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে। ন্যায়াচার্য্য মহাশয় বিবাহ করিবেন না বলিয়া আমরা শুনিয়াছি, ইহা সত্য, কিন্তু আমি দেখিতেছি ইহার ভিতরে

অলক্ষ্যভাবে বিধাতার মহতী প্রেরণা রহিয়াছে। ইহা অবশ্যই বিধাতার সদিচ্ছা। ন্যায়াচার্য্য মহাশয়ের মত নিষ্ঠাবান্, সদাচার সম্পন্ন, সৎক্রিয়ান্বিত, নানাশাস্ত্র বিশারদ ব্রাহ্মণ অতি অল্পই দেখা যায়। আমার বিশ্বাস, এই রমণীরত্ন গ্রহণ করিলে, তাহার বংশ সমধিক উজ্জ্বল, পবিত্র ও বহু মানাস্পদ হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। আমরা ন্যায়াচার্য্য মহাশয়কে সাধু পুরুষ বলিয়া শ্রদ্ধা করি, এবং সত্যবাদী বলিয়া জানি, তিনি যদি সামান্য কারণে সেই চিরার্জ্জিত তপোলব্ধ সত্যের অপলাপ করেন, তবে আমার আর বক্তব্য কিছুই নাই।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সহস্র প্রতিবন্ধক থাকিলেও সাধু পুরুষ ন্যায়াচার্য্য মহাশয় অঙ্গীকৃত সত্য প্রতিপালনে বিমুখ হইবেন না। কেননা, শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন—

"উদয়তি যদি ভানুঃ পশ্চিমে দিগ্বিভাগে
বিকসতি যদি পদ্মং পর্ব্বতানাং শিখাগ্রে।
প্রচলতি যদি মেরুঃ শীততাং যাতি বহ্নি
র্ন চলতি খলু বাক্যং সজ্জনানাং কদাচিৎ॥"

অর্থাৎ; সূর্য্য যদি পশ্চিম দিকে উদিত হন, পর্ব্বতের শৃঙ্গের অগ্রভাগে যদি পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়, মেরুপর্ব্বত যদি বিচলিত হয়, বহ্নি যদি শীতলতা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেও সজ্জনের বাক্য কখনও বিচলিত হয় না। এখন, এবিষয়ে আপনারা কর্ত্তব্য বিধান করুন। ব্রাহ্মণ এইরূপ বলিয়া বিরত হইলেন।

সভাসদ্‌গণ চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায়, ব্রাহ্মণের অদ্ভুত কাহিনী শ্রবণ করিতেছিলেন। সকলেই অবাক্, নিস্পন্দ। সভা যেন স্তিমিত ও কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় ভাবে কিছুকাল অবস্থান করিল। কিয়ৎকাল পরে, সভাস্থ সকলেই একবাক্যে বলিলেন যে, নানা শাস্ত্রবিশারদ, ন্যায় ও ধর্ম্মের অবতার, মূর্ত্তিমান্

ব্রহ্মণ্যদেবের ন্যায়, সর্ব্বজনমান্য ন্যায়াচার্য্য মহাশয়ের উপরই এই বিচার-ভার অর্পিত হইল। তাঁহার সিদ্ধান্তই আমাদের সিদ্ধান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

এই সকল কথা শুনিয়া, ন্যায়াচার্য্য মহাশয় কিছুকাল তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থিত থাকিলেন। সকলের চক্ষু, সকলের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার বদনমণ্ডলের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইল, তাঁহার মুখের বাক্য শুনিবার জন্য সকলেই উদ্‌গ্রীব ও উৎকণ্ঠিতভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে, ন্যায়াচার্য্য মহাশয়ের হৃদয়ে কি যেন এক অনির্ব্বচনীয় জ্যোতিঃ প্রবেশ করিল। সহস্র সহস্র প্রতিবন্ধক-সেতু অতিক্রম করিয়া সত্যের প্রবল বন্যায় তিনি ভাসমান হইলেন। মান, অপমান, লোকনিন্দা প্রভৃতি তৃণের ন্যায় ভাসিয়া গেল। ব্রাহ্মণ পরিষদে, অঙ্গীকৃত বাক্য অস্বীকার করিতে তাঁহার সাহস হইল না। তিনি হৃদয়ের বলে, ব্রহ্মণ্যের বলে, যজ্ঞ, ব্রত, দান, তপস্যার সারভূত সত্যকেই আশ্রয় করিলেন। তিনি উচ্চৈঃস্বরে ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে ভূদেবগণ! আপনারা আমার প্রতি যে কঠোর বিচারভার অর্পণ করিয়াছেন, তাহার সিদ্ধান্ত এই যে, আমার বাক্য কখনও অন্যথা হইবে না। আপনারা আপনাদের কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান করুন"। ন্যায়াচার্য্যের এইরূপ মনুষ্যোচিত, ব্রাহ্মণোচিত বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলেই পুলকিত হইলেন। এই অপূর্ব্ব বিচার শ্রবণ করিবার জন্য গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেই বিপুল জনতা হর্ষোল্লাসের সহিত জয়ধ্বনি করিতে করিতে ন্যায়াচার্য্যের উদারতা ও সত্যবাদিতার ভূয়সী প্রশংসাপূর্ব্বক নিজ নিজ বাসস্থানে গমন করিলেন।

এদিকে ন্যায়াচার্য্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কুলমর্য্যাদাভিমানী আচার্য্য চূড়ামণি মহাশয় এই বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হওয়ায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি আদেশ করিলেন, আমার বাড়ীতে এ বিবাহ হইতে পারিবে না। ন্যায়াচার্য্য মহাশয় জ্যেষ্ঠের রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়াও ভীত হইলেন না, সত্যভঙ্গ

করিলেন না। অন্যস্থানে থাকিয়া শুভদিনে শুভক্ষণে শুভ-বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইল। বর কন্যা বাড়ীর দরজায় পর্য্যন্ত পৌছিলে, চূড়ামণি মহাশয় তাহাদিগকে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে দিলেন না। বলিলেন, ইহারা আমার বাড়ী প্রবেশ করিলে, বাড়ী অপবিত্র হইবে। যাহা হউক, তাহারা অন্য এক বাড়ী গিয়া উঠিলেন, তাহারা দম্পতিকে বিশেষ যত্ন ও অভ্যর্থনার সহিত গ্রহণ করিলেন। সকলেই চূড়ামণি মহাশয়ের এই ব্যবহারে মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হইয়া নিন্দা করিতে লাগিলেন।

যথাসময়ে পাকস্পর্শের আয়োজন হইল। আত্মীয়, বন্ধু বান্ধব বহুলোক নিমন্ত্রিত হইল। নবপরিণীতা রমণী নানালঙ্কারে ভূষিত হইয়া পট্টবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক মূর্ত্তিমতী অন্নপূর্ণার ন্যায় ভাতের থাল হাতে করিয়া পরিবেশনে বহির্গত হইলেন। মাননীয় গুরুজনের মধ্যে স্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভাসুর চূড়ামণি মহাশয়। অগ্রে তাহাকেই অন্ন পরিবেশন করিতে হইবে মনে করিয়া পুরবধূগণের সহিত ভাসুরের গৃহে অন্নের থালা হাতে করিয়া গমন করিলেন, আহারের নির্দ্দিষ্ট স্থানে চূড়ামণি মহাশয় উপবিষ্ট রহিয়াছেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ ভাত দিতে আসিয়াছেন, তিনি মুখ ফিরাইয়া রহিলেন। নববধূ যথাস্থানে ভাত রাখিলেন, কিন্তু তিনি গ্রহণ করিলেন না, প্রত্যুত ঐ ভাত ফেলিয়া দিবার আদেশ করিলেন। ন্যায়াচার্য্য মহাশয় জ্যেষ্ঠের পাদযুগল ধারণ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, ক্ষমা ত পাইলেনই না, প্রত্যুত বিশেষরূপে তিরস্কৃত হইলেন। তখন, পাদাহত ফণিনীর ন্যায় অভিমানবতী রমণীর বিষদংষ্ট্রা বিকটাকার ধারণ করিল, তিনি তৎক্ষণাৎ দংশন করিলেন—ধর্ম্ম, চন্দ্র, সূর্য্য ও ব্রাহ্মণগণকে সাক্ষী করিয়া আমি বলিতেছি, আমি যদি প্রকৃত পতিব্রতা হই, যদি আমি ব্রাহ্মণবংশে জন্ম-গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহা হইলে এই চূড়ামণির বংশ যেন সমাজে হীনমর্য্যাদ হয়, এবং আমাকে যেরূপ অবজ্ঞাত করিয়াছে, সেইরূপ অবজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। ইহা বলিয়া সুশীলা ব্রাহ্মণ-তনয়া চূড়ামণির গৃহ হইতে কাঁদিতে কাঁদিতে

বহির্গত হইলেন। এই অভিশাপ-পাদপ ক্রমে ফলবান্ হইল। চূড়ামণির এই নিদারুণ ব্যবহারে বৈদিকসমাজের অনেকেই তাহার সংস্রব ত্যাগ করিলেন।

অল্পদিনের মধ্যেই এই অভিশাপ-পাদপের আর একটী ফল উৎপন্ন হইল। কোটালীপাড়ার শুনক-বংশসম্ভূত খ্যাতনামা গোষ্ঠীপতি হরিহর চক্রবর্ত্তী মহাশয় বৈদিকের চতুর্দ্দশ সমাজ মিলাইয়া একটী যজ্ঞ করেন। এই যজ্ঞে চূড়ামণি মহাশয় ও ন্যায়াচার্য্য মহাশয়কে ব্রতী হইতে অনুরোধ করা হইয়াছিল। ন্যায়াচার্য্য মহাশয় ঐ কার্য্যে উৎসাহের সহিত যোগদান করিতে অঙ্গীকার করিলেন। চূড়ামণি মহাশয় এই কার্য্যটী চাতুর্য্যপূর্ণ ও অসৎকার্য্য মনে করিয়া ইহাতে যোগদান করিলেন না। যাদবানন্দের ঐ কার্য্যে যোগদান করায় ও হয়ত চূড়ামণি মহাশয়ের যোগদান সম্ভবপর না হইতে পারে। যাহা হউক, সমারোহের সহিত হরিহরের যজ্ঞ সম্পন্ন হইল। যাহারা এই চতুর্দ্দশ সমাজের সহিত মিলিত হইলেন না, তাহারা সমাজের বহির্ভূত হইলেন, সমাজের সহিত তাহাদের কোন সংস্রব রহিল না। কাকতালীয় ন্যায়ে চূড়ামণি মহাশয়ও অভিমানবশে এই কার্য্যে যোগদান না করায়, তিনিও এই সমাজের সম্পর্ক শূন্য হইলেন। কালক্রমে ন্যায়াচার্য্যের কয়েকটী সুযোগ্য পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। তাহারা ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইল। একদিন ন্যায়াচার্য্যের স্ত্রী তাহাদিগের সকলকে ডাকিয়া, চূড়ামণি মহাশয়ের অন্যায় ব্যবহারের কথা বলিয়া আদেশ করিলেন, তোমরা আমার সন্তান, যদি আমার অপমানে তোমাদের অপমানবোধ থাকে, তাহা হইলে তোমরা চূড়ামণির সন্তানের জলগ্রহণও করিতে পারিবা না। তাহার উত্তরে একজন বলিল, মা! আপনি ক্রোধবশে এই কথা বলিলেন বটে, কিন্তু, এক গ্রামে বাস্তব্য করিয়া জ্ঞাতির সহিত এরূপ চিরস্থায়ী বিরোধ সম্ভবপর নহে। কালে হয়ত তাহাদের সহিত বিশেষ মিত্রতাও হইতে পারে। অতএব আমি বলিতেছি যে, আমার বংশাবলীতে কেহই তাহাদের সহিত জ্ঞাতিভাবে আহার করিবে না। আর একজন বলিলেন,

জলও খাইব না এ প্রতিজ্ঞা অসম্ভব, তবে জ্ঞাতিভাবে অন্ন ভোজন করিব না। বস্তুতঃ, অদ্য পর্য্যন্ত এই নিয়ম বর্ত্তমান আছে। কোন জ্ঞাতি ভাত খায় না, কিন্তু চিড়া প্রভৃতি ভক্ষণ করে। কোন জ্ঞাতি, জ্ঞাতিভাবে নিমন্ত্রণাদি উপলক্ষে জলযোগও করে না। তবে, এখন অন্যভাবে, অর্থাৎ ঘনিষ্ট কুটুম্বিতায়, গুরুশিষ্য সম্পর্কে অন্নাদির ব্যবহারও চলিতেছে, কিন্তু সামাজিক বা জ্ঞাতিভাবে নহে। বাস্তবিক, ন্যায়াচার্য্যের সুযোগ্য পুত্রগণ মাতার আদেশ পালনে বিশেষ দূরদর্শিতাও বিবেচনা শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে অন্ন সম্বন্ধ না থাকিলেও, চূড়ামণি ও ন্যায়াচার্য্যের সন্তানগণের মধ্যে বিশেষ সদ্ভাবই পরিলক্ষিত হয়, তাহাদের সহিত যে কোন দিন বিদ্বেষ ভাব ছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না। এবিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব নগেন্দ্র নাথ বসুর বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে লিখিত হইয়াছে। সাধারণের বিরক্তিকর বলিয়া, ঐ সকল কথার বিস্তার করা যুক্তিযুক্ত নহে।

মহানুভব ন্যায়াচার্য্য মহাশয়ের সম্বন্ধে একটী কিংবদন্তী আছে। তাহা এই ;

১। কোনও দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত বঙ্গদেশে আগমন করিলে, ন্যায়াচার্য্য মহাশয় তাহার সহিত বিচার করিতে গমন করিলেন। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত তাহাকে অল্পবয়স্ক দেখিয়া উপহাস করিয়া বলিলেন—

নিরন্তরং দুর্গমশাস্ত্র-কানন মটাট্যমানেন ময়া স্তনন্ধয়ঃ।
সংস্পর্দ্ধমানোহরিণেভপোতকো যথা মহাসাহসিকোহয়-
মীক্ষ্যতে ॥

অর্থাৎ,—নিরন্তর দুর্গম অরণ্যে পুনঃ পুনঃ সঞ্চরণশীল সিংহের সহিত মহা সাহসিক করিশাবক যেরূপ স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে, সেইরূপ নিরন্তর অতি-দুর্গম শাস্ত্রমার্গে বিচরণশীল আমার সহিতও এই মহাসাহসিক শিশুটী স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিতেছে।

এই কথা শুনিয়া, যাদবানন্দ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন ;

"বালোঽহং যাদবানন্দো ন মে বালা সরস্বতী।

বাল-ব্যালস্য গরলং ন দহেৎ কিং শরীরিণম্" ॥

অর্থাৎ, আমি যাদবানন্দ বালক ইহা সত্য, কিন্তু আমার সরস্বতী অর্থাৎ বাণী বালিকা নহে। তাৎপর্য্য এই যে, আমি বয়সে বালক হইলেও আমার শাস্ত্রীয় কথা বিদ্বজ্জনোচিত। দৃষ্টান্ত দ্বারা ঐ বাক্যের সমর্থন করিয়া বলিতেছেন যে, শিশু আশীবিষের বিষ কি প্রাণীগণকে দগ্ধ করিতে পারে না ?

দিগ্বিজয়ী এই সৌম্যাকৃতি তেজস্বী বালকের কথায় নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে সস্নেহ আলিঙ্গন ও আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া স্থানান্তরে গমন করিলেন। কোন কোন ব্যক্তি ঐ শ্লোকটীর প্রথম চরণে "বালোঽহং জগদানন্দ" এইরূপ পাঠ করেন।

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য অদ্বৈত-বেদান্তাচার্য্য

মধুসূদন সরস্বতী

আমরা যাঁহার পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া হৃদয়ের কলুষ-রাশি নিরাস করিবার বাসনা করিয়াছি, যাঁহার পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া রসনার রসজ্ঞতা অনুভব করিতেছি, যাঁহার পবিত্র চরিত্র অঙ্কিত করিতে গিয়া লেখনীকে চরিতার্থ বোধ করিতেছি, তিনি আমাদের "বাঙ্গালী মধুসূদন"। ইনি অন্যূন ৪০০ চারিশত বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের এক কোণে, বঙ্গদেশের অপরিচিত প্রান্তে, বর্ত্তমান ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ও তৎকালীন বাখরগঞ্জ জেলার বাকলা চন্দ্রদ্বীপ সমাজের অন্তর্ভুক্ত, চতুর্দ্দিকে সলিলরাশি পরিবেষ্টিত দ্বীপে ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ন্যায় কোটালীপাড়া পরগণার উনবিংশতি বা উনশীয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কোটালীপাড়া ও বাকলা-চন্দ্রদ্বীপের তদানীন্তনী অবস্থা পূর্ব্বেই সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। হিংস্র-জন্তু শূন্য, ব্রাহ্মণবহুল কোটালীপাড়া প্রাকৃতিক-সৌন্দর্য্য-পূর্ণ ঋষিগণের আশ্রমের ন্যায় প্রতীয়মান হইলেও, ইহার চতুর্দ্দিকেই বিল, বর্ষাকালে সলিলরাশি-পরিবেষ্টিত একটী দ্বীপের ন্যায় বোধ হয়। এই স্থানটী দেখিলে স্বভাবতঃই মনে হয়, যেন ভগবান্ কূর্ম্মাবতারে প্রলয়-সাগর-মগ্না ধরণীকে স্বকীয় পৃষ্ঠে ধারণ করিয়াছেন। এই স্থানটী যে সমুদ্রের চর হইতে উৎপন্ন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান কালেও এই স্থানের জমির উর্ব্বরতা দেখিলে সহজেই ইহা অনুমিত হয়। এই উর্ব্বরা ভূমির প্রচুর-শস্যোৎপাদিনী শক্তির ন্যায়, প্রকৃত মনুষ্য-জনন-শক্তি ও যে বর্ত্তমান ছিল, তাহাও প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। এই স্থানে উৎপন্ন মানবগণ সকলেই বলিষ্ঠ, দীর্ঘদেহ, সুস্থ, পরোপকারনিরত, তপস্যা ও শাস্ত্রচর্চ্চায় নিয়ত আসক্ত, ব্রহ্মচর্য্যসম্পন্ন, সদাচার-

পরায়ণ,সত্যবাদী,তেজস্বী ও আদর্শ মনুষ্য বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য ছিলেন। এইরূপ স্থানও উপাদান না থাকিলে, মধুসূদনের ন্যায় ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক এখানে জন্ম পরিগ্রহ করিবেন কেন? কশ্যপের নিভৃত আশ্রম-কুঞ্জে অদিতির গর্ভে ৺ভগবান্ বামনদেবের ন্যায়, আশ্রম-পাদপ পরি-শোভিত তাপসবর্য্য পুরন্দরাচার্য্যের গৃহ অলঙ্কৃত করিয়া তপোভ্রষ্ট যোগীর ন্যায়, কল্পপাদপের নবকিশলয়ের ন্যায় কোমল, সুগঠিতাবয়ব, আকর্ণ-বিস্তৃত লোচন, পাপপঙ্কিল ভারতবর্ষের পাপভার হরণ করিবার জন্যই যেন, ভগবান্ নারায়ণের অবতাররূপে মধুসূদন আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ক্ষীরোদসাগরের ন্যায় পরম-নির্ম্মল-বংশে সুধাকরের ন্যায় আবির্ভূত মধুসূদনের অদ্বৈতবেদান্তের উপদেশ-রাশিরূপ অমৃতময়-রশ্মিসকল ভারতের জাতিবর্ণনির্বিশেষে প্রত্যেক ধনী, দরিদ্র বা মূর্খের পর্ণকুটীরে পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়াছিল। প্রবল দ্বৈতবাদী বৈদান্তিক-মতবিরোধী বুধ-বিধুন্তুদগণ পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়াও ইহাকে গলাধঃকরণ করিতে পারেন নাই, বা তাহাদের প্রবল দংষ্ট্রাঘাত ইহাকে ক্ষতবিক্ষত করিতে সমর্থ হয় নাই। ভগবান্ শঙ্করের অবতার শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় ভগবান্ নারায়ণের অবতাররূপে বেদবিরুদ্ধবাদ নিরাসপূর্ব্বক শিষ্যদিগকে অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব শিক্ষা দিবার জন্য অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন, সমস্ত বিদ্যার নিধিস্বরূপ কাশ্যপ বংশ তিলক মধু-সূদন মহীমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কশ্যপের তপস্যা দ্বারা বশীভূত নারায়ণ, কশ্যপের প্রতি যে উক্তিরূপ বর প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা ভবিষ্যপুরাণে উক্ত হইয়াছে। যথা—

"যদ্‌গোত্রে ভবিতা কথা সুকবিতা বিদ্যানবদ্যা সদা,
সৌব্রহ্মণ্যমগণ্যপুণ্যসহিতং বক্তেব বাগ্‌দেবতা।
কিং বান্যৎ কথয়ামি যত্র ভবিতুং কৃষ্ণোঽপি ধন্যঃ স্বয়ং,
শ্যামঃ শ্রীমধুসূদনো যতিরহো! ভূমৌ ভবিষ্যাম্যহম্॥ ১

তাপস্তেন বশীচকার স চিরান্নারায়ণং কশ্যপঃ,
শ্রীনারায়ণ ইত্যুবাচ তমৃষিং হে কশ্যপ ! শ্রূয়তাম্ ।
পুত্রস্তে ভবিতাস্মি বামন ইতি ত্রেতাযুগে, দ্বাপরে
শ্রীকৃষ্ণোবসুদেবতঃ কুলভবাত্ত্বৎকশ্যপস্য ক্ষিতৌ ॥ ২
পূতা কাশ্যপিকা কুলঞ্চ সকলং যজ্জন্মমাত্রাদভূৎ,
শ্রীল শ্রীমধুসূদনঃ কলিযুগেত্বাচার্য্যপৌরন্দরিঃ ।
এষা কাশ্যপিকৈব ভূমিরভবত্তত্রাপি কিঞ্চিৎ স্থলং
তদ্‌গোত্রপ্রভবায় যে দদতি ন ক্ষৌণীভুজঃ পামরাঃ ॥৩
তেষাং কাগতিরস্তি ভূমি মপহৃত্যান্যস্য দত্তাং পরৈ
শ্চৈবং সম্মতয়ো যথানিজমতং কুর্ব্বন্তুলং পল্লবৈঃ" ॥ ইত্যাদি

অর্থাৎ ;—যে গোত্রোৎপন্ন ব্যক্তিগণের স্বাভাবিক কথাই সুকবিতা, সর্ব্বদা অনিন্দনীয় বিদ্যা, অসংখ্য পুণ্য সহিত সুব্রাহ্মণত্ব, বাগীশ্বরী বশীভূতার ন্যায় হইবে, আর অধিক কি বলিব, যে গোত্রে জন্মগ্রহণ করিয়া কৃষ্ণও স্বয়ং ধন্য হইয়াছেন, আমি সেইবংশে শ্যামবর্ণ, যতিবর মধুসূদনরূপে জন্ম গ্রহণ করিব।১

কশ্যপ ঋষি দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়া নারায়ণকে বশীভূত করিয়াছিলেন। সেই নারায়ণ, ঋষিকে বলিলেন—হে কশ্যপ ! শ্রবণ কর। আমি ত্রেতাযুগে পুত্ররূপে বামন নামে, দ্বাপরযুগে তোমার কুলোৎপন্ন বসুদেব হইতে কৃষ্ণ নামে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিব।২

যাহার জন্মমাত্রে কশ্যপরক্ষিতা ক্ষিতি এবং কাশ্যপবংশ পবিত্র হইবে, আমি কলিযুগে পুরন্দরাচার্য্যের অপত্যরূপে মধুসূদন নামে সেই বংশে উৎপন্ন হইব। এই সমগ্র মহীমণ্ডলের অধিপতিই কশ্যপ ঋষি ছিলেন। সুতরাং, যে ভূপতিগণ এই গোত্রোৎপন্ন ব্রাহ্মণকে সেই মহীমণ্ডলের একটু স্থানও দান না করেন, তাহারা নিতান্ত পাপিষ্ঠ।৩

যাহারা পর প্রদত্ত ভূমিকে অপহরণ করে, তাহাদের কি গতি হইবে? তোমরা সদ্বুদ্ধি অনুসারে নিজের মত অবলম্বন কর, অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

মধুসূদনের আবির্ভাব কাল।

মধুসূদন কোন্ সময়ে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া ভারত ভূমিকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাহা এখন নিঃসন্দিগ্ধরূপে জানিবার কোন উপায় নাই। তাহার কোন কোষ্ঠী, ঠিকুজী বা জীবনচরিত পাওয়া যায় নাই, অথবা তাহার কৃত কোন গ্রন্থেও নিজের পরিচয় বা সময়ের উল্লেখ নাই। সুতরাং, যাহারা ইতিহাস জানেন না, বা ইতিহাসের গবেষণায় মনঃসংযোগ করিবার সুযোগ পান নাই, বা তাহা আবশ্যক মনে করেন নাই, তাহাদের পক্ষে এইরূপ ঐতিহাসিক তত্ত্বের সমালোচনা করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। কিন্তু, এই আলোচনায় সত্য নির্ণীত না হইলেও, ইহার উদ্দেশ্য বিফল হইবার নহে। কারণ, ভবিষ্যৎ তথ্যানুসন্ধিৎসু ঐতিহাসিকগণের ইহা উপোদ্‌ঘাত-মাত্র। তাহাদের আলোচনার সুবিধার জন্যই নানা মতবাদের মধ্যে ইহা যে পথপ্রদর্শক হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

যাহার আবির্ভাব কালের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না, তিনটী উপায়ে তাহার কাল নির্দ্দেশের সাহায্য হইতে পারে।

১। গ্রন্থের দ্বারা।

২। শিষ্য প্রশিষ্য দ্বারা।

৩। সাময়িক ব্যক্তির দ্বারা।

প্রথম অনুসন্ধানের ফলে আমরা দেখিতে পাই, ব্যাসাচার্য্যের "ন্যায়ামৃত" খণ্ডনের জন্য "অদ্বৈতসিদ্ধি" রচিত হইয়াছে। সুতরাং একসময়ে বর্ত্তমান থাকিলেও ইনি ব্যাসাচার্য্যের পরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।১

শঙ্কর মিশ্রের "ভেদরত্ন" গ্রন্থের প্রতিবাদরূপে "অদ্বৈতরত্ন-রক্ষণ" গ্রন্থ

রচিত হওয়ায়, ইনি শঙ্করমিশ্রের পরে আবির্ভূত হইয়াছেন। শঙ্কর মিশ্রের ভেদরত্নের লিপিকাল ১৪৬২ খ্রীঃ।২

নব্য ন্যায়ের সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী, ও গৌতমসূত্র-বৃত্তি প্রণেতা বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন অদ্বৈতসিদ্ধির প্রতিবাদরূপে "ভেদসিদ্ধি" গ্রন্থ লিখিয়াছেন, সুতরাং ইনি বিশ্বনাথের পূর্ব্ববর্ত্তী। বিশ্বনাথের গৌতমসূত্রের বৃত্তি রচনার কাল ১৫৫৬ শক (১৬৩৪ খ্রীঃ)। কেহ বলেন ১৫৭৬ শক (১৬৫৪ খ্রীঃ)। ঐ গ্রন্থের শেষে লিখিত আছে—"রস-বাণ-তিথৌ শকেন্দ্রকালে" ইত্যাদি। কেহ ঐ "বাণ" শব্দ স্থানে "বার" পাঠ করিয়া থাকেন। ৩

২য় অনুসন্ধানে জানা যায়, মধুসূদনের শিষ্য বলভদ্র, অদ্বৈতসিদ্ধির "সিদ্ধিব্যাখ্যা" নামক টীকা ও প্রশিষ্যস্থানীয় ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী ঐগ্রন্থের "লঘুচন্দ্রিকা" নামক টীকা রচনা করেন, সুতরাং ইনি তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী।

৩য় অনুসন্ধানে এই সকল লোকের সন্ধান পাওয়া যায়।

১। ব্যাসরাজ।

২। নারায়ণভট্ট, উপেন্দ্র সরস্বতী, নৃসিংহাশ্রম।

৩। মথুরানাথ তর্কবাগীশ, জগদীশ তর্কালঙ্কার, গদাধর ভট্টাচার্য্য।

৪। মহারাজ প্রতাপাদিত্য।

৫। সম্রাট্ আকবর সাহ।

৬। তুলসী দাস।

৭। অপ্পয় দীক্ষিত।

৮। চন্দ্রদ্বীপের রাজা জগদানন্দ রায়।

৯। বিক্রমপুরের চাঁদরায় ও কেদার রায়।

১০। উৎকলের রাজা মুকুন্দদেব।

ইহাদিগের মধ্যে

১। ব্যাসরাজ বা ব্যাসাচার্য্য অদ্বৈতবাদের খণ্ডনের জন্য "ন্যায়ামৃত" গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি মধুসূদনের অদ্বৈতসিদ্ধি—দ্বৈতবাদ খণ্ডনের ব্রহ্মাস্ত্র

মনে করিয়া, প্রিয়তম বুদ্ধিমান্ শিষ্য ব্যাসরামকে অদ্বৈতসিদ্ধি পড়িয়া আসিবার জন্য মধুসূদনের নিকটে প্রেরণ করেন। সুতরাং, ইনি মধুসূদনের সমসাময়িক। আর, কে শাস্ত্রীর মতে ইহার সময় ১৪৪৬ হইতে ১৫৩৯ খৃঃ। মঠতালিকায় দেখা যায়, ইনি উদীপির মঠে ১৫৪৮ হইতে ১৫৯৮খ্রীঃ পর্য্যন্ত মঠাধীশত্ব করিয়াছিলেন।

২। নারায়ণ ভট্টের সহিত উপেন্দ্র সরস্বতীও নৃসিংহাশ্রমের বিচারে মধুসূদন মধ্যস্থ ছিলেন। সুতরাং, তাহারাও একসময়ের লোক।

৩। মধুসূদন, হরিরাম তর্কবাগীশের ছাত্র। তাহার অধ্যয়নকালে নবদ্বীপে মথুরানাথ তর্কবাগীশ প্রভৃতি বহু খ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন। তিনি যখন প্রাচীন বয়সে নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন, তখন গদাধর বালক পণ্ডিত, জগদীশ যুবক, মথুরানাথ অতিবৃদ্ধ। গদাধরের সময় ১৬০৪ হইতে ১৭০৮ খ্রীঃ।

৪। মহারাজ প্রতাপাদিত্য স্বদেশবাসী সাধু মনে করিয়াই বোধ হয়, চৌষট্টি যোগিনীর ঘাট, মধুসূদনের মঠ ও গোপালমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার জন্ম ১৫৬০ খ্রীঃ। রাজ্যাভিষেক ১৫৮৪ খ্রীঃ। মৃত্যু কাশীতে ১৬১১ খ্রীঃ।

৫। সম্রাট্ আকবর সাহের পত্নী মধুসূদনের কৃপায় নিদারুণ শূলরোগ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। ইহার জন্ম ১৫৪২ খ্রীঃ। রাজত্ব কাল ১৫৫৬ খ্রীঃ হইতে ১৬০৫ খ্রীঃ পর্য্যন্ত।

জাহাঙ্গীরের রাজত্ব কাল—১৬০৫ হইতে ১৬২৭ খ্রীঃ।

সাজাহানের " " —১৬২৭ " ১৬৫৮ খ্রীঃ।

৬। তুলসী দাস—ইহার সময় ১৫৩৩ হইতে ১৬২৩ খ্রীঃ। হরিশ্চন্দ্র ঘাটে ইহার আশ্রম ছিল। ইহার সহিত মধুসূদনের সদ্ভাবের কথা শুনা যায়।

৭। অপ্পয় দীক্ষিত। ইহাকে মধুসূদন বিশেষ সম্মান করিতেন।

ইনি একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। মধুসূদন ইহাকে সর্ব্বতন্ত্র স্বতন্ত্রাচার্য্য বলিয়া গৌরব দেখাইয়াছেন। ইনি মধুসূদন হইতে বয়োজ্যেষ্ঠ। ইহার সময় ১৫২০ হইতে ১৫৯৩ খ্রীঃ পর্য্যন্ত।

৮। চন্দ্রদ্বীপের রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায়ের রাজত্ব কাল ১৫৮৬ খ্রীঃ। বিশ্বকোষে (১৪৫৪ পৃঃ) লিখিত আছে—রাফ্‌দিৎ প্রভৃতি বৈদেশিক ভ্রমণকারিগণ ইহার সৌজন্যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া ইহার গুণের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। ইহারই পুত্র রামচন্দ্র রায় মহারাজ প্রতাপাদিত্যের কন্যা বিবাহ করেন। ১৫৯৯ খ্রীঃ মেলকয়র ফন্‌সিক্‌ নামক একজন পর্টুগীজ ভ্রমণকারী চন্দ্রদ্বীপে আগমন করেন। তখন রাজা রামচন্দ্রের বয়স ৮ বৎসর মাত্র। সুতরাং ১৫৯১ খৃঃ রাজা রামচন্দ্রের জন্ম হয়। ১৬০৫ খ্রীঃ আকবরের মৃত্যুসময়ে রাজা রামচন্দ্র ১৪ চতুর্দ্দশবর্ষবয়স্ক বালক মাত্র।

ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, রাজা কন্দর্প নারায়ণের রাজত্ব কাল ১৫৮৬ খ্রীঃ হইলে এবং ১৫৯১ খ্রীঃ রাজা রামচন্দ্রের জন্ম হইলে কন্দর্পনারায়ণের রাজত্বের ৫ বৎসর পরে রাজা রামচন্দ্র প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। যদি রাজা কন্দর্প নারায়ণ ৪০ বৎসর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে (১৫৮৬—৪০=১৫৪৬) ১৫৪৬ খ্রীঃ রাজা কন্দর্প নারায়ণের জন্ম ধরা হইতে পারে। মধুসূদন ১৫২৫ খ্রীঃ জন্ম গ্রহণ করিলে, ও বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপের রাজসভায় ২০ বৎসর বয়সে গমন করিলে, (১৫২৫+২০=১৫৪৫) ১৫৪৫ খ্রীঃ হয়। ১৫৪৬ খ্রীঃ রাজা কন্দর্পনারায়ণ জন্ম গ্রহণ করিলে, বাক্‌লা রাজসভায় মধুসূদনের গমনের ১ এক বৎসর পরে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। সুতরাং, সহজেই বুঝা যাইতেছে যে, তখন কন্দর্পনারায়ণের পিতা জগদানন্দ রায় বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

মধুসূদনের বিরচিত সিদ্ধান্তবিন্দুর একখানি অনুলিপি পাওয়া গিয়াছে।

উহার লিপিকাল ১৫৩৯ শক (১৬১৭ খ্রীঃ)। ইহাতে অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে পারে যে,মধুসূদনের পরিপক্ক বয়সে ঐ গ্রন্থ রচিত হইয়া তাহার অনুলিপির কাল ধরিলে ঐ সময়ে মধুসূদনের জীবনের শেষভাগ। ৮০।৯০ বৎসরের পরে হওয়াও অযুক্ত নহে।

নারায়ণ ভট্টের সময়—১৪৯৫ হইতে ১৫৭৫ খ্রীঃ

নৃসিংহাশ্রমের সময়—১৪৯৭ " ১৫৭২ "

কাশীতে নৃসিংহাশ্রমের সহিত নারায়ণ ভট্টের যে বিচার হয়, তাহা অনুমান ১৫৫৪ খ্রীঃ, সুতরাং তখন—

নারায়ণ ভট্টের বয়স ৫৯ বৎসর

নৃসিংহাশ্রমের „ ৫৭ "

অপ্পয় দীক্ষিতের „ ৩৪ "

মধুসূদনের „ ২৪ "

সম্রাট্ আকবরের রাজত্ব সময়ে মধুসূদনের পাণ্ডিত্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তখন তাঁহার বয়স অনুমান ৪০ বৎসর। আকবর শাহ ১৫৪২ খ্রীঃ জন্মগ্রহণ করিয়া ১৫৫৬ খ্রীঃ ১৪ চৌদ্দ বৎসর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। মধুসূদনের প্রসিদ্ধির সময় তাহার বয়স অনুমান ২৩ বৎসর হইবে। সুতরাং, আকবর মধুসূদন হইতে ১৭ বৎসর বয়ঃ-কনিষ্ঠ হইতেছেন। তাহা হইলে সিদ্ধান্ত করা যায়, ১৫২৫ হইতে ১৫৩০ খ্রীঃ মধ্যে মধুসূদন জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

জগদীশ তর্কালঙ্কারের স্বহস্তলিখিত একখানি জ্যোতিষতত্ত্বের নকল পাওয়া গিয়াছে। তাহার লিপিকাল "রন্ধ্রান্ত বাণেন্দুমিতে শকাব্দে" অর্থাৎ ১৫৮৮ শক (১৬৬৬ খ্রীঃ)। গদাধরের জন্ম ১৬০৪ খ্রীঃ। মধুসূদনের সহিত যখন তাহার দেখা হয়, তখন তিনি বালক, বয়স ২০ কুড়ি বৎসর মাত্র। জগদীশের জ্যোতিষতত্ত্বের লিপি ৮০ বৎসর বয়সে হইলে, তাহার জন্ম সময় ১৫৮৬ খ্রীঃ। মধুসূদনের সহিত যখন দেখা হয়, তখন জগদীশের বয়স

৩৮ বৎসর। সুতরাং, গদাধর হইতে জগদীশ ১৮ বৎসর বয়োজ্যেষ্ঠ। এখন অনুমান করা যাইতে পারে ১৬২৪ খ্রীঃ মধুসূদন নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন। ১৫২৫ খ্রীঃ জন্ম হইলে মধুসূদনের বয়স তখন ৯৯ বৎসর। ১৫৩০ খ্রীঃ জন্ম হইলে ৯৪ বৎসর হয়।

৯। বিক্রমপুরের চাঁদরায় ও কেদার রায় ১৬০৮ খ্রীঃ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। যদি ঐসময়ে তাহাদের বয়স অন্ততঃ ৫০ পঞ্চাশ বৎসর হয়, তাহা হইলে, তাহারা ১৫৫৮ খ্রীঃ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। সুতরাং তাঁহার ৩০ বৎসর বয়সে (১৫৮৮ খ্রীঃ) চাঁদ রায়ের রাজসভায় যাদবানন্দ ন্যায়াচার্য্যের যে উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। তাহাদের সময়ে মধুসূদনও বর্ত্তমান ছিলেন।

১০। উড়িষ্যার গজপতিবংশীয় শেষ নরপতি মুকুন্দদেব ১৫৫২ খ্রীঃ রাজা হন। প্রবাদ অনুসারে মধুসূদন ২০ বৎসর বয়সে কাশীতে গিয়া ২৪ বৎসর বয়সে দণ্ডধারণপূর্ব্বক জগন্নাথ ক্ষেত্রে আগমন করেন ও সমুদ্রতীরে বিজন অরণ্যে ১৭ বৎসর তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। সুতরাং, সেই সময়ে মধুসূদনের বয়স ৪১ বৎসর ধরা যাইতে পারে। যদি ১৫২৫ খ্রীঃ মধুসূদনের জন্ম হয়,তাহা হইলে সিদ্ধিলাভের পরে জগন্নাথ ক্ষেত্র ত্যাগ করিবার সময়—(১৫২৫ + ৪১ = ১৫৬৬) ১৫৬৬ খ্রীঃ হয়। মুকুন্দদেবের রাজত্বকালে ভীষণ অরাজকতা ও দুর্ভিক্ষে উড়িষ্যা প্রদেশ জীবন মরণের সন্ধিস্থলে উপনীত হইয়াছিল। প্রবাদ আছে যে, রাজা মুকুন্দদেব ইহার শান্তির জন্য মধুসূদনের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। সুতরাং বুঝা যায়, মুকুন্দদেবের রাজত্বের ১৪ চৌদ্দ বৎসরের সময় (১৫৫২ + ১৪ = ১৫৬৬) জগন্নাথ ক্ষেত্রে মধুসূদন অবস্থিত ছিলেন। এই সময়েই অরাজকতার সূত্রপাত হয়। মধুসূদন বলিয়াছিলেন "অচিরেই তোমার রাজ্য যবনের করতল গত হইবে,পুরুষোত্তমদেবও তোমার প্রতি বিমুখ হইবেন"। ফলে তাহাই হইল। ১৫৬৭ খ্রীঃ বঙ্গেশ্বর সুলেমানের সেনাপতি কালাপাহাড় ইহাকে পরাজিত করিয়া, পুরীর পরম পবিত্র

জগন্নাথের মন্দির ধ্বংস করেন। শুনা যায়, গঙ্গা ও সরস্বতীর সঙ্গমোত্তরস্থ ত্রিবেণীর স্নানঘাট ইহারই নির্ম্মিত।

মুকুন্দদেবের পরে তৎপুত্র গৌড়িয়া গোবিন্দ রাজা হন। তাহার আমলে দেবদ্বেষী কালাপাহাড় জগন্নাথপুরী লুণ্ঠন করে। রাজা গোবিন্দ জগন্নাথের মূর্ত্তি লইয়া পলায়ন করেন। এইরূপে ১৯ বৎসর পর্য্যন্ত অরাজকতায় কাটিয়া যায়। পরে, ভূঁইঞা বংশীয় রামচন্দ্র দেব রাজা হন, এবং জগন্নাথের মূর্ত্তি আনাইয়া পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন।

পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ ও যুক্তি সমূহের দ্বারা ঐতিহাসিকেরা নিরূপণ করিয়াছেন যে, মধুসূদন ১৫২৫ খ্রীঃ হইতে ১৫৩০ খৃঃ মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। যোগিসম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও প্রবাদ আছে যে, মধুসূদনের যখন হরিদ্বারে অন্তর্দ্ধান হয়, তখন তাঁহার বয়স ১০৭ বৎসর হইয়াছিল। সুতরাং, ১৫২৫ খ্রীঃ জন্ম হইলে, তাঁহার অন্তর্দ্ধান কাল ১৬৩২ খ্রীঃ। ১৫৩০ খ্রীঃ জন্ম হইলে মহাপ্রয়াণ সময় ১৬৩৭ খ্রীঃ। মধুসূদনের আবির্ভাব কাল সঙ্ক্ষেপে প্রদর্শিত হইল। যাহারা এ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ জানিতে চাহেন, তাহাদের পক্ষে "অদ্বৈত সিদ্ধির" ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

মধুসূদনের আবির্ভাব কালে ভারতের রাজনৈতিকগগণ ঘোর-প্রলয়-ঘন-ঘটা সমাচ্ছন্ন। বৈদেশিক ম্লেচ্ছগণের আক্রমণে ও নৃশংসতায় ভারতের হিন্দুধর্ম্ম বিলুপ্তপ্রায়। সামাজিক শাসন তিরোহিত। হিন্দুর দেবতা ও দেবমন্দির সকল চূর্ণ বিচূর্ণীকৃত। লুণ্ঠনপরায়ণ দস্যুগণকর্ত্তৃক ভারতের ধনরত্ন অপহৃত, শাস্ত্র-গ্রন্থ সকল কৃশানুর উদরসাৎ হইতেছিল। ব্রাহ্মণ-গণ জাতিও ধর্ম্ম নাশ ভয়ে ইতস্ততঃ পলায়মান হইয়াছিলেন। এই পলায়-মান ব্রাহ্মণগণেরই অন্যতমের বংশে মহানুভব মধুসূদনের আবির্ভাব হইয়াছিল। তৎকালে বৈদিকধর্ম্ম বিলুপ্তপ্রায়। পৌরাণিকধর্ম্মের সহিত তন্ত্রশাস্ত্রের প্রবলতরঙ্গ তখন বঙ্গদেশকে প্লাবিত করিয়াছিল। বিচ্ছিন্নমূল বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব ও অলক্ষিতভাবে হিন্দুধর্ম্মে প্রবেশ

করিয়া আত্ম প্রকাশ করিতেছিল। এই সময়ে বাকৃলা চন্দ্রদ্বীপ ও সেন-বংশীয় রাজগণ প্রাভাতিক অস্তোন্মুখ নক্ষত্রমালার ন্যায় মিট্‌মিট্ করিয়া আত্ম প্রকাশ করিতেছিলেন। তখনও বঙ্গদেশ একেবারে স্বাধীনতা বিসর্জ্জন করে নাই।

এই সঙ্কট সময়ে প্রাদুর্ভূত মধুসূদনের শৈশবকাল অলৌকিক চরিত্রও অসাধারণ প্রতিভায় দেশবাসীকে মুগ্ধ করিয়া ভবিষ্যতের অত্যুজ্জ্বল চিত্রপটের বিকাশ করিয়াছিল। যথা সময়ে তাহার সংস্কার সকল সম্পন্ন হইলে, তিনি শাণোল্লিখিত মণির ন্যায় আরও রমণীয়তা ধারণ করিলেন। আমাদের মনে হয় নিষ্ঠাবান্ পণ্ডিত-ধুরন্ধর পুরন্দরাচার্য্য

"ব্রহ্মবর্চ্চসকামস্য কার্য্যং বিপ্রস্য পঞ্চমে"

এই শাস্ত্রাদেশ অনুসারে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় তাহাকে পঞ্চম বর্ষেই উপনীত করিয়াছিলেন। দেশ ও বংশের আচার অনুসারে যথা নিয়মে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া তিনি পণ্ডিত কুলাগ্রগণ্য পিতার নিকটেই শাস্ত্রাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার শিষ্টতা, বিনয়, সৌজন্য ও শাস্ত্রপ্রতিভা বর্ষীয়ান্ গুরুর ও বিস্ময় উৎপাদন করিল।

জন্মান্তরীয় সংস্কারের অনুবন্ধবশতঃ বাল্যকালেই তাঁহার অসাধারণী কবিত্বশক্তি বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। গ্রামবাসী সকলেই আগ্রহপূর্ব্বক বালক মধুসূদনের সহিত শাস্ত্রালাপে প্রবৃত্ত হইতেন এবং নিত্য নূতন তাহার কবিত্ব শক্তির উন্মেষ দেখিয়া পুলকিত হইতেন। সকলেই তাহাকে তপোভ্রষ্ট জাতিস্মর মনে করিয়া, "তাহার অভীষ্টসিদ্ধি হউক" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইতেন। এই অমোঘ ব্রাহ্মণগণের আশার্ব্বাদই তাহার সকল বিঘ্ন দূর করিয়া তাঁহাকে অভীষ্টমার্গে গমন করিবার পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিল। বস্তুতঃ, গ্রামবাসী অনেক বৃদ্ধ পণ্ডিতগণও আহার নিদ্রা বর্জিত হইয়া নিরন্তর জ্ঞান বৃদ্ধ মধুসূদনের সহিত শাস্ত্রালোচনায় নিজেদের অনেক সংশয় নিরাকরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

নবদ্বীপে মধুসূদন।

এই সময়ে বঙ্গদেশে একটী নূতন যুগের আবির্ভাব হইয়াছিল। নব্য-ন্যায়ের সৃষ্টিকর্ত্তা গঙ্গেশোপাধ্যায়ের "তত্ত্ব চিন্তামণি" দ্বৈতবাদ সংরক্ষণে পাশুপতরূপে ভারতের প্রত্যেক গৃহে সযত্নে রক্ষিত হইতেছিল। তার্কিক-শিরোমণি রঘুনাথের দীধিতি গ্রন্থ ব্রহ্মাস্ত্ররূপে জ্ঞানালোকের আকরভূমি মিথিলার গর্ব্ব ও খর্ব্ব করিতে সমর্থ হইয়াছিল। মথুরানাথ তর্কবাগীশ, জগদীশ তর্কালঙ্কার, হরিরাম তর্কবাগীশ,গদাধর ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি মহর্ষিকল্প পণ্ডিত ধুরন্ধরগণ জ্ঞান সাম্রাজ্যের সম্রাট্‌রূপে নবদ্বীপে বিরাজমান ছিলেন। অপর দিকে নবদ্বীপ-প্রস্রবণ সমুদ্‌ভূত মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের প্রেম ও ভক্তির বন্যায় ভারতবর্ষ প্লাবিত হইতেছিল। কিছুদিনের মধ্যেই মহর্ষি-কল্প রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের বর্ণাশ্রমরক্ষী তত্ত্বগ্রন্থ সকল সম্মোহন-বাণরূপে জগৎকে মুগ্ধ করিয়া হিন্দুজাতির বৈশিষ্ট্য ও আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। যদি এ সময়ে পরম পিতা পরমেশ্বরের কৃপাদৃষ্টি লাভ করিতে ভারতবর্ষ বঞ্চিত হইত, তাহা হইলে, বিধর্ম্মী ম্লেচ্ছগণের ভীষণ অত্যাচার ও প্রলয়-জলধিজলের ন্যায় কূটতার্কিক বৌদ্ধ-মতবাদের প্রবল আক্রমণে পৃথিবী হইতে চিরকালের জন্য হিন্দুর নাম বিলুপ্ত হইত। উদয়-গিরিশিখরের ন্যায় বঙ্গের নবদ্বীপে ভারত-গৌরব-রবির প্রাভাতিক অরুণিমা ভারতের নিখিল বিঘ্ন-তিমির তিরোহিত করিয়া প্রকাশ পাইতেছিল।

এই সময়ে মধুসূদনের ব্যাকরণাদি শাস্ত্রের অধ্যয়ন শেষ হইয়াছিল। সুতরাং, এই শুভমুহূর্ত্তে আশার আলোকে উৎসাহিত হইয়া, আচার্য্যপুরন্দর জ্ঞান-রাজ্যের প্রধান প্রস্রবণ নবদ্বীপধামে পুত্রকে পাঠাইতে কৃতসংকল্প হইলেন। ভারতের জ্ঞান-রাজ্যের ভাবী সম্রাট্ মধুসূদন ও পিতার আদেশ অনুসারে শুভদিনে ও শুভমুহূর্ত্তে ন্যায়শাস্ত্র পড়িবার জন্য নবদ্বীপধামে গমন করিলেন।

কয়েকদিন পরেই পথশ্রান্ত মধুসূদন অতি কষ্টে পদব্রজে নবদ্বীপধামে

উপনীত হইলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া নবদ্বীপের অলৌকিক সমৃদ্ধি দর্শনে তিনি যার পর নাই পুলকিত ও বিস্মিত হইলেন। মনে হইল, যেন জগতের অশেষ সৌন্দর্য্যরাশি একত্র করিয়া দেখিবার বাসনায় জগৎ স্রষ্টা বিধাতা এই বিচিত্র নবদ্বীপ নগরীর সৃষ্টি করিয়াছেন। দেখিলেন, তরঙ্গ-বাহু উত্তোলন করিয়া কল-কলনাদিনী কলিকলুষ-হরা ভগবতী ভাগীরথী তাহাকে ক্রোড়ে করিবার জন্যই যেন আহ্বান করিতেছেন। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের হরিনামামৃত তাহার কর্ণকুহরে অমৃতধারা সিঞ্চন করিতেছে। পক্ককেশ অধ্যাপকগণ বহুলশিষ্য পরিবৃত হইয়া নানাগ্রন্থের অধ্যাপনায় ব্যাপৃত রহিয়াছেন। দেখিলে মনে হয়, যেন প্রবল কলির আক্রমণে ভীত হইয়া মূর্ত্তিমান্ সত্যযুগ ব্রহ্মণ্যদেবের শরণাপন্ন হইয়াছেন। কোথাও সমাধিমগ্ন যোগীর ন্যায় আহারনিদ্রা বর্জ্জিত অন্তেবাসিগণ কখনও বা ভাগীরথার পবিত্র পুলিন দেশে, কখনও ন্যগ্রোধ-পাদপ ছায়ায়, কখনও বা পুষ্পোদ্যানে কুশাসনোপরি শাস্ত্রচিন্তায় নিরত রহিয়াছেন। কোথাও অন্তেবাসিগণ বাদযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া রোষকষায়িতলোচনে আত্ম-পক্ষ সমর্থনের জন্য গ্রন্থরাশি হইতে প্রমাণ সমূহ প্রদর্শন করিতেছেন। কোথাও বাদি ও প্রতিবাদিগণ মতভেদ সমাধানের জন্য আচার্য্যের নিকট উপদেশপ্রার্থী হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। কোথাও কোন সাধক দিঙ্মণ্ডলকে ধূপ ও গুগ্‌গুলের গন্ধে আমোদিত এবং ঘণ্টা ও শঙ্খ ধ্বনিতে মুখরিত করিয়া ইষ্টদেবতার পূজায় ব্যাপৃত রহিয়াছেন। কোথাও অল্পধী অন্তেবাসিগণ শাস্ত্রার্থগ্রহণে অসমর্থতা প্রযুক্ত অধ্যাপক কর্তৃক তিরস্কৃত হইয়া মনের ক্ষোভে বিশিষ্ট-বিদ্যালাভের জন্য জ্ঞানাধিষ্ঠাত্রী বাগ্‌দেবীর মন্ত্র পুরশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অরুণোদয়কালে প্রাতঃস্নান, সন্ধ্যাও তর্পণাদি সমাপন করিয়া, শ্রুতিমধুর স্তবপাঠ করিতে করিতে প্রতি-নিবৃত্ত তিলক ও শিখাধারী নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণদিগকে দেখিয়া বৈখানস বলিয়া মনে হইত। বস্তুতঃ, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পবিত্র নিকেতন, ত্রিস্রোতা ভাগীরথীর

ন্যায় জ্ঞান, ভক্তি ও প্রেমের নির্ম্মল মূলাধার নবদ্বীপধামে উপস্থিত হইয়া, মধুসূদনের চিত্তবৃত্তি নির্ম্মল ও উদার হইল, সংসারের অনিত্যতা তাহার হৃদয়ে দৃঢ়সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিল। বৈরাগ্যের প্রথম সুদৃঢ়বীজ তাহার প্রশস্ত নির্ম্মল হৃদয়ক্ষেত্রে রোপিত হইল। জ্ঞানের প্রবল আকাঙ্ক্ষা ভক্তি ও প্রেমের সহিত মিশ্রিত হইয়া, তাহাকে এক নূতন রাজ্যে লইয়া গেল, যেখানে গেলে তাহার ভবিষ্যৎ প্রার্থনীয়—

"দ্বন্দ্বাতীতং ত্রিগুণরহিতং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যং"

ইহার সন্ধান পাইবেন। এইরূপে মধুসূদন কয়েক দিন নবদ্বীপে অতিবাহিত করিলেন।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে মধুসূদন বালক, বয়স দ্বাদশবর্ষ মাত্র। এরূপ অল্পবয়সে এত দূরদেশে তিনি কিরূপে গমন করিলেন, ইহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। তাহার এই গমন বৃত্তান্তে শিশু শঙ্করাচার্য্যের গৌড়পাদোদ্দেশে গমনের কথা মনে পড়ে। ম্লেচ্ছের আক্রমণে দেশ যখন অরাজকতায় পূর্ণ, দস্যু তস্করের পৈশাচিক তাণ্ডব-লীলায় জাতি,ধর্ম্ম,মান, ধন যখন বিলুপ্তপ্রায়, তখন প্রচুর নদ, নদী ও হিংস্র-জন্তু পরিবৃত গভীর অরণ্যানীর মধ্য দিয়া সুদূর পথ অতিক্রম করা কি বালক মধুসূদনের পক্ষে বিস্ময়কর নহে? কিন্তু একটু প্রণিধানের সহিত চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে, ভগবান্ জগতে জ্ঞান-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার জন্য আদেশ পত্র দিয়া যাহাকে পাঠাইয়াছেন, তাহার আবার ভয় কোথায়? ভগবান্ই তাহার সহায় ও রক্ষক। কবিচূড়ামণি শ্রীহর্ষ বলিয়াছেন—

"ক্ব ভোগমাপ্নোতি ন ভাগ্যভাগ্ জনঃ"।

অর্থাৎ; ভাগ্যবান্ ব্যক্তির ভোগের উপকরণ সামগ্রী কোথায় পাওয়া না যায়? মধুসূদনের নবদ্বীপ গমন পথে পঞ্চভূতই তাহার অনুকূল হইল। পৃথিবী কাঠিন্য পরিত্যাগ করিয়া বিলাসিনীগণের পুষ্পাস্তৃতবিলাস ভবনের ন্যায় কোমল কলেবর মধুসূদনের সুখ-সঞ্চরণযোগ্য হইল। মার্গস্থ বহুশাখ

পাদপ সকল তাহার বিশ্রাম স্থান হইল। বিমল সরোবর-সলিলরাশি যেন তাহার তৃষ্ণানিবৃত্তির জন্য প্রস্তুত থাকিল। ছায়াশূন্য স্থানে মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড যেন স্বকীয় তেজোরাশি মেঘমণ্ডলে আবৃত করিয়া তাহার পথ-গমন ক্লেশ দূর করিলেন। মৃদু সমীরণ প্রবাহিত হইয়া তাহার পথ শ্রান্তি-জনিত ঘর্ম্মরাশি বিদূরিত করিল। সুনীল নভোমণ্ডল যেন তাহার চিদাকাশের ব্যাপকতা ও নির্লিপ্ততা অনুভব করাইয়া দিল।

এইরূপে সুদূর নবদ্বীপে উপনীত হইয়া, বালক মধুসূদন সেই স্থানের সর্ব্ব প্রধান অধ্যাপকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার অভিলাষী হইয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে পণ্ডিত কুলধুরন্ধর নৈয়ায়িক চূড়ামণি তত্ত্ব-চিন্তামণি ব্যাখ্যাকার মথুরানাথ তর্কবাগীশ মহাশয় নৈয়ায়িকের প্রধান আসন পরিগ্রহ করিয়া নবদ্বীপের গৌরব রক্ষা করিতেছিলেন। মধুসূদন যাহার নিকটই নবদ্বীপের প্রধান পণ্ডিতের কথা জিজ্ঞাসা করেন, সেই মথুরানাথের কথা বলে। সুতরাং, তিনি আনন্দিত চিত্তে মনোবাসনা পূরণ-মানসে কল্পিত গুরু মথুরানাথের ভবনোদ্দেশে সাগ্রহে গমন করিলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মহাসাগরের পুলিন দেশের ন্যায় স্তূপীকৃত পুস্তকরাশির মধ্যে জ্ঞান-রত্নাকরের অন্তস্তল হইতে উত্থিত ভাসমান মহামণির ন্যায় এক তেজঃপুঞ্জ-কলেবর প্রৌঢ়বয়স্ক মহামনীষী শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত আছেন। দেবমূর্ত্তির ন্যায় তাঁহার শান্তসৌম্যমূর্ত্তি সহজেই মধুসূদনকে আকর্ষণ করিল। মধুসূদন সেই শিষ্যগণ পরিবৃত পণ্ডিতরাজকে দর্শন করিয়া কুলপতি ঋষির আশ্রম বলিয়া মনে করিলেন। তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে পণ্ডিতবরের নিকট দণ্ডায়মান হইলে, তাঁহার সস্নেহ দয়ার্দ্রদৃষ্টি মধুসূদনের দিকে নিপতিত হইল। তিনি দেবশিশুর ন্যায় কমনীয়াকৃতি মধুসূদনকে বারংবার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। মনে করিলেন, কোন দেবশিশু ছদ্মবেশে কোন গূঢ় অভিসন্ধি সিদ্ধি করিবার জন্য এখানে উপনীত হইয়াছে। তাহার অন্তর্নিহিত তেজোরাশি বহির্ভাগে

প্রকটিত হইয়া দেবত্ব ব্যক্ত করিতেছে। তিনি নানারূপ চিন্তা করিয়া, পরিশেষে তাঁহার বিশেষ পরিচয় ও আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বালক মধুসূদন বিনীতভাবে নিজ পরিচয় প্রদান করিয়া নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। তাহার কি পর্য্যন্ত পড়া শুনা হইয়াছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া তুই একটী পঠিত গ্রন্থের আলোচনায় তাহার অসাধারণী প্রতিভার পরিচয় পাইয়া পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, বাবা! তোমার শাস্ত্রজ্ঞান, বিনয় ও শিষ্টাচার দেখিয়া আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। কিন্তু, আমার সময় বড় কম, উচ্চশ্রেণীর পণ্ডিতকল্প ছাত্রগণের অধ্যাপনায়ই আমার অনেক সময় অতিবাহিত হয়। তাহার পরে নিজের সন্ধ্যা, আহ্নিক ও গ্রন্থলেখা ত আছেই। অতএব আমি তোমার হিতের জন্যই বলিতেছি, তুমি পণ্ডিত প্রবর হরিরাম তর্কবাগীশের নিকট যাও, তিনি ন্যায়শাস্ত্রে অতি বিচক্ষণ ও তোমার মত অধিকারী ছাত্রকে তিনি বিশেষ যত্নের সহিত পড়াইবেন। মধুসূদন মথুরানাথ তর্কবাগীশের আদেশ ও উপদেশ অনুসারে, হরিরাম তর্কবাগীশের নিকট গমন করিয়া সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। হরিরাম তাঁহার অভিপ্রায় শুনিয়া বলিলেন—আচ্ছা বাবা! বেশ তো, পড়া শুনা করিবে, এখানেই থাক, আমি নিজেই তোমাকে পড়াইব। এখানে পণ্ডিত মহাশয়ের নিজে পড়াইবার অঙ্গীকারের তাৎপর্য্য এই যে, প্রবীণ অধ্যাপকের নিকট বহু ছাত্র শিক্ষার্থীভাবে উপস্থিত হইয়া থাকে। সময়ের অভাবে তাহাদের প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পড়ান একজন অধ্যাপকের পক্ষে সম্ভবপর নহে। এজন্য অধ্যাপকের অনুমতিক্রমে প্রথম শিক্ষার্থীরা প্রধান শিক্ষার্থীদিগের নিকট পাঠ অভ্যাস করিয়া থাকেন। কিন্তু অধ্যাপকের নামেই ছাত্রগণ পরিচিত হইয়া থাকেন। প্রথম শিক্ষার্থী হইলেও, মধুসূদনের বিশেষ প্রতিভা দর্শন করিয়া তাহার অধ্যয়নের ভার তিনি নিজেই গ্রহণ করিলেন। কেহ কেহ বলেন, হরিরাম তর্কবাগীশের উপাধি "তর্কবাগীশ" নহে, "সিদ্ধান্তবাগীশ"।

যাহা হউক, এইবার মধুসূদন ন্যায়শাস্ত্র পাঠে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্যকর্ম্মা হইয়া নিরন্তর প্রণিধানের সহিত শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত থাকায়, অতি অল্পকাল মধ্যেই তিনি কর্কশ তর্কশাস্ত্রের নিগূঢ় মর্ম্ম অবগত হইতে সমর্থ হইলেন। ইহাতে গুরুর উপদেশ শ্রবণ, তাহার আলোচনা, তৎপরে আলোচিত নিগূঢ়তত্ত্বের ধারণা দ্বারা তাহার ভবিষ্যৎ আত্মসাক্ষাৎকারের অনুকূল শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন সম্পন্ন হইতে লাগিল।

এদিকে বালক মধুসূদনের অদর্শনে তাহার পিতা ও মাতা অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। জ্যেষ্ঠ যাদবানন্দ ও প্রাণপ্রতিম কনিষ্ঠের বিরহে নিতান্ত দুঃখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। পরে পরামর্শ স্থির হইল, যাদবানন্দও নবদ্বীপে মধুসূদনের সহিত অধ্যয়ন করিয়া, পাঠসমাপ্তির পর উভয়ে একত্র হইয়া দেশে ফিরিবেন। কার্য্যতঃ তাহাই হইল, যাদবানন্দ শুভদিনে শুভমুহূর্ত্তে যাত্রা করিয়া পদব্রজে সুদূর নবদ্বীপে যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া, প্রাণাধিক সহোদর মধুসূদনের সহিত মিলিত হইলেন। উভয়ে একই অধ্যাপকের নিকটে শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া অতি অল্পকালের মধ্যেই ন্যায়শাস্ত্রের কঠিন কঠিন গ্রন্থগুলি সম্যক্‌রূপে আয়ত্ত করিয়া বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। তাহাদের এইরূপ যোগ্যতা দর্শন করিয়া ঈর্ষ্যান্বিত ছাত্রগণও পরাভব স্বীকার পূর্ব্বক সদ্ভাব স্থাপন করিলেন। ছাত্র কৃতবিদ্য হইলে, অধ্যাপকের আর আনন্দের সীমা থাকে না। সুতরাং, রাম, লক্ষ্মণের ন্যায় দুইটী ছাত্রকে কৃতবিদ্য দেখিয়া, তর্কবাগীশ হরিরাম উপযুক্ত পাত্রে অধ্যাপন সাফল্য দেখিয়া নিজকে কৃতার্থ মনে করিলেন। উভয়েই বহুকাল পরে পিতামাতার দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। সুতরাং, দেশে যাইবার জন্য অধ্যাপকের অনুমতি গ্রহণ করিলেন। অধ্যাপক মহাশয় তাহাদিগকে নানা প্রকার সদুপদেশ ও আশীর্ব্বাদ প্রদান পূর্ব্বক যাদবানন্দকে ন্যায়শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ উপাধি সূচক "ন্যায়াচার্য্য"ও মধুসূদনকে নানাশাস্ত্রে অসাধারণী প্রতিভার জন্য "সরস্বতী" উপাধি দ্বারা ভূষিত করিয়া

বিদায় দিলেন। বলা বাহুল্য, তৎকালে নবদ্বীপ ভিন্ন অন্য কোন স্থানের পণ্ডিতগণেরই উপাধি দান করিবার অধিকার ছিল না। কেহ ঐরূপ উপাধি গ্রহণ করিলেও সে ব্যক্তি সমাজে পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইত না, বা পণ্ডিতসমাজে আদৃত হইত না।

কেহ বলেন, মধুসূদন ন্যায়শাস্ত্রে নৈয়ায়িক-চূড়ামণি মথুরানাথ তর্কবাগীশের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। বস্তুতঃ, নবদ্বীপের নৈয়ায়িকপ্রবর মহামহোপাধ্যায় ৺রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি যে, মধুসূদন নবদ্বীপের অন্যতম প্রধান নৈয়ায়িক হরিরাম তর্কবাগীশের ছাত্র। তাঁহার এই উক্তিই সত্য বলিয়া মনে হয়। কেননা, তাহা হইলে, নবদ্বীপে মধুসূদনের পুনরাগমন কালে "চকম্পে তর্কবাগীশঃ" ইত্যাদিরূপ প্রবাদে মথুরানাথ তর্কবাগীশকেই লক্ষ্য করা যাইতে পারে। তিনি অধ্যাপক হইলে, "চকম্পে" কথাটা খাটে না।

ভ্রাতৃদ্বয় মিলিত হইয়া পদব্রজে নবদ্বীপ হইতে রওয়ানা হইয়া যথা সময়ে বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। অশ্বিনীকুমার দ্বয়ের ন্যায় কৃতবিদ্য পুত্র দুইটীকে পাইয়া পিতামাতার আর আনন্দের সীমা রহিল না। আচার্য্য পুরন্দর কিছুকাল আনন্দের সহিত স্ত্রীপুত্র-পরিবৃত হইয়া সাংসারিক শান্তি অনুভব করিতে লাগিলেন। গ্রামের সাধারণলোকেই কৃতবিদ্য পণ্ডিতদ্বয়ের সহিত শাস্ত্রালোচনায় পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিলেন।

শুনা যায়, এক সময়ে মধুসূদন মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের ভক্তি ও প্রেমের বন্যায় ভাসমান হইবার উপক্রম হইলে, নির্ম্মল জ্ঞানরূপ কর্ণধার তাহাকে রক্ষা করিয়াছিল। তখন তিনি সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, মহাপ্রভুর দ্বৈতবাদের অপ্রতিকূল ভক্তিভাবমিশ্রিত দ্বৈতবাদ মূলক একখানি অকাট্য গ্রন্থ রচনা করিবেন, যাহা সাদরে সকল সম্প্রদায়ের পণ্ডিতেরা গ্রহণ করেন।

বস্তুতঃ, দ্বৈতকেশরী গঙ্গেশের "তত্বচিন্তামণি" দ্বৈতবাদের অব্যর্থ অস্ত্র বলিয়া তাহার হৃদয়ে প্রতিফলিত হইয়াছিল, এবং ইহার সহিত নিজের অসাধারণী প্রতিভা ও ভক্তিরস মিশ্রিত করিয়া সাধারণের ভোগ্য ও আদরণীয় একটী মোদক প্রস্তুত করিবার বাসনা বলবতী হইয়াছিল।

আম-করে বৈরাগ্য

এই সময়ে, কোটালীপাড়া বাকলা-চন্দ্রদ্বীপের রাজার অধীনে ছিল। তখন চন্দ্রদ্বীপের রাজসিংহাসনে রাজা জগদানন্দ রায় সমাসীন ছিলেন। এই সময়ে ভারতবর্ষে হিন্দুর রাজত্ব প্রায় বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছিল, ম্লেচ্ছাধিকার ভারতবর্ষকে প্রায় গ্রাস করিয়াছে, কেবল বঙ্গদেশে কয়েকটী ক্ষুদ্ররাজ্য অস্তোন্মুখ চন্দ্রমার ন্যায় ক্ষীণপ্রভ হইয়া অতি কষ্টে আত্মরক্ষা করিতেছিলেন, এবং ম্লেচ্ছ-রাহুর আক্রমণের প্রতীক্ষায় সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিলেন।

আচার্য্য পুরন্দরের বাড়ীতে প্রচুর আমগাছ ছিল। সুতরাং, রাজার আদেশ ছিল, প্রত্যেক বৎসর স্বয়ং উপস্থিত হইয়া পুরন্দরকে আমকর দিয়া আসিতে হইবে। তখন অন্য কোন খাজনা দিতে হইত না, কেবল নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক আমই রাজসরকারে খাজনারূপে গৃহীত হইত। বর্ষীয়ান্ পুরন্দরের পক্ষে প্রত্যেক বৎসর স্বয়ং উপস্থিত হইয়া দূরবর্ত্তী মাধবপাশা রাজধানীতে উহা পৌছাইয়া দেওয়া বড় কষ্টকর বোধ হইত। এজন্য তিনি মনে করিলেন যে, এবার রাজার নিকট আবেদন করিবেন যে, তিনি প্রাচীন বলিয়া স্বয়ং উপস্থিত হইয়া আমকর দিতে অসমর্থ, সুতরাং অন্যের দ্বারা প্রেরিত হইলেও যেন তাহা রাজসরকারে গৃহীত হয়, অথবা ঐ কর আদায়ের জন্য স্থানীয় কর্ম্মচারীর প্রতি ভার অর্পিত হয়।

এদিকে মধুস্থদনের পাণ্ডিত্য ও অসাধারণী কবিত্বশক্তি অল্পকালের মধ্যেই দেশ বিদেশে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। পুরন্দর মনে করিলেন, এবার আমকর দিবার সময়, কৃতবিত্ত স্থকবি মধুস্থদনকে সঙ্গে লইয়া যাইবেন। তাহার খুব আশা ছিল, বিদ্যোৎসাহী ও গুণগ্রাহী রাজা জগদানন্দ রায় মধুস্থদনের পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব প্রতিভা দর্শন করিলে, হয়ত আমকর একেবারেই তিরোহিত করিয়া, তাহার ভূসম্পত্তি নিষ্কর করিয়া দিবেন, না হয়, অন্যদ্বারা প্রেরিত হইলেও রাজসরকারে আমকর গৃহীত হইবে এইরূপ আদেশ পাওয়া যাইবে। নিতান্ত পক্ষে স্থানীয় রাজকর্ম্মচারীর উপর ও ঐ কর আদায়ের ভার অর্পিত হইতে পারে। এইরূপ নানা-প্রকার কল্পনা করিয়া, পুরন্দর মধুস্থদনকে সঙ্গে লইয়া নৌকাযোগে মাধব-পাশার অভিমুখে রওনা হইলেন। ২।৩ দিন নৌকায় ক্লেশ সহ্য করিয়া পুরন্দর রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া তাহার আগমন বার্ত্তা জানাইলে, রাজকীয় নিয়মানুসারে তাহার বাসস্থান ও খাওয়ার ব্যবস্থা হইল। পুরন্দর করগ্রহণের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নিকট কর অর্পণ করিয়া, রাজনির্দ্দিষ্ট ভবনে গমন করিলেন ও নিয়মিত সন্ধ্যা পূজা প্রভৃতি সমাপন করিয়া আহারান্তে কিছুকাল বিশ্রাম পূর্ব্বক রাজসাক্ষাৎকারের উপায় অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন।

কি অশুভক্ষণেই পুরন্দর যাত্রা করিয়া বাটী হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন, বলা যায় না। অনেক চেষ্টায় রাজার সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন, মধুস্থদনের পরিচয় দিলেন, মধুস্থদনও তাহার স্বভাবসুলভ বিনয় ও সৌজন্য মিশ্রিত মধুর বচনে রাজাকে অশীর্ব্বাদ করিলেন। রাজাও তাহার মধুর ও কমনীয় আকৃতি, বাক্চাতুর্য্য, পাণ্ডিত্য ও কবিত্বশক্তি দর্শনে মুগ্ধ হইলেন। কিন্তু সদাশয়, বিদ্যোৎসাহী, গুণগ্রাহী ও ব্রাহ্মণপ্রিয় রাজা কিছুতেই তাহার আদেশ প্রত্যাহার করিলেন না। বলিলেন, আপনার মত পণ্ডিত ও সাধুপুরুষের পদধূলি হইতে আমি কখনও বঞ্চিত হইতে পারিব না। মধুস্থদন স্বরচিত

কবিতাগুলি মনোযোগের সহিত শুনিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলে, রাজা ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক বিনীতভাবে বলিলেন, আচ্ছা, সময়ান্তরে শুনিব। আপনি আর একদিন আমার সহিত দেখা করিবেন। বস্তুতঃ, ম্লেচ্ছ-কর-কবলিত হওয়ার আশঙ্কায় সর্ব্বদা বিষাদগ্রস্ত ও উদ্বিগ্ন রাজা জগদানন্দ রায় তখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ও উন্মনস্ক ছিলেন। বংশোচিত সৌজন্য ও বিনয় কেবল মৌখিকভাবেই প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু আন্তরিক নহে। আমাদের মনে হয়, চন্দ্রদ্বীপের অধীশ্বর, দাতা, সজ্জনপ্রিয়, বিদ্যোৎসাহী, গুণগ্রাহী, ব্রাহ্মণসেবক ও ব্রাহ্মণপ্রতিপালক বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাহার পক্ষে, এইরূপ প্রাচীন, পণ্ডিত ও নিষ্ঠাবান্ ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণের আদেশ প্রতিপালন না করা কোন প্রকারেই সম্ভাবিত নহে। কিন্তু, তাহার আদেশ প্রত্যাহার না করার দৃঢ়তায় স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, মধুস্থদনের ভবিতব্যতা বিবেচনা করিয়া,জগতের মঙ্গলের দিকে চাহিয়া, বিশ্ববিধাতা দুষ্ট-সরস্বতীকে পাঠাইয়া তাহার বুদ্ধি-বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছিলেন। যদি পুরন্দরের প্রার্থনা পূর্ণ হইত, তাহা হইলে মধুস্থদনের এ প্রবল বৈরাগ্য আসিত কিনা সন্দেহ। আমাদের স্থূলবুদ্ধিতে না বুঝিলেও পরম-মঙ্গল নিদান ভগবান্ জগতের মঙ্গল সাধনে নিরন্তর নিরত আছেন। তাই তিনি জগতের উপদ্রবকারী দুষ্ট নিশাচর দশাননকে নিহত করিবার জন্যই ভগবান্ রামচন্দ্রকে বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটাইয়া কনকময় মৃগের অন্বেষণে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

আচার্য্য পুরন্দর রাজ-প্রসাদ প্রত্যাশায় কয়েকদিন রাজধানীতে অবস্থান করিলেন। অতিকষ্টে ২।৩ দিন রাজার সহিত সাক্ষাৎ ও করিলেন, কিন্তু কোনও ফল হইল না। বিমনায়মান রাজা পুরন্দরের তুষ্টি সম্পাদনে সমর্থ হইলেন না। রাজার এইরূপ ব্যবহারে পুরন্দর অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, এবং গৃহাভিমুখে গমন করিবার সঙ্কল্প করিলেন।

আমরা শুনিয়াছি, মধুস্থদন রাজপ্রশস্তিস্থচক শ্লিষ্টার্থ ৫৪টী শ্লোক রচনা

করিয়াছিলেন। আমরা বহু অনুসন্ধানেও ঐ শ্লোকগুলি সংগ্রহ করিতে পারি নাই। বস্তুতঃ, রাজা ঐ উভয়ার্থক শ্লোকগুলি শুনিয়া, বালক মধুসূদনের কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যে অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি কিভাবে মধুসূদনকে পুরস্কৃত করিবেন, তাহাই ভাবিতেছিলেন। কিন্তু, মধুসূদন রাজার মৌনভাব দর্শন করিয়া, বিপরীত অর্থ গ্রহণ করিলেন। মধুসূদনের ভবিষ্যৎ মঙ্গলময় জীবনের দিকে লক্ষ্য করিয়া, বিশ্ববিধাতার ইচ্ছায় মধুসূদনের নির্ম্মলা কল্যাণী বুদ্ধি ও মহারাজের মনোগত ভাব বুঝিতে সমর্থ হয় নাই।

যাহাহউক, এদিকে মধুসূদন এইরূপে রাজা কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া নিতান্ত অপমান বোধ করিলেন। অন্তর্মর্দ-বন্যকরীর ন্যায় ও পদাহত কৃষ্ণ-সর্পের ন্যায় তাহার তেজোরাশি বহিরবয়বে প্রকাশ পাইতে লাগিল। যদিও তিনি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ছিলেন,তথাপি তাহার শমগুণে ধৈর্য্যচুতি ঘটিল না। কিন্তু তেজস্বিতার সহিত জলদ-গম্ভীরস্বরে বলিলেন, মহারাজ! আপনার বৈমুখ্যদর্শনে আমি ও আমার পূজনীয় পিতৃদেব নিতান্ত অপমানিতহইয়াছি ব্রাহ্মণ সকলই সহ্য করিতে পারে, কিন্তু অপমান সহ্য করিতে পারে না। ব্রাহ্মণের ঐটুকই মহত্বও বিশেষত্ব। ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করিতে পারে, উপবাসী থাকিতে পারে, শীতাতপক্লেশ সহ্য করিতে পারে, কিন্তু মর্য্যাদাহানিকে মৃত্যু অপেক্ষাও ক্লেশকর মনে করে। মহারাজ! আপনার প্রসাদলাভের চেষ্টায় যে সময় অতিবাহিত হইল, এতকাল সর্ব্বকামনা-প্রপূরক পরম মঙ্গল-নিদান ভগবানের উপাসনা করিলে অধিকতর ফল লাভ হইত। যিনি নিমেষমাত্রে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও লয় করিতে পারেন, যিনি আপনার মত রাজাকে মুহূর্ত্তমাত্রে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত ও সিংহাসন-চ্যুত করিতে পারেন, তাঁহার শরণাপন্ন না হইয়া, আপনার কৃপাপ্রার্থী হওয়া নিতান্ত মূর্খতার কার্য্যই হইয়াছে। যাহা হউক, মহারাজ! আমরা চলিলাম, এই ব্রাহ্মণমণ্ডলী, রাজসভা, আপনি ও চন্দ্রসূর্য্যকে সাক্ষী করিয়া অঙ্গীকার করিতেছি যে, "এ জীবনে আর মনুষ্যের উপাসনা করিব না"।

এই বলিয়া ক্রুদ্ধ আশীবিষের ন্যায় সেই তেজঃপ্রদীপ্ত ব্রাহ্মণদ্বয় তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তাহাদের ক্রোধবহ্নি-স্ফুলিঙ্গ দ্বারা রাজসভা প্রদীপ্ত হইল। তাহাদের তেজস্বিতা দেখিয়া সভাসদেরাও বিস্মিত এবং চমকিত হইলেন। রাজাও একজন সামান্য প্রজার রাজসমক্ষে এইরূপ তেজস্বিতা ও নির্ভীকতা দেখিয়া, মনে মনে ব্রাহ্মণজাতির বিধাতৃ-প্রদত্ত অধিকার—স্পষ্টবাদিতা ও ন্যায়ানুবর্ত্তিতার প্রশংসা করিয়া, ব্রাহ্মণ অপমানের ভাবী অনিষ্ট ফলাশঙ্কায় ভীতচিত্তে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে পুরন্দরও বিষণ্ণমনে পুত্রের সহিত মিলিত হইয়া বাটীর দিকে নৌকাযোগে যাত্রা করিলেন। মধুসূদনের তীব্র বৈরাগ্য উপস্থিত হইল। সংসারের নশ্বরতা-বোধ তাহার প্রতিজ্ঞাবাক্যের অনুকূল হইল। পথে পথে পিতা পুত্রে এ বিষয়ে বহু আলোচনা হইল। ক্রমে তাহারা ভগ্নহৃদয়ে, বিষণ্ণমনে ও মলিনবদনে যথাসময়ে বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মধুসূদনের অন্য চিন্তা নাই। সংসারের অনাসক্তি তাহাকে আয়ত্ত করিয়াছে। তিনি গৃহত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। পিতামাতার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক সন্ন্যাস অবলম্বন করার বাসনা করিলেন।

কেহ কেহ বলেন, দ্বাদশবর্ষ-বয়স্ক বালক মধুসূদনই আমকর দিবার জন্য পিতার সহিত মাধবপাশা রাজবাটী গমন করেন। সেখানে রাজা কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া সংসারে বীতস্পৃহ হন, এবং সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার সঙ্কল্প করেন। বাটীতে আসিবার পথেই এ বিষয়ে নিরতিশয় আগ্রহের ফলে পিতার নিকট অনুমতি গ্রহণ করেন। পরে বাটীতে আসিয়া অনেক অনুনয় বিনয়ের পরে মাতার নিকট বিদায় লইয়া মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার জন্য নবদ্বীপাভিমুখে যাত্রা করেন।

এই মতটী আমাদের নিকট একটু বিচিত্র বলিয়া মনে হয়। কারণ, দ্বাদশবর্ষীয় বালকের পক্ষে এরূপ তীব্র-বৈরাগ্য সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। একমাত্র শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য্যের সম্বন্ধেই ঐরূপ জনশ্রুতি

আছে। যদিও জন্মান্তরীয় সাধন ও সংস্কারবলে তাঁহার ঐরূপ বৈরাগ্য হওয়া অসম্ভব নহে বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে তাঁহাকে জন্ম-সিদ্ধ পরমজ্ঞানী শঙ্কর বা শুকদেবের আসনে বসাইতে হয়। এইরূপ মহাজ্ঞানী ও জন্মান্তর যোগসিদ্ধ পুরুষের পক্ষে শাস্ত্রমর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া কুলমন্ত্র ও কুলদেবতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ার বাসনা সম্ভবপর নহে। আমরা জানি, ইহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত, শক্তির উপাসক, সুতরাং শাক্ত বলিয়া পরিচিত। ইহার পিতৃদেবের প্রতিষ্ঠিত ৺কালীমূর্ত্তি অদ্যাপি কোটালীপাড়ায় বর্ত্তমান আছেন। তিনি যে পরম বৈষ্ণব ছিলেন, একথা তাহার গ্রন্থ দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় সত্য, কিন্তু তাহার মত জ্ঞানী ও অভেদবাদীর পক্ষে কালী-কৃষ্ণের ভেদ জ্ঞান থাকা সম্ভবপর নহে। তাহা হইলে কালী-কৃষ্ণের অভেদ-জ্ঞানসম্পন্ন মহাপুরুষ কালীকেই কৃষ্ণ মনে করিতে পারেন, কিন্তু কালীকে বাদ দিয়া বৈষ্ণব হইতে পারেন না। সুতরাং, তিনি শাক্ত ছিলেন, এবং কালী-কৃষ্ণে কোন ভেদ জ্ঞান ছিল না, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং, মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হওয়া বা তাহার শিষ্যত্বগ্রহণের অভিলাষ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নিতান্ত অযৌক্তিক আগ্রহের ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে। কারণ, চৈতন্যদেবের সময় ১৪৮৫ খৃঃ হইতে ১৫৩২ খৃঃ পর্য্যন্ত। ১৫২৫ খৃঃ মধুসূদনের জন্ম হইলে, চৈতন্যদেবের অন্তর্দ্ধানের সময় মধুসূদনের বয়স ৭ সাত বৎসর মাত্র। আর ১৫৩০ খৃঃ মধুসূদনের জন্ম হইলে, ঐ সময় তাহার বয়স মাত্র ২ দুই বৎসর হয়। এই শিশু-বয়সে প্রেমতরঙ্গে ভাসমান হইয়া নিজের বিবেক অনুসারে চৈতন্যদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করার সঙ্কল্পের কথা বালকোচিত মাত্র, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ, তিনি যদি চৈতন্য-প্রেমেই গলিয়া যাইবেন, তাহা হইলে মধুমতী পার হইবার সময় চৈতন্যের শরণাপন্ন না হইয়া গঙ্গার স্তব পাঠ করিবেন কেন? আর, মধুসূদন যখন সন্ন্যাসী হন, তখন তাহার বয়স ২০ কুড়ি বৎসর, ইহা সম্ভবপর, এবং

আচার্য্য পরম্পরায় প্রবাদ হইতে জানা যায়। তখন তো চৈতন্যদেব ভৌতিক দেহত্যাগ করিয়াছেন। সুতরাং মধুসূদনের চৈতন্যদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণের কথা চৈতন্যানুরাগী ভক্তবৃন্দের দূরাগ্রহমূলক কল্পনা মাত্র। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, মধুসূদন যে

"স শাক্তঃ শিবভক্তশ্চ স এব বৈষ্ণবোত্তমঃ।
সংপূজ্য স্তৌতি যঃ কালীমদ্বৈতাচারমাবহন্॥"

এই সহস্র-নামস্তোত্রের মর্ম্ম অবগত ছিলেন না, ইহা বিশ্বাস করিতেও আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। উদ্ধৃত স্থানের অর্থ এইযে, যে সাধক অদ্বৈত বুদ্ধিতে আমার পূজা করিয়া এই স্তব পাঠ করে, সেই শাক্ত, সেই শিবভক্ত, এবং সেই বৈষ্ণবোত্তম বলিয়া গণ্য হয়। সুতরাং, শাক্তভিন্ন কেহ পরম-বৈষ্ণব হইতে পারে না, ইহাই শাস্ত্রের স্থিরসিদ্ধান্ত। ঐ স্তোত্রেরই ফল-শ্রুতিতে আছে—

"বশয়েদপি কেশবং"

অর্থাৎ; যে ব্যক্তি এই স্তোত্র পাঠ করে, সে কেশবকেও বশীভূত করিতে পারিবে। অতএব এইরূপ অমোঘ অস্ত্র হাতে থাকিতে শাস্ত্র-জ্ঞানী মধুসূদন জাহ্নবীতীরে বাস করিয়া কূপজল পানের ন্যায়, কুলমন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ার বাসনা করিবেন, ইহা কখনও বিশ্বাসযোগ্য বা সম্ভবপর নহে।

যাহা হউক, এইবার মধুসূদন বিনীতভাবে কৃতাঞ্জলি পুটে তাহার সঙ্কল্পিত সন্ন্যাসের বিষয় জানাইয়া মাতার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। অনেক আব্দার করিলেন, মাতা কিন্তু কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। হইবেনই বা কিরূপে? বড় আশায় বুক বাঁধিয়া যাহাকে গর্ভে ধারণও অতিকষ্টে লালন পালন করিয়াছেন, সেই নবনীত-কোমল মধুরাকৃতি পুত্রকে অনাথের ন্যায় চিরকালের জন্য বিদায় দেওয়া কি কোন সন্তানবৎসলা জননীর পক্ষে

সম্ভবপর হইতে পারে? বিনয় ও সৌজন্যের আধার, পণ্ডিতকুল-শিরোমণি, মাতৃভক্ত সন্তানের এইরূপ অচিন্তনীয় আব্দার শ্রবণ করিয়া, তাহার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, চতুর্দ্দিক শূন্য দেখিতে লাগিলেন, তাহার নিকট এই ব্যাপার স্বপ্নাবস্থার ন্যায় মনে হইল।

মধুসূদন ছাড়িবার পাত্র নহেন, পদযুগল ধরিয়া কান্দিতে লাগিলেন, তীব্র সংসার-বৈরাগ্যের প্রবল তাড়নায় তিনি অস্থির হইলেন। মধুসূদনের এইরূপ আগ্রহাতিশয় ও দৃঢ়সংকল্প দেখিয়া অরুন্ধতীর ন্যায় পরম পতিব্রতা রমণী অনন্যোপায় হইয়া গলদশ্রুলোচনে বশিষ্ঠের ন্যায় সংযমী পণ্ডিতাগ্রগণ্য আচার্য্য পুরন্দরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। আচার্য্য পুরন্দর সহধর্ম্মিণীর এইরূপ ব্যাকুলতা দেখিয়া তাহার মনোগত ভাব অবগত হইলেন। পরে মধুসূদনকে বলিলেন, দেখ বাবা! তুমি অনেক শাস্ত্র পড়িয়াছ, এবং ব্যুৎপন্নও হইয়াছ, সুতরাং তোমাকে অধিক বলিবার কিছুই নাই। কিন্তু দেখ, শাস্ত্রকারেরা ব্রাহ্মণের জন্য চারিটী আশ্রম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্রহ্মচারী, গৃহী, বাণপ্রস্থ ও ভিক্ষু। এক একটী আশ্রম অতিক্রম করিয়া অপর আশ্রমে প্রবেশ করিতে হয়। তোমার ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম অতীত হইয়াছে। এখন গার্হস্থ, পরে বাণপ্রস্থ ও তৎপরে সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশ করিবার সময়। তোমার এই বয়স সন্ন্যাসের উপযুক্ত নহে। বিশেষতঃ, দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ নামক ঋণত্রয় পরিশোধ না করিয়া সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করা শাস্ত্রবিরুদ্ধ। যাগযজ্ঞাদি দ্বারা দেবঋণ, দান, শ্রাদ্ধ তর্পণাদি দ্বারা ঋষিঋণ ও অপত্যোৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ পরিশোধ করিতে হয়। আরও দেখ, বৃদ্ধ পিতা ও মাতার সেবা শুশ্রূষাই পুত্রের পরম তপস্যা। তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত নহে। এইরূপ নানাপ্রকার উপদেশ দিয়া তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তীব্র-বৈরাগ্য সম্পন্ন মধুসূদন ভুলিবার ছেলে নহে। তিনি বিশেষরূপে আব্দার করিয়া পিতামাতার করুণাপ্রার্থী হইলেন।

পিতৃবাক্যের প্রতিবাদ করা সঙ্গত নহে বলিয়া কিছুকাল তূষ্ণীম্ভাবে থাকিয়া সঙ্ক্ষেপে এই কয়েকটী মাত্র কথা বলিলেন।

মধুসূদন বলিলেন, পিতঃ! আপনি আমাকে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা আমার হৃদয়-চিত্রপটে অঙ্কিত রহিয়াছে। আপনিই ত বলিয়াছেন যে, শ্রুতিতে আছে, যেই দিন বৈরাগ্য হইবে, সেই দিনই প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবে ("যদহরেব বিরজ্যেত তদহরেব প্রব্রজেৎ")। সুতরাং, পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গের ন্যায় আমাকে সংসার-পিঞ্জরে আবদ্ধ রাখিয়া, আমার স্বাধীনতা ও আত্মার ব্যাপকতা সঙ্কুচিত করিতেছেন কেন? সন্তানবৎসল, অনিমিত্তক হিতকামী পিতামাতার পক্ষে সন্তানের ভবিষ্যৎ কল্যাণের প্রতিপক্ষ হওয়া উচিত নহে! আর, বৃদ্ধ পিতামাতার সেবা যে পরম ধর্ম্ম, তাহা আমি আপনার নিকট পূর্ব্বেই উপদিষ্ট হইয়াছি। আপনারা মনে করুন, আমি যেন জন্ম গ্রহণ করি নাই, অথবা জীবিত নাই। আপনাদের ভরণপোষণ বা সেবা শুশ্রূষার কোন ত্রুটী হইবে বিবেচনা করিলে, আমি আপনাদিগকে এইরূপ অনুরোধ করিতাম না। আপনাদের অন্যান্য কৃতী পুত্রগণ বিদ্যমান আছেন, তাঁহারাই আপনাদের সেবা করিয়া ধন্য হইবেন। আমি আপনাদের অকৃতী সন্তান, আমার ভাগ্যে ঐরূপ সৌভাগ্য ঘটিল না বলিয়া আমিই দুঃখিত। আপনার যে শিষ্য-শাখাও ভূসম্পত্তি আছে, আমিও ভবিষ্যতে তাহার একজন উত্তরাধিকারী বটে। আপনাদের ও কুলদেবতাদের সেবার জন্য ঐ সম্পত্তিই পর্য্যাপ্ত হইবে, সুতরাং, ভরণপোষণেরও কোন ত্রুটী হওয়ার সম্ভাবনা নাই। আমি বিবাহ না করিলেও আপনাদের আশীর্ব্বাদে যদি ভগবদুপাসনায় সিদ্ধকাম হইতে পারি, তাহা হইলে আমার দ্বারা আপনাদের নাম বিলুপ্ত হইবার কোন আশঙ্কা নাই। আমার বংশ না থাকিলেও আমার দ্বারা আপনাদের নাম সাধারণের নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। আপনাদের এই স্বার্থত্যাগ ও উদারতা এই মহান্ বংশকে একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া দিবে।

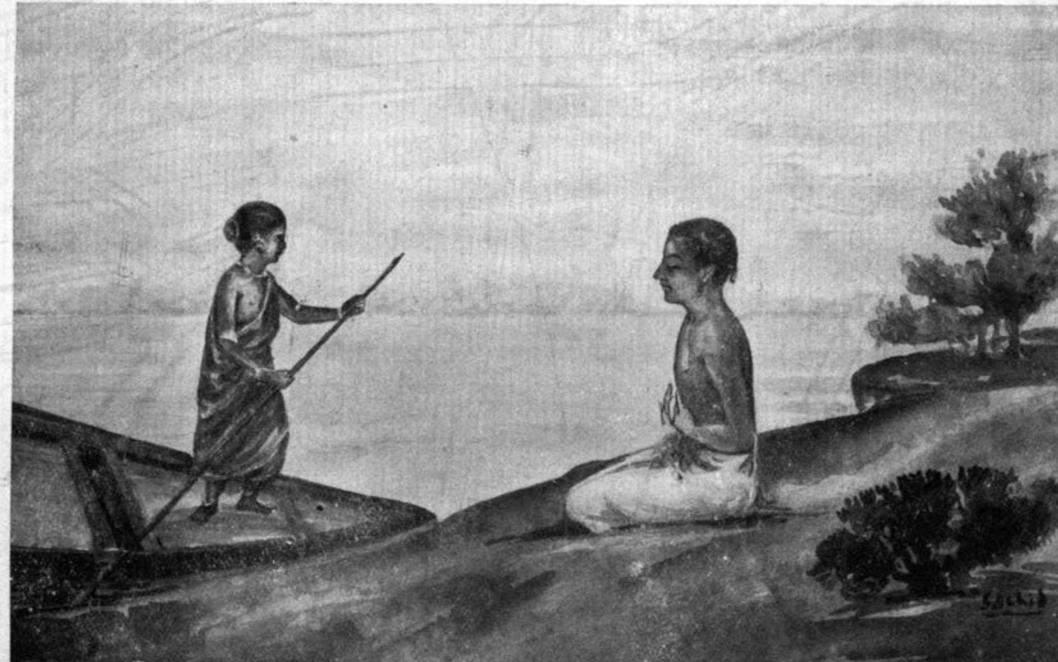
বিশেষতঃ, আমার ভ্রাতৃবংশের উপযুক্ত কৃতী সন্তানগণই আমার অপত্য-স্থানীয় হইবে। আমার এই উদ্যমও সঙ্কল্পে বাধা প্রদান করিলে, আপনার অমূল্য উপদেশ রাশি ভস্মে আহুতি দেওয়ার ন্যায় নিস্ফল হইবে। আমি যেখানে যে ভাবেই থাকি, আপনাদের চরণযুগলই আমার অভীষ্ট সাধনে প্রধান অবলম্বন হইবে। আপনাদের অমোঘ আশীর্ব্বাদ ও পদরজঃ মস্তকে ধারণ করিয়া গমন করিলে, কোন বিঘ্নই আমাকে ভীত করিতে বা অভীষ্ট কার্য্য সাধনে বাধা দিতে সমর্থ হইবে না। আপনারা প্রত্যক্ষ দেবতা, আপনারা প্রসন্ন হইলে আমার কিছুই দুষ্প্রাপ্য হইবে না। এইরূপে বহুকাতর প্রার্থনায় মহামনীষী পুরন্দরাচার্য্য পত্নীকে সম্মত করিয়া অগত্যা তাহাকে সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি প্রদান করিলেন।

মহামতি মধুসূদন পিতামাতার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত চিত্তে শুভমুহূর্ত্ত ও শুভলগ্নে যাত্রা করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ বাসনায় বাটী হইতে রওয়ানা হইলেন। মনে করিলেন, বিশ্বেশ্বরের রাজধানী, পরম পবিত্র মুক্তিক্ষেত্র কাশীধাম ভিন্ন অন্য কোথায়ও উপযুক্ত গুরু পাওয়া যাইবে না, সুতরাং, কাশীধাম যাওয়ারই সঙ্কল্প করিলেন। বাটী হইতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে করিতে ৺কাশীধামের উদ্দেশ্যে গমন করিলেন। বস্তুতঃ, তৎকালে ম্লেচ্ছাক্রমণে উপদ্রুত হইলেও শাস্ত্রচর্চ্চায় ও সাধুজন সমাগমে কাশীর গৌরব অক্ষুণ্ণ ছিল। কাশীধাম যে পৃথিবীর অন্তর্ভুক্ত নহে, সনক, সনন্দ প্রভৃতি ব্রহ্মবাদী ঋষিগণের ন্যায় পার্থিব-সুখনিস্পৃহ যোগিগণই তাহার পরিচয় দিতেছিলেন। তখনও কোথাও বা বিশুদ্ধ সুমধুর সামগান দ্বারা, কোথাও বা প্রাতঃস্নায়ী সাধুগণের স্তোত্র পাঠ দ্বারা ভাগীরথীকূল মুখরিত হইত। কোথাও স্বর্গসোপান-পঙ্ক্তির ন্যায় উন্নত সোপান শ্রেণী, কোথাও প্রমথগণের ন্যায় দণ্ডধারী দণ্ড্যাচার্য্যগণ কাশীর অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছেন। কোথাও মীমাংসকাচার্য্যগণ যাগকর্ম্মে ব্যাপৃত, কোথাও পদ্মাসনোপবিষ্ট বিভূতি-ভূষণ যোগিগণ সমাধিমগ্ন, কোথাও কুলপতির

ন্যায় অধ্যাপকগণ অধ্যাপনায় ব্যাপৃত, কোথাও অদ্বৈতবেদান্তি-কেশরিগণের হুঙ্কারে দ্বৈতবাদি-মত্তমাতঙ্গগণ সন্ত্রস্ত। কোথাও নৈয়ায়িক-গণের আস্ফালন, কোথাও তিলকধারী বৈষ্ণবাচার্য্যগণের ভক্তির উচ্ছ্বাসে কাশাধাম ভরপুর। বস্তুতঃ, বিভিন্নমতাবলম্বিআচার্য্যগণের এরূপ সমন্বয় পৃথিবীর আর কোথাও নাই। ভগবান্ বিশ্বনাথ অর্দ্ধনিমীলিত-নেত্রে এই সকল বিচিত্র অভিনয় দর্শন করিয়া অন্নপূর্ণার সহিত রাজ-সিংহাসনে সমাসীন। মধুসূদনের শ্রুতপূর্ব্ব কাশীমাহাত্ম্য তাহাকে আকর্ষণ করিয়া বিশ্বেশ্বরের ক্রোড়ে আশ্রয় দিবার জন্য যেন প্রেরণা করিল। মধুসূদন অনির্দ্দিষ্ট ও অজ্ঞাত পথে কাশীর অভিমুখে চলিলেন। মধুসূদনের সঙ্গে পাথেয় কিছুই নাই। পথি মধ্যে ব্রাহ্মণের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া চলিতে লাগিলেন। ক্রমে অনেক দূর অতিক্রম করিয়া একটী নদীর নিকটবর্ত্তী হইলেন। এই নদীর বিশালতা দর্শন ও গভীরতা অনুমান করিয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইলেন। তাহার গভীর গর্জ্জন ও তরঙ্গভঙ্গী দেখিয়া মধুসূদনের মুখ মলিন হইল। ভাবিলেন, কি উপায়ে ভীষণ জলজন্তু পরিবৃত দুর্দ্ধর্ষ এই নদীকে অতিক্রম করিবেন। তীরদেশ নিবিড় অরণ্যে পরিপূর্ণ, নিকটে কোন পারাপারের ব্যবস্থা নাই। থাকিলেই বা কি হইবে, মধুসূদন যে পাথেয় বিহীন, তাহাকে কে পার করিয়া দিবে?

মধুসূদনের নদী অতিক্রম।

মধুসূদনের সকল আশা ফুরাইল, সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। ভাবিলেন, এ বিপদে আমাকে কে রক্ষা করিবে? অনেক চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, যাহার নাম স্মরণ করিলে ভব-সাগর পার হওয়া যায়, তিনি কি আমাকে এই ক্ষুদ্র নদী পার করিয়া দিবেন না? যদি পার হইতে না পারি, ৺ভগবানের নাম করিয়া এইখানেই প্রাণ পরিত্যাগ করিব। এই ভাবিয়া ব্যাকুলভাবে গঙ্গাস্তোত্র পাঠ ও গঙ্গামন্ত্র জপ করিতে



মধুমতীনদীতীরে ৺মধুসূদনের গঙ্গারাধনা।

২২৩পৃঃ

চিত্রশিল্পী—শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য ব্যাকরণতীর্থ।

করিয়া, তোমার সম্মুখেই প্রাণ পরিত্যাগ করিব, তুমি ব্রহ্মহত্যার পাপভাগী হইবে।

ভক্তবৎসলা দ্রবময়ী ভগবতী গঙ্গাদেবী মধুসূদনের কাতর প্রার্থনায় অত্যন্ত আকৃষ্ট হইলেন। জগন্মাতা ভক্ত সন্তানের নিকট আত্ম-গোপন করিতে পারিলেন না। তখন স্বকীয় জ্যোতির্ম্ময়ীমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, বৎস! আমি তোমার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়াছি, বর প্রার্থনা কর। মধুসূদন, ভগবতীর অলৌকিক-মূর্ত্তি দর্শন করিয়া একেবারে তন্ময় হইয়া গেলেন, কিছুক্ষণ পরে প্রাণের আবেগে ভক্তিভরে বাষ্পগদ্‌গদ কণ্ঠে পুনরায় স্তবে প্রবৃত্ত হইলেন। স্তোত্র পাঠের পরে বলিলেন, মাতঃ! আমার সংসারে আসক্তি নাই, ভোগৈশ্বর্য্যে স্পৃহা নাই, আমি কি বর প্রার্থনা করিব? তবে তুমি যদি সন্তুষ্ট হইয়া থাক, একান্তই বর দিতে অভিলাষ করিয়া থাক, তাহা হইলে, এই বর দেও যে, যেমন দয়া করিয়া আমাকে এই ক্ষুদ্র নদী পার করিয়া দিলে, তেমন এই দুস্তর ভব-সাগর পারেরও ব্যবস্থা করিয়া দাসকে কৃতার্থ কর। দেবী বলিলেন, বৎস! আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হইবে, তুমি পৃথিবীতে অদ্বিতীয় সাধক ও গ্রন্থকার বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিবে। আর, তোমার এই অসাধারণ সাধনার বলে আমার সাক্ষাৎকার লাভের স্মৃতির জন্য তোমার নামে এই বিশাল তরঙ্গ-সঙ্কুলা মহানদী "মধুমতী" নামে প্রসিদ্ধ হইবে। মধুসূদন বলিলেন, মাতঃ! যদিও আমার সংসারে আসক্তি নাই, তথাপি আর একটী প্রার্থনা এই যে, আমার পিতৃবংশের কোন ব্যক্তি যেন এই নদীতে পড়িয়া বিপন্ন না হয়। দেবী "তথাস্তু" বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, মধুসূদন "মধুমতী" নামক যোগসিদ্ধি লাভ করিয়া দেবীর সাক্ষাৎকারে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই স্মৃতির জন্যই দেবী এই নদীর নাম "মধুমতী" রাখিয়াছিলেন। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি, মধুসূদনের বংশীয়েরা দুই বার নৌকা ডুবি হইয়া এই নদীতে পতিত হইয়াছিলেন, কিন্তু কেহই

বিপন্ন হন নাই। এই প্রত্যক্ষ ব্যাপারে মধুসূদনের বরের যাথার্থ্য উপলব্ধি হইতেছে। মধুসূদনের বংশের প্রত্যেকেই এই সংবাদ অবগত আছেন, এবং এই বরের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, ঝড় তুফানের সময়ও ক্ষুদ্র নৌকাযোগে এই বিশাল তরঙ্গ-সঙ্কুলা নদী পার হইতে সাহসী হইয়া থাকেন। মধুসূদনের এই অলৌকিক-চরিত্রকাহিনী তাঁহাকে চিরকালের জন্য অমর করিয়া রাখিয়াছে। বরপ্রাপ্ত মধুসূদন, সানন্দচিত্তে শাণোল্লিখিত মহামণির ন্যায় অত্যন্ত প্রভাসম্পন্ন হইয়া ভগবানের নাম স্মরণ পূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিতে করিতে বারাণসীর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। প্রাচীনদিগের মুখে শুনিয়াছি যে, মধুসূদন দেবীর বরে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিতে করিতেই মহানদী উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

কাশীধামে মধুসূদন।

মধুসূদন ধীরে ধীরে পদব্রজে নানা নদ, নদী, গ্রাম, নগর ও অরণ্যানী অতিক্রম করিয়া কাশীক্ষেত্রের পূর্ব্বপারে উপনীত হইলেন। দূর হইতে বিশ্বেশ্বরের রাজধানী কাশীধামে কৈলাসশিখরের ন্যায় অত্যুন্নত ধ্বজ-পতাকাশোভিত বিশ্বেশ্বরের মন্দির, অভ্রভেদী দেবমন্দিরের সমুন্নত চূড়া, সুবৃহৎ অট্টালিকা সমূহ, ও কলি-কলুষহারিণী কল কল নাদিনী ভগবতী ভাগী-রথীর অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করিয়া, ভক্ত মধুসূদনের চিত্ত বিগলিত হইল। সমীরণ-সমুদ্বেলিত ভাগীরথীর তরঙ্গমালা যেন বাহুবিস্তার করিয়া প্রিয়পুত্রকে ক্রোড়ে লইবার জন্য আহ্বান করিতেছে। মধুসূদন এই সকল প্রাকৃতিক নয়ন-মনোহারিণী শোভা দর্শন করিতে করিতে অভিলষিত কাশীক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন, ভক্তগণ গঙ্গাস্নান করিয়া সন্ধ্যা, তর্পণাদি নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে বিভূতিভূষিত দেহে রুদ্রাক্ষমালা ধারণ পূর্ব্বক "হর হর বম্ বম্ শিব শম্ভো জয় মহাদেব জয় কাশী বিশ্বেশ্বর" ইত্যাদি উচ্চৈঃস্বরে ধ্বনি করিতে করিতে বিশ্বেশ্বর দর্শনে দলে দলে ছুটিতেছে,

ও আকুল প্রাণে সজল নয়নে "বাবা বিশ্বনাথ ত্রাণ কর" বলিয়া মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক গঙ্গোদকসিক্ত রাশি রাশি ত্রিপত্র বিল্বপত্র বিশ্বেশ্বরের মস্তকোপরি প্রদান করিতেছে। কেহ বা নানা উপহারে বিশ্বেশ্বরের অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। কেহ বা দারিদ্র্যবিনাশিনী অন্নপূর্ণার কৃপাপ্রার্থী হইয়া, পূজা, স্তোত্রপাঠ ও সপ্তশতী পাঠে একাগ্রচিত্ত হইয়াছে। কেহ বা গঙ্গাস্নান করিয়া স্তোত্র ও উপনিষদাদি পাঠের সুমধুর ধ্বনিতে ভাগীরথীকূল মুখরিত করিয়াছে। কোথাও যাগযজ্ঞ, কোথাও বা শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি কর্ম্ম, কোথাও গৈরিক বসনধারী সন্ন্যাসীর দল, কোথাও দণ্ডিগণের অপূর্ব্ব সম্মিলন, কোথাও যোগনিদ্রাগত যোগিগণের অপূর্ব্ব সমাবেশ, নবাগত মধুসূদনের চিত্ত আকর্ষণ করিল। মধুসূদন কাশীতে বেদান্ত পড়িতে আসিয়াছেন, তাহার সঙ্কল্প ছিল, ন্যায়শাস্ত্র-পরিমার্জ্জিত বুদ্ধি দ্বারা অদ্বৈতবাদের খণ্ডন করিয়া দ্বৈতমত স্থাপন করিবেন। অসাধারণধী মধুসূদন ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বৈশেষিক প্রভৃতি প্রাচীন দ্বৈতবাদের সহিত ভক্তিরস মিশ্রিত করিয়া, ক্ষীরসাগর মথনোদ্ধৃত পীযূষ-মধুর অকাট্যযুক্তি ও প্রমাণসমন্বিত একখানি অদ্বৈতখণ্ডন বা দ্বৈতবাদমূলক গ্রন্থ রচনা করিবেন, যাহার আস্বাদ গ্রহণ করিয়া সর্ব্বসম্প্রদায়ের সুধীগণ পরস্পর বিরোধ পরিহার পূর্ব্বক পরম পরিতৃপ্ত হইতে পারেন। অদ্বৈতবাদের রহস্যগুলি হৃদয়ঙ্গম না হইলে, তাহার খণ্ডন করা যায় না। সুতরাং, দ্বৈতবাদ স্থাপন করিতে হইলে প্রথমে প্রতিকূল বেদান্তবিদ্যার প্রয়োজন।

কাশীধামের তাৎকালিক অবস্থা।

এই সময়ে কাশীধাম পৃথিবীর বিদ্যাপীঠের কেন্দ্রস্থান ছিল। তখন, এখানে ভুবন-বিখ্যাত নানাশাস্ত্রদর্শী আচার্য্যগণ স্ব স্ব মত সংস্থাপনে বদ্ধপরিকর। মীমাংসক, নৈয়ায়িক, ও বেদান্তিগণ পরস্পর বিবদমান হইয়া শাস্ত্রবিচারে প্রবৃত্ত। এক এক জন অধ্যাপক দিক্‌পালের ন্যায় এক একটী মতবাদের

মর্য্যাদা রক্ষণে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। শাস্ত্রীয়বিচার, গ্রন্থপ্রণয়ন, ও শিষ্যপরম্পরায় ঐ সকল মতবাদ ক্রমেই পুষ্টও দৃঢ় হইতেছিল। এই সময়ে রামতীর্থ, উপেন্দ্র সরস্বতী, মাধব সরস্বতী, নারায়ণ ভট্ট, নৃসিংহাশ্রম, অপ্পয় দীক্ষিত, জগন্নাথ আশ্রম, কৃষ্ণতীর্থ, বিশ্বেশ্বর সরস্বতী প্রভৃতি মহামান্য পণ্ডিতমণ্ডলী কাশীধামকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। মধুসূদন, ইহাদের মধ্যে কোন্ যোগ্যতম ব্যক্তিকে গুরু বলিয়া বরণ করিবেন, ইহা তাঁহার চিন্তার বিষয় হইল। তিনি ক্রমে ক্রমে সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের প্রত্যেকের সহিতই দেখা করিলেন ও দুই একটী শাস্ত্রীয় কথার আলোচনা করিলেন। পরে পণ্ডিতপ্রবর রামতীর্থকেই বিশেষ যোগ্য ব্যক্তি মনে করিয়া তাঁহারই শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। ন্যায়শাস্ত্রদ্বারা পরিমার্জ্জিতবুদ্ধি মধুসূদন যেমন অভিলাষানুরূপ গুরুপ্রাপ্ত হইয়া সন্তুষ্ট হইলেন, রামতীর্থও সেইরূপ সুসংযত, সদাচারী, বুদ্ধিমান্ ও ব্যুৎপন্ন একটী ছাত্র পাইয়া অধ্যাপনার সাফল্য অনুভব করিলেন। কাশীধামে তৎকালে কিরূপ শাস্ত্রচর্চ্চার উন্নতি হইয়াছিল, তাহা এখন কল্পনায়ও আনা যায় না। পণ্ডিতকুল ধুরন্ধর শ্রীমদ্ বল্লভাচার্য্য শুদ্ধাদ্বৈতমতের প্রবর্ত্তন করিতে গিয়া, পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট সমাদৃত হন নাই। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবও বিশ্বেশ্বরাধিষ্ঠিত কাশী-ক্ষেত্রকে ভক্তি ও প্রেমের বন্যায় প্লাবিত করিতে সমর্থ হন নাই। বস্তুতঃ, কাশাধাম তখন বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীর প্রধান নৃত্যশালা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। মধুসূদন নিশ্চিন্তমনে বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রাতঃ-কালে গঙ্গাস্নান, নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান, শরীর রক্ষার জন্য ভিক্ষা-চর্য্যাভিন্ন একটু সময় ও শাস্ত্রালোচনা ব্যতিরেকে অতিবাহিত করেন নাই। গুরুর উপদেশবীজ সুক্ষেত্রে পতিত হইয়া অল্পদিনেই অঙ্কুরিত হইল। মধু-সূদন সাধনাবলে অল্পদিনে ও অল্পায়াসেই বেদান্তের গূঢ় তাৎপর্য্য অবগত হইতে সমর্থ হইলেন। জন্মান্তরীয়-সংস্কারবলে তাঁহার পঠিত গ্রন্থসকল পূর্ব্বালোচিত গ্রন্থের ন্যায় সুগম হইল। গুরুর উপদেশ শ্রবণ এবং আলোচনা

দ্বারা তাহার তত্ত্বাবধারণ ও নির্ণীত তত্ত্ব অনুভবের জন্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া, তিনি বেদান্তের আত্মসাক্ষাৎকারের অন্তরঙ্গ-সাধন শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনে সিদ্ধিলাভ করিলেন। অন্যান্য শিষ্যগণ মধুসূদনের এইরূপ অলৌকিক শক্তি দেখিয়া ঈর্ষ্যা করা দূরে থাকুক, তাঁহার প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইলেন, এবং সন্দিগ্ধস্থলগুলি তাঁহার নিকট মীমাংসা করিয়া লইবার সুযোগ পাইলেন।

অব্যাহতভাবে শাস্ত্রচর্চ্চা প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও, তৎকালে কাশীক্ষেত্র একটী ভীষণ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পতিত হইয়াছিল। শুনা যায়, মুসলমানদের ধর্ম্মশাস্ত্রে নাকি লিখিত আছে যে,মোল্লাদের রাজদ্বারে বিচার নাই। সুতরাং, সুযোগ পাইয়া মোল্লাগণ ধর্ম্মপ্রচারার্থ নিজেরা বা ঘাতুকের দ্বারা সন্ন্যাসীগণকে নিধন করিত। বাক্‌শক্তিহীন, আত্মরক্ষণে অসমর্থ, সাধারণ জীবজন্তুর ন্যায় ইহাদিগকে এমন নৃশংসভাবে হত্যা করা হইত যে, অনেক সময় গঙ্গার স্বচ্ছসলিলরাশি ও ব্রহ্মরক্তে রঞ্জিত হইত। শাস্ত্রাচার্য্যও সাধুসন্ন্যাসীগণ এই সময়ে অতি শঙ্কিতভাবে প্রাণের আশা একরূপ ত্যাগ করিয়াই কাশীধামে বাস করিতেছিলেন। তখন ম্লেচ্ছরাজ্য ভারতবর্ষকে প্রায় গ্রাস করিয়া বসিয়া আছে। দস্যু তস্করের প্রকাশ্যভাবে উপদ্রব সম্পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছে, সকলের মুখই মলিন, বিষাদগ্রস্ত। ইহা দেখিয়া মধুসূদনের নির্ব্বিকার চিত্তও বিকৃত হইল। প্রতীকারের কোন উপায় না দেখিয়া তিনি চিন্তিত হইলেন। কেবল বিশ্বেশ্বরের উপর আত্মনির্ভর করিয়া, শাস্ত্রচিন্তায় কালযাপন করিতে লাগিলেন।

হিন্দুর নিতান্ত দুর্ভাগ্য! বিধাতা তাহাদের প্রতি অত্যন্ত প্রতিকূল। অতীত রাষ্ট্রবিপ্লবের মর্ম্মন্তুদ-কাহিনী স্মৃতিপথ হইতে মুছিয়া ফেলিলেও ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা লক্ষ্য করিলেই উহা বিশেষভাবে প্রতীয়মান হইবে। বর্ত্তমান সময়েও মধ্যে মধ্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে হিন্দুর প্রতি

যেরূপ অত্যাচার-কাহিনী শুনা যায়, তাহা, আমাদের ন্যায়পরায়ণ ব্রিটিশ রাজ্যে সম্ভবপর বলিয়া বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। এখনও মধ্যে মধ্যে ভারতের নানাস্থানে, বলপূর্ব্বক হিন্দুরমণী হরণ ও তাহার প্রতি পাশবিক অত্যাচার, প্রকাশ্য দিবালোকে লুণ্ঠন, গৃহদাহ ও রোমাঞ্চকর নরহত্যার কার্য্য প্রায়ই শুনা যাইতেছে ; অধুনা আমাদের সুসভ্য ও প্রবলপরাক্রান্ত, প্রজাবৎসল ইংরেজগবর্ণমেণ্টের সুশাসনে এই সকল অত্যাচার ক্রমেই দূরীভূত হইতেছে।

যাহা হউক, তৎকালে কাশীর পরস্পর বিবদমান ধর্ম্মাচার্য্যগণের সম্বন্ধে আমাদের একটী বক্তব্য আছে। মদমত্ত-মাতঙ্গগণের ন্যায় পরস্পর বিরোধী প্রবলপরাক্রান্ত বিচারমল্ল আচার্য্যগণ এইরূপ বাদবিচারে প্রবৃত্ত হইলেন কেন ? নিজ নিজ পক্ষসমর্থনের জন্যই বা এত প্রবল আকাঙ্ক্ষা কেন ? যিনি যুক্তিতর্কের অতীত, মানবের সামান্য যুক্তিতর্কের দ্বারা প্রমাণিত পথই সেই ভগবৎ প্রাপ্তির উপায়, ইহারই বা নিশ্চয়তা কি ? আর একজন বুদ্ধিমান্ তো অনায়াসেই সেইমত খণ্ডন করিতে পারে, আবার তাহার মতও তদপেক্ষা যোগ্যতম ব্যক্তির যুক্তিদ্বারা খণ্ডিত হইতে পারে।

"চকিত মভিধত্তে শ্রুতিরপি"

অর্থাৎ—শ্রুতিও দিশা না পাইয়া স্বরূপবর্ণনায় অসমর্থ হইয়া যেন ভীত চকিতভাবে অনির্ব্বচনীয়, দুজ্ঞের্য়, অবাঙ্মনসগোচর, অপ্রতর্ক্য প্রভৃতি কতকগুলি বিশেষণ দিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছেন। আমরা বলি, যিনি নাম ও রূপ বর্জ্জিত, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, সৎ, চিৎ ও আনন্দ স্বরূপ, যাঁহার সত্তায় জগতের সত্তা, যাঁহার আদিও নাই অন্তও নাই, তাঁহার আবার স্বরূপ কি ? এই স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য এত জিগীষা কেন ? এত মাথা ব্যথা কেন ? যে বস্তু সাধন লভ্য, তাহাকে সাধনের দ্বারা লাভ করিবার চেষ্টা

কর। বাগ্‌বিতণ্ডা, গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি, ও পরমত নিরাকরণের চেষ্টায় অমূল্যকাল অতিবাহিত করা কোন বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে।

ভগবৎপ্রাপ্তির শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পথ অনেক। দেশ, কাল, পাত্র, অনুসারে এই পথের পার্থক্য হইয়া থাকে। কিন্তু—

"নৃণামেকোগম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব"

অর্থাৎ—খাল, বিল, নদী প্রভৃতির জলরাশি যেমন একমাত্র সাগরেই গিয়া পতিত হয়, সেইরূপ পথ ভিন্ন হইলেও তাহার গম্যস্থান এক। নৌকায়, রেলে, ষ্টীমারে বা পদব্রজে যেরূপেই গমন করনা কেন, এক গম্যস্থানেই পৌঁছাইয়া দিবে। শ্রুতিও বলেন—

'যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে অস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়"।

অর্থাৎ—প্রবহনশীলা নদী যেরূপ নাম ও রূপ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে মিলিত হয়, সেইরূপ বিদ্বান্‌গণও নাম এবং রূপ পরিত্যাগ করিয়া, সেই পরাৎপর, দিব্য, পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তবে এইরূপ মহামনীষিগণের মতভেদের কারণ কি, সেজন্য বিরোধই বা কেন?

একটু চিন্তা করিলেই অনায়াসে ইহার উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। আপনারা অনেকেই দেখিয়াছেন, কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে অল্পসময়ে অল্পক্লেশে গমন করিবার জন্য যখন একটী রেল লাইন প্রস্তুত হয়, তখন একজন ইঞ্জিনিয়ার গিয়া ঐ স্থানের একটী নক্‌সা প্রস্তুত করে। তাহাতে কত মাইল ব্যাপী রেলপথ হইবে, কোন্ কোন্ পথ অতিক্রম করিয়া যাইবে, কয়টী নদী বা খাল পড়িবে, কয়টী সেতু হইবে, লাইনটী কত উচ্চ হইবে,ও কত টাকা খরচ হইবে এবং কতদিনে উহা সম্পন্ন হইতে পারিবে, ইত্যাদি বিষয় সকল উহাতে বিশেষভাবে আলোচিত হয়। ইহার পরে, যখন আর একজন ইঞ্জিনিয়ার উহার তদন্ত করিতে যায়, তখন ঐ নক্‌সা কাটিয়া ছাটিয়া ঐ লাইনের একটী নূতন নক্‌সা তৈয়ার করিয়া

গুরু ও বেদান্তবাক্যকে বিশ্বস্ত পথপরিচায়ক মনে করিয়া, তদুপদেশানুসারে গন্তব্য পথে গমন করিও, মহাপ্রলয়েও তোমার বিনাশ হইবে না। ভগবদ্-ভক্তিরসায়ন তোমার জরা ও ব্যাধি বিনাশ করিয়া, তোমাকে স্বপ্রকাশ জ্যোতীরূপে পরিণত করিবে।

যাদবানন্দের কাশী যাত্রা।

এদিকে মধুসূদনের বেদান্তবিদ্যাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গেই সংসারের অনিত্যতা বোধ তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ়মূল হইয়া সাংসারিক মায়াবন্ধন ক্রমেই শিথিল করিতে লাগিল। অপর দিকেও তেমন মধুসূদনের অদর্শনে তাঁহার পিতা, মাতা, বন্ধু, বান্ধব, সকলেরই হৃদয়ে ভবিষ্যদাশার নৈরাশ্য ক্রমেই ঘনীভূত হইতে লাগিল। কেহ মনে করিলেন, এখন যৌবনের মধ্যাহ্ন সময়ে হয় ত ক্ষণিকবৈরাগ্য শিথিল হইয়া সংসারের ভোগাসক্তিতে মধুসূদনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে। কেহ ভাবিলেন, শ্মশানবৈরাগ্যের ন্যায় ক্ষণিক-বৈরাগ্যের প্রেরণায় মধুসূদন গৃহত্যাগী হইয়াছেন, এখন হয় ত চেষ্টা করিলেই তিনি ফিরিয়া আসিবেন। পিতা মাতা মনে করিলেন, এই কঠোর গর্ভধারণক্লেশ, লালন পালনে স্নেহ ও বাৎসল্যের কঠোর অগ্নি-পরীক্ষা, শাস্ত্রজ্ঞ ও পিতৃ-মাতৃভক্ত মধুসূদন কখনই ভুলিতে পারে নাই। যাদবানন্দ মনে করিলেন, আহার, বিহার, শাস্ত্রাধ্যয়ন প্রভৃতি কার্য্যে সর্ব্বদা লক্ষ্মণের ন্যায় অনুগামী, বিশ্বাসের একমাত্র পাত্র, রহস্যালাপের একমাত্র অকৃত্রিম বন্ধু, কর্ত্তব্য নির্ণয়ে পরম সচিব, আদেশ প্রতিপালনে প্রিয়শিষ্য ও জ্যেষ্ঠানুশাসন নিরত, অকৃত্রিম স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ ভাজন, পরম কল্যাণ-নিলয় মধুসূদন, আমার আদেশ কখনও লঙ্ঘন করিবে না। আমি বিশেষ-রূপে অনুরোধ করিলে, সে নিশ্চয়ই আমার কথায় সম্মত হইবে। সকলে মিলিত হইয়া এইরূপ বহু আলোচনা করিলেন, এবং পরিশেষে মধুসূদনকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। যাদবানন্দ

নিজেই তাহাকে আনিতে যাইবেন বলিয়া স্থির করিলেন, তাহাও সকলেরই অনুমোদিত হইল। যাদবানন্দ পিতা, মাতা ও অন্যান্য গুরু জনের পদধূলি ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ পূর্ব্বক কাশীধামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। যাত্রা কালে দূরদর্শী বিচক্ষণ পুরন্দরাচার্য্য বলিলেন, দেখ যাদব! আমার শেষ কথা এই যে, যদি কোনরূপেও মধুসূদনকে ফিরাইয়া আনিতে না পার, তাহা হইলে তুমি তাহার আকর্ষণে বৃদ্ধ পিতামাতাকে পরিত্যাগ করিও না, অবশ্য ফিরিয়া আসিবে।

ভ্রাতৃবৎসল যাদবানন্দ পদব্রজে পথি মধ্যে নানাস্থানে ব্রাহ্মণ গৃহে আতিথ্য গ্রহণ পূর্ব্বক নানা নদ, নদী, গ্রাম, নগর, অরণ্যানী ও হিংস্রজন্তু-সমাকুল সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া, মনের আবেগে কাশীধামে উপনীত হইলেন। কাশীর অপূর্ব্ব ও অলৌকিক সৌন্দর্য্য তাঁহার নয়ন ও মনকে আকর্ষণ করিল। যাদবানন্দ ভাবিলেন, এই পরম রমণীয় পবিত্র মুক্তিক্ষেত্র বারাণসী ধামে যাহারা আগমন করে, পার্থিব-সৌন্দর্য্য ও ভোগরাশি তাহাদিগকে কখনই আকর্ষণ করিতে পারে না। যদি কাহারও জন্মান্তরীয় বহুপুণ্যফলে এই বিশ্বেশ্বরের রাজধানী বারাণসী ধামে আগমনের সৌভাগ্য ঘটে, তাহা হইলে সে কি জাহ্নবীতটে বাস করিয়া কূপজল পানের ন্যায় পার্থিব সুখে আকৃষ্ট হইতে পারে? কাশীধামের পবিত্রতা, রমণীয়তা, সাধু ও বিদ্বজ্জনসংসর্গ এবং ভক্ত সমাগম দেখিয়া তিনি সংশয়াকুল হইলেন। ভাবিলেন, আমার উদ্দেশ্য কি সফল হইবে? আমার এই অসীম উদ্যম ও অসাধারণ পরিশ্রম কি সার্থক হইবে?

যাদবানন্দ কাশীধামে উপস্থিত হইয়া মধুসূদনের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। বহু পণ্ডিত ও বিদ্যার্থীর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া মধুসূদনের সন্ধান পাইলেন। পরে মধুসূদনের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তিনি একটী কক্ষমধ্যে নির্জ্জনে শাস্ত্রচিন্তায় নিবিষ্ট, বাহ্য-জ্ঞানশূন্য। চতুর্দ্দিকে চতুরগ্নির ন্যায় স্তূপীকৃত বেদান্তগ্রন্থ সমূহ। তাহার মধ্যে তেজঃপুঞ্জ-

কলেবর পঞ্চমাগ্নির ন্যায় মধুসূদনকে দেখিয়া শ্রুতিবিহিত পঞ্চাগ্নিযাগই যেন প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। যাদবানন্দ অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিলেন, কিন্তু মধুসূদনের দৃষ্টি সে দিকে আকৃষ্ট হইল না। যাদবানন্দের সকল আশা ফুরাইল, তিনি ভাবিলেন, যদি মধুসূদনকে নিয়া যাইতে না পারি, তাহা হইলে আমিও তাহার পথের পথিক হইব। কিছু-কাল পরে শৈশব-কালোচিত অভ্যস্ত স্নেহসূচক বাক্যে মধু! বলিয়া তিনবার সম্বোধন করিলেন। মধুসূদনের সমাধি ভঙ্গ হইল, তিনি ফিরিয়া দেখিলেন, দাদা যাদবানন্দ। তখন অতি ব্যস্ততার সহিত গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া বসিতে আসন প্রদান করিলেন। বহুদিন পরে ভ্রাতৃদ্বয়ের মিলন হইয়াছে, যেন অশ্বিনীকুমারদ্বয় বা মিত্রাবরুণ সোমরস পান করিবার জন্য ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। পরস্পর কুশল প্রশ্নাদি হইল। পরস্পরের অধ্যয়নের উন্নতি সম্বন্ধে আলোচনা হইল। যাদবা-নন্দের প্রশ্নের উত্তরে মধুসূদন আগমনকালীন সমুদয় পথবৃত্তান্ত তাঁহার নিকট কীর্ত্তন করিলেন। যাদবানন্দ মধুসূদনকে বশীভূত ও মায়া-পাশে বন্ধন করিবার জন্য কয়েক দিন তাঁহার সহিত শাস্ত্রালোচনায় পরম সুখে অতিবাহিত করিলেন। তিনি অবসর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু যখনই এ বিষয়ে আলোচনা করিবার অভিপ্রায় করেন, তখনই দেখেন, মধুসূদন শাস্ত্রচিন্তায় নিমগ্ন। তাঁহার শাস্ত্রচিন্তার ব্যাঘাত জন্মাইয়া অন্য কথার অবতারণা করা তাঁহার সঙ্গত বোধ হইল না। একদিন অবকাশক্রমে যাদবানন্দ মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। বৃদ্ধ পিতামাতাও তাঁহাদের আগ্রহের কথা সম্পূর্ণ বিবৃত করিলেন। মধুসূদনের বদনকমল সংসার-মেঘের আবরণে মলিন হইল।

মধুসূদন বলিলেন দাদা! আমি অতি গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। আমার অমূল্য সময় বৃথা নষ্ট করিতে পারি না। আমি এ সম্বন্ধে বেশী কথা বলিব না। গুরুজনের আদেশ কখনও লঙ্ঘনীয় নহে।

শাস্ত্রকারেরাও বলিয়াছেন—"আজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া"। গুরুজনের আদেশ ভালমন্দ বিচার না করিয়াই অবনত মস্তকে পালন করা কর্ত্তব্য, ইহা আমি বিশেষরূপেই অবগত আছি। কিন্তু, আমি এবিষয়ে জগদ্গুরু প্রত্যক্ষ দেবতা পিতামাতার অনুমতি ও আশীর্ব্বাদ পাইয়াছি। যদি বস্তুতঃই আমার প্রতি আপনাদের অকৃত্রিম স্নেহ ও হিতকামনা থাকে, তাহা হইলে আলোকদীপ্ত প্রশস্ত রাজমার্গ হইতে আকর্ষণ করিয়া কেন আমাকে পঙ্কিল, কণ্টকাকীর্ণ, দুর্গম, অন্ধকারময়, সংসারপথে বিচরণ করাইতে প্রয়াস পাইতেছেন? আমার উন্নতি হইলে, মনুষ্যত্ব লাভ হইলে বা সৌভাগ্যবশতঃ আত্মজ্ঞানের উদয় হইলেই আপনাদের আন্তরিক স্নেহ, আশীর্ব্বাদও হিতৈষিতার যাথার্থ্য উপলব্ধি হইবে। দাদা! ক্ষমা করুন, আমার প্রতি নির্দ্দয় হইবেন না, আমাকে ভিক্ষা দিন, কনিষ্ঠের আব্দার রক্ষা করুন, এই বলিয়া মধুসূদন নিরুত্তর হইলেন। মধুসূদনের বাক্য শুনিয়া যাদবানন্দের স্নেহরাশি বিগলিত হইয়াই যেন নয়নযুগল হইতে বিষাদাশ্রুধারা নিপতিত হইতে লাগিল, তিনি হতাশ্বাস হইলেন, প্রত্যুত্তরের বিফলতা চিন্তা করিয়া তিনি নিরুত্তর হইয়া অধোবদন হইলেন। পরে শাস্ত্রালাপে আরও কয়েকদিন অতিবাহিত করিয়া, মধুসূদনকে আশীর্ব্বাদ ও স্নেহালিঙ্গন পূর্ব্বক শেষ বিদায় গ্রহণ করিয়া দেশাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। বিশেষ ইচ্ছা থাকিলেও পিতার আদেশ স্মরণ করিয়া মধুসূদনের গন্তব্যপথে গমন করিতে সমর্থ হইলেন না।

মধুসূদনের মীমাংসা-শাস্ত্রানুশীলন।

পক্ষধরমিশ্রের আলোক, রঘুনাথের দীধিতি ও মথুরানাথের টীকার সহিত "তত্ত্বচিন্তামণি" গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া নির্ম্মলবুদ্ধি মধুসূদন বেদান্তশাস্ত্রপাঠে বিশেষ লাভবান্ হইলেন। তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি গুরুর উপদেশে মিশ্রিত হইয়া অতি কঠিন কঠিন বিষয়েরও সমাধান করিতে সমর্থ হইল।

কিন্তু ন্যায় ও বেদান্ত দ্বারা মীমাংসাশাস্ত্রের চরিতার্থতা হইল না। মীমাংসা-শাস্ত্রের অভিজ্ঞতা না থাকিলে, বেদান্তশাস্ত্রপাঠের ও পূর্ণতা হয় না। বিশেষতঃ, নারায়ণভট্ট প্রভৃতি মীমাংসকাচার্য্যগণের নিকট অনেকস্থলে খ্যাতনামা বৈদান্তিকগণও হতপ্রভ হইয়াছেন। এই সকল বিবেচনা করিয়া মধুসূদনের মীমাংসাশাস্ত্রপাঠে নিরতিশয় আগ্রহ হইল। বৈদান্তিক রামতীর্থ—

"ব্রুয়ুঃ স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য গুরবো গুহ্যমপ্যুত"

এই ভাগবতবাক্য স্মরণ করিয়াই যেন প্রিয়শিষ্য মধুসূদনকে বেদান্ত-শাস্ত্রের নিখিল গূঢ় রহস্যেরই উপদেশ দিয়াছিলেন। সুতরাং, মধুসূদন মনে করিলেন, রামতীর্থ যেমন অদ্বিতীয় বৈদান্তিক, এইরূপ মীমাংসাশাস্ত্রেও অদ্বিতীয় একজন পণ্ডিতকে গুরুত্বে বরণ করিবেন। তৎকালে কাশীধামে নারায়ণ ভট্টই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মীমাংসক ছিলেন। সুতরাং, তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার জন্য মধুসূদন রামতীর্থের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। রামতীর্থ আনন্দিতচিত্তে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাহাকে অনুমতি দিলেন।

মধুসূদন গুরুর অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া মীমাংসকাচার্য্য নারায়ণ ভট্টের নিকট উপস্থিত হইয়া বিনীতভাবে নিজের অভিপ্রায় জানাইলেন। নারায়ণভট্ট মধুরদর্শন মধুসূদনের রমণীয়াকৃতি, আকৃতির অনুযায়িনী প্রতিভা, ও প্রতিভানুযায়ী শাস্ত্রজ্ঞান দেখিয়া পরম পুলকিত হইলেন, এবং বলিলেন, বাবা! তোমার মত শিষ্যলাভ বহু পুণ্যেই ঘটিয়া থাকে। তুমি যে আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, ইহাতে আমি বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। তোমার মত শিষ্য পাইলেই অধ্যাপনার সার্থকতা হয়। যাহা হউক, আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তোমার হিতের জন্যই বলিতেছি যে, তুমি পণ্ডিতাগ্রগণ্য মাধব সরস্বতীর শিষ্যত্ব গ্রহণ কর। তিনি একজন অতি বিচক্ষণ পণ্ডিত, আমার সতীর্থ ও পিতৃদেবের শিষ্য। তিনি একজন

প্রকাণ্ড নৈয়ায়িক, তুমিও নৈয়ায়িক, সুতরাং তাঁহার নিকটই তোমার পড়িবার সুবিধা হইবে। মধুসূদন নারায়ণভট্টকে নমস্কার করিয়া তাঁহারই উপদেশ অনুসারে মাধব সরস্বতীর নিকট উপস্থিত হইয়া বিনীত ভাবে তাঁহার নিকট নিজ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। মাধব সরস্বতীও মধুসূদনের অধীত গ্রন্থের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাকে পড়াইতে স্বীকৃত হইলেন। মধুসূদন অভিনিবেশ সহকারে মীমাংসাশাস্ত্রাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। মধুসূদনের মীমাংসাশাস্ত্রাধ্যয়নের আর একটী উদ্দেশ্য ছিল এই যে, ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নকালে প্রায়ই দেখিতে পাইতেন যে, নৈয়ায়িকগণ কর্ত্তৃক মীমাংসকের মত খণ্ডিত ও কটাক্ষিত হইয়াছে। সুতরাং, মীমাংসার মত সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত না হইলে, ন্যায়ের মতও পরিস্ফুটরূপে বুঝিতে সুবিধা হয় না। এবার উপযুক্ত গুরুর নিকট ঐ দুই বিরুদ্ধমত মিলাইয়া মীমাংসা করিবার সুবিধা হইল। মাধব সরস্বতীও বিশেষ পরিশ্রমের সহিত মধুসূদনের অভিলাষ পূরণের জন্য বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। মধুসূদনের ঐকান্তিক যত্নে ও গুরুর কৃপায় অল্পদিনের মধ্যেই তিনি মীমাংসাশাস্ত্রে পারদর্শী হইলেন। এখন মধুসূদন—

"সর্ব্বতঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষট্‌পদঃ"

এই শাস্ত্রবাক্যানুসারে মধুকরবৃত্তি অবলম্বন করিয়া নানাবিদ্বৎকুসুম হইতে শাস্ত্রসাররূপ মধু সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। গ্রন্থান্তর পাঠে তাঁহার আর আগ্রহ থাকিল না। তিনি প্রাপ্তব্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। অধীত গ্রন্থের আলোচনায়ই কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

নবদ্বীপের খ্যাতনামা নৈয়ায়িকচূড়ামণি মহামহোপাধ্যায় ৺রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের নিকটও শুনিয়াছি যে, মধুসূদন কাশীধামে মাধব সরস্বতীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মধুসূদনের গুরু।

মধুসূদন বেদান্তাদি শাস্ত্র কাহার নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রবাদ এই যে, তিনি রামতীর্থের নিকট বেদান্ত ও মাধব সরস্বতীর নিকট মীমাংসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। পরে বিশ্বেশ্বর সরস্বতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁহার নিজের উক্তিতেই ইহা প্রমাণীকৃত হয়। তিনি অদ্বৈতসিদ্ধির মঙ্গলাচরণে লিখিয়াছেন—

"শ্রীরাম-বিশ্বেশ্বর-মাধবানা মৈক্যেন সাক্ষাৎকৃতমাধবানাং।
স্পর্শেন নিধূ́ত-তমোরজোভ্যঃ পাদোত্থিতেভ্যস্তু নমো রজোভ্যঃ" ॥

অদ্বৈতসিদ্ধির টীকা ব্রহ্মানন্দ কৃত 'লঘুচন্দ্রিকা" গ্রন্থে এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে যে, শ্রীরাম পরম গুরু, বিশ্বেশ্বর গুরু ও মাধব বিদ্যাগুরু। সুতরাং শিষ্টাচারানুসারে যথাক্রমে পরমগুরু, গুরু ও বিদ্যাগুরুকে নমস্কার করা হইয়াছে। এই তিন জনই সরস্বতী উপাধিধারী। মধুসূদন নিজেই অদ্বৈতসিদ্ধির শেষে বিশ্বেশ্বর সরস্বতীর শিষ্য বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছেন। এবং

"শ্রীমাধবসরস্বত্যো জয়ন্তি যমিনাং বরাঃ"

এই বলিয়া মাধবকেও সরস্বতী বলিয়াছেন। গুরু ও পরমগুরু এক সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া রামও সরস্বতী উপাধিধারী এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমরা যে পূর্ব্বে রামতীর্থের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহা প্রবাদ ও যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া। কারণ, উল্লিখিত ৩ জনের মধ্যে কাহারও কোন গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু রামতীর্থ মধুসূদনের সমসাময়িক ও কাশীতে একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার কৃত অনেক গ্রন্থও দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—বেদান্তসারের "বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী" টীকা, সংক্ষেপশারীরক টীকা, উপদেশসাহস্রী টীকা, আনন্দগিরিবিরচিত

পঞ্চীকরণ বিবরণের উপর "তত্ত্বচন্দ্রিকা" টীকা প্রভৃতি। রামতীর্থ, "তত্ত্বচন্দ্রিকা" টীকায় গুরুর পরিচয়ে শ্রীকৃষ্ণতীর্থের নাম ও নৃসিংহাশ্রমের গুরু জগন্নাথ আশ্রমের নামোল্লেখ করিয়াছেন। এই রামতীর্থ যে রাম-সরস্বতী হইতে ভিন্ন, তাহা সম্প্রদায়গত উপাধি দ্বারাই স্পষ্ট বুঝা যায়। তবে মধুসূদন গুরুশ্রেণীতে রামতীর্থের নাম করিলেন না কেন? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, প্রাচীন নিয়মানুসারে বর্ত্তমানকালেও দেখা যায়, এক জনের ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রের ১০ জন অধ্যাপক থাকিলেও, যাঁহার নিকট পাঠ সমাপন হয়, অধ্যাপকের পরিচয় স্থলে তাঁহার নামই উল্লিখিত হইয়া থাকে। এখানেও তাহাই হইয়াছে। অথবা বুদ্ধিমান্ মধুসূদন একটী "শ্রীরাম" শব্দের প্রয়োগ করিয়া, শব্দশক্তি স্বভাববশতঃ দুইজনকেই নমস্কার করিয়াছেন।

মধুসূদনের গুরুদক্ষিণা।

ন্যায়শাস্ত্র পরিমার্জ্জিতবুদ্ধি, নিষ্ঠাবান্ ও গুরুভক্তিপরায়ণ মধুসূদন জন্মান্তরীয় সংস্কারবলে অতি অল্পকাল মধ্যেই নানা শাস্ত্রে পারদর্শী হইলেন। ইতিমধ্যেই তাঁহার অসাধারণী প্রতিভা পণ্ডিতসমাজকে আলোকিত ও পুলকিত করিল। এতদিন পর্য্যন্ত বিশেষ অধ্যবসায়ের সহিত মধুসূদনকে পড়াইয়া পরমজ্ঞানী ও অশেষশাস্ত্রজ্ঞ রামতীর্থ প্রারব্ধ-সংস্কারবশে হৃদয়ে একটী অভিলাষ পোষণ করিতেছিলেন। এতদিন তাঁহার সেই অভিলাষ পূরণের উপযুক্ত অবসর ঘটে নাই। এখন মধুসূদনকে পাইয়া তাঁহার দ্বারা সেই কার্য্য সম্পাদন করাইবার বাসনা করিলেন। লোকে বলে, ভাগ্যবানের ভার ভগবান্ বহন করেন। এক্ষেত্রেও তাহাই হইল। কল্পনা ও বাসনা, নররূপী মধুসূদনের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া ভগবান্ মধুসূদনই পূরণ করিলেন। মধুসূদন কৃতবিদ্য হইয়াছেন, সংসারে বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, শাস্ত্রপাঠের সম্পূর্ণ ফল তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, জ্ঞাতব্য বিষয় জানিয়াছেন, প্রাপ্তব্য বিষয় পাইয়াছেন, কর্ত্তব্য কর্ম্ম ক্ষয় করিয়াছেন। সুতরাং তিনি

কৃতাঞ্জলিপুটে গুরুর নিকটে উপস্থিত হইয়া গুরুদক্ষিণা দিবার প্রার্থনা করিলেন, এবং চরম আশ্রম সন্ন্যাসের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। রাম-তীর্থের আশা পূর্ণ হইল, তিনি যাহা ভাবিয়াছিলেন, ভগবৎ কৃপায় তাহা তাঁহার অনায়াসেই সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা হইল।

রামতীর্থ বলিলেন, মধুসূদন! তোমার শ্রদ্ধা, ভক্তি, নিষ্ঠা ও শাস্ত্রজ্ঞান আমাকে বশীভূত করিয়াছে। শিষ্যের নিকট গুরুর ইহা অপেক্ষা আর অধিক দক্ষিণা কিছুই হইতে পারে না: তবে যদি তোমার অবশ্যই আমাকে কিছু দিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে তুমি আমার আদেশে অপূর্ব্ব যুক্তি ও কৌশলপূর্ণ ব্যাসাচার্য্য বিরচিত দ্বৈতবাদমূলক ন্যায়ামৃত-গ্রন্থের প্রতিবাদ স্বরূপ অদ্বৈতসিদ্ধি নামক গ্রন্থ রচনা কর। ন্যায়ামৃতগ্রন্থে দ্বৈতবাদিগণের পূর্ব্ব পূর্ব্ব গ্রন্থসকলের মিলিত মত একাধারে আছে, এবং ভবিষ্যতে দ্বৈতবাদিগণের বিরুদ্ধে যে সকল আশঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে, তাহার সম্পূর্ণ নিরাস করিয়া দৃঢ়ভাবে দ্বৈতমত সংস্থাপিত হইয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অদ্বৈতবাদি আচার্য্যগণের মত ও ভবিষ্যতে অদ্বৈতবাদ সমর্থনে যে সকল প্রমাণ উপস্থিত হইতে পারে, তাহাও বিশেষ যত্নের সহিত খণ্ডিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে কাশীতে নানাশাস্ত্রবিৎ অনেক ধুরন্ধর পণ্ডিত আছেন বটে, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত ঐ গ্রন্থের প্রতিবাদ করিতে কেহই অগ্রসর হন নাই, বা সাহসী হন নাই। আমি ঐ কার্য্যে একমাত্র তোমাকেই যোগ্য বলিয়া মনে করি, এবং আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তুমি ঐ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবে। গুরুর আদেশ শ্রবণ করিয়া, মধুসূদন আনন্দে বিভোর হইলেন, এবং বলিলেন গুরুদেব! আমার মত অকৃতী সন্তানের প্রতি এই কার্য্যভার অর্পণ করিয়া,আপনি আমাকে অনুগৃহীতই করিয়াছেন। তবে আমার অপর প্রার্থনাটী আপনাকে পূরণ করিতে হইবে। রামতীর্থ বলিলেন, বাবা! আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি, এবং সর্ব্বদাই তোমার হিতকামনা করিয়া থাকি। সুতরাং, আমরা তোমার দিকে

সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া আছি যে, তোমার প্রখরজ্ঞান-ভাস্কর অদ্বৈতমত-বিরোধি-ভ্রান্তমতরূপ-তিমির সমূহকে নিরাস করিয়া জগৎকে আলোকিত করিবে, তোমার দ্বারাই এই অদ্বৈতবাদ-বংশ প্রতিষ্ঠিত হইবে, তুমিই অদ্বৈতসাম্রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট্ হইবে। তোমার মত যোগ্য ব্যক্তিই সন্ন্যাসগ্রহণের প্রকৃত অধিকারী বটে। তবে আমাদের নিয়ম আছে যে, যিনি সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মণ্ডলেশ্বর, তিনিই সন্ন্যাস দীক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব তুমি সন্ন্যাসগ্রহণের জন্য পরমজ্ঞানী, অতি বিচক্ষণ, নানাশাস্ত্র-পারদর্শী যোগসিদ্ধ বিশ্বেশ্বর সরস্বতীর নিকট গমন কর। তিনি নিশ্চয়ই তোমার মত যোগ্য শিষ্যকে বিমুখ করিবেন না। তাঁহার নিকটই তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে। মধুসূদন, যে আজ্ঞা বলিয়া গুরুর অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন।

মধুসূদনের সন্ন্যাস গ্রহণ।

তৎকালে কাশীক্ষেত্র ভারতের প্রধান বিদ্যাপীঠ ছিল। নানাশাস্ত্রের আলোচনায় নিরন্তর মুখরিত, মুণ্ডিতমস্তক, শ্মশ্রুজটাধারী, গৈরিকবসন-পরিধান, সন্ন্যাসিগণের লীলাভূমি, যাগকর্ম্মনিরত, নিষ্ঠাবান্, তেজস্বী ব্রাহ্মণ গণ কর্ত্তৃক প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রদত্ত আহুতিগন্ধে আমোদিত, পবিত্র বারাণসী ক্ষেত্রে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশ্বেশ্বর সরস্বতীই বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার অসংখ্য শিষ্যগণ কাশীধামকে মহর্ষিগণের পবিত্র তপোবনে পরিণত করিয়াছিলেন। সুতরাং, গুরুর অন্বেষণে মধুসূদনের বিশেষ চেষ্টা করিতে হইল না। তিনি যাহার নিকট জিজ্ঞাসা করেন, সেই বিশ্বেশ্বর সরস্বতীর আশ্রমের কথা বলিয়া দেয়। তিনি অল্পকালের মধ্যেই গুরুর নিকট উপস্থিত হইলেন।

তিনি সেখানে গিয়া আশ্রমের শোভা দর্শন করিয়া অতিশয় মুগ্ধ হইলেন। দেখিলেন, ছায়াপ্রধান পাদপসমূহ-পরিবেষ্টিত একটী বেদির

উপরে বিস্তৃত মৃগচর্ম্মে একটি তেজঃপুঞ্জকলেবর যোগী বদ্ধপদ্মাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তাঁহার চতুর্দ্দিকে শিষ্যগণ ঘিরিয়া বসিয়া আছে। তাহার মধ্যে কেহ বা একাগ্রচিত্তে অনিমেষনেত্রে পুস্তকের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া শাস্ত্রচিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছে, কেহ বা মৌনী, কেহ বা সমাধিমগ্ন, কেহ বা পরস্পর শাস্ত্রালাপে আশ্রম মণ্ডল মুখরিত করিতেছে। আশ্রম-পাদপে বদ্ধনীড় বিহঙ্গম সকল সুমধুর কলরবে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ করিতেছে। পুষ্পবৃক্ষসকলের সৌন্দর্য্য, পুষ্পপরাগবাহী মৃদু সমীরণের সৌগন্ধ, হিংস্র পশুগণের পরস্পর বিমুক্ত-বৈরিভাব, তাঁহার অন্তঃকরণে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দধারা প্রবাহিত করিতে লাগিল। ফলভরাবনত বিটপী সমূহের নবকিশলয়দল মৃদু সমীরণে আন্দোলিত হইয়া হস্তবিস্তার পূর্ব্বক যেন মধুসূদনকে আশ্রমোন্মুখী করিবার জন্য আহ্বান করিতে লাগিল। মধুসূদন এই সকল অকৃত্রিম সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া মনে করিলেন, আমার ভাগ্যে কবে এমন শুভদিন হইবে যে, এইরূপ পরম রমণীয় স্থানে শিষ্যগণ পরিবৃত হইয়া বাস করিব? যাহা হউক, তিনি ধীরে ধীরে গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া যথাযোগ্য নমস্কার পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি পুটে বিনীতভাবে নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন।

বিশ্বেশ্বর সরস্বতী বলিলেন, মধুসূদন! তোমার অসাধারণী প্রতিভা ও সদাচার নিষ্ঠার কথা আমি ইতিপূর্ব্বেই পণ্ডিতাগ্রগণ্য রামতীর্থ মহাশয়ের নিকট অবগত হইয়াছি। তোমার মত যোগ্য শিষ্যকে আমার নিকট প্রেরণ করিয়া রামতীর্থ মহাশয় আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। আমি এইরূপ শিষ্যই চাই। কিন্তু রমণীয় আকৃতি, মধুর বাক্য ও বয়সের অল্পতায় তোমার সন্ন্যাসের অধিকার সম্বন্ধে আমার সংশয় আছে। আমার বোধ হয়, কোন আকস্মিক কারণে তোমার এই ক্ষণিক বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছে। তোমার এ বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। এখন তোমার গার্হস্থ্যাশ্রমের উপযুক্ত সময়। যখন ইন্দ্রিয়ের আসক্তি ও ভোগবিলাস-

বাসনা ক্ষীণ হইবে, তখন আসিও। দেখ, চারিটী আশ্রমের মধ্যে একটীর পর অপরটীর বিধান শাস্ত্রে আছে, কিন্তু সন্ন্যাস আশ্রমই চরম, ইহার পরে আর কোনও আশ্রম নাই। এই আশ্রম হইতে পতিত হইলে তাহার আর উদ্ধার নাই, ইহলোক পরলোক উভয়ই নষ্ট হইবে। বিশ্বেশ্বর সরস্বতীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মধুসূদন হতাশ হইলেন। কিছুকাল মৌনভাবে থাকিয়া বলিলেন, মহাভাগ! আমি অনেক আশা করিয়া আপনার নিকট আসিয়াছি, আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি যে, আমাকে সংসারের কোন প্রলোভন আকর্ষণ করিতে পারিবে না, আমি স্থিরপ্রতিজ্ঞ, সংসারের প্রতি বস্তুতঃই আমি আসক্তিশূন্য হইয়াছি, এবিষয়ে আপনার কোন সন্দেহের কারণ নাই। আপনি দয়া করিয়া আমাকে এই ভববন্ধন হইতে মুক্ত করুন। মধুসূদনের এইরূপ ঐকান্তিকতা ও কাতরতা দেখিয়া বিশ্বেশ্বর সরস্বতী বলিলেন, দেখ, তোমার কথায় আমি বিশ্বাস করিলাম, কিন্তু শাস্ত্রের আদেশ লঙ্ঘন করা কখনও উচিত নহে। তুমি সুপণ্ডিত, অবশ্যই জান যে শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন, গুরু ও শিষ্যকে—

"বর্ষমেকং পরীক্ষয়েৎ"

অর্থাৎ; এক বৎসর পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিবে। সুতরাং, তোমাকে এক বৎসর সময় দিতেছি, তুমি গীতার একখানি টীকা রচনা কর। আমি সম্প্রতি তীর্থ ভ্রমণ উপলক্ষে নানাস্থানে গমন করিব, একবৎসর পরে আবার এখানে ফিরিয়া আসিব। তখন তোমার টীকা দেখিয়া যদি তোমাকে অধিকারী বলিয়া মনে হয়, তবে দীক্ষিত করিব। গীতার মর্ম্ম যাহারা অবগত নহে, তাহারা কখনও সন্ন্যাসের অধিকারী হইতে পারে না। এই বলিয়া বিশ্বেশ্বর সরস্বতী তাহাকে বিদায় দিয়া গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেলেন। মধুসূদন ও তাহাতে অঙ্গীকৃত হইয়া, তাঁহার পদধূলি গ্রহণপূর্ব্বক রামতীর্থের আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং আনুপূর্ব্বী সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন।

মধুসূদনের গীতার টীকা রচনা !

মধুসূদন গুরুর আদেশে গীতার টীকা রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্যচিত্তে ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া নিজের কর্ত্তৃত্ব ভগবানে সমর্পণ করিলেন। ভগবান্ মধুসূদনও—

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তোমাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥"

এই নিজোক্তির সত্যতা প্রতিপাদনের জন্য নররূপী মধুসূদন হইলেন। তিনি গীতার শাঙ্করভাষ্য, এবং অন্যান্য বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক টীকা সকল অভিনিবেশ সহকারে পাঠ ও গুরুর সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। গীতার শাঙ্করভাষ্য অতি সংক্ষিপ্ত ও গূঢ়ার্থ। ঐ মতের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া মধুসূদন "গূঢ়ার্থ দীপিকা" নামক গীতার টীকা লিখিতে আরম্ভ করিলেন। যেন, ভগবানের উক্তিতে তাঁহার মনোভাব আকর্ষণ করিয়া প্রতি অক্ষরের সার্থকতা দেখাইয়া এই টীকা লিখিত হইয়াছে। টীকা লিখিতে প্রায় সংবৎসর কাটিয়া গেল। তাহাতেও সম্পূর্ণ হইল না, একটু অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল। মনে করিলেন, বিশ্বেশ্বর সরস্বতী কৃপা করিয়া সন্ন্যাসে দীক্ষিত করিলে, টীকাটী সম্পূর্ণ করিয়া গুরুর চরণে অর্পণ করিবেন।

এদিকে মধুসূদন শুনিতে পাইলেন যে, বিশ্বেশ্বর সরস্বতী নানাতীর্থ ভ্রমণ করিয়া কাশীধামে উপস্থিত হইয়াছেন। তখন তিনি স্বরচিত টীকাখানি লইয়া বিশ্বেশ্বর সরস্বতীর নিকট উপস্থিত হইয়া ভক্তিভাবে নমস্কারপূর্ব্বক ঐ টীকাখানি তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন। তিনি মধুসূদনের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, আমি তোমার এই টীকাখানি পড়িয়া দেখি, তুমি কয়েকদিন পরে আসিও। মধুসূদন তাঁহার আদেশমতে তাঁহাকে পুনর্ব্বার নমস্কার করিয়া, নিজ বাসস্থানে গমন করিলেন।

মধুসূদনের গীতার টীকা দেখিবার জন্য বিশ্বেশ্বর সরস্বতীর নিতান্ত ঔৎসুক্য জন্মিয়াছিল। মধুসূদনের মত যোগ্যব্যক্তির কোনরূপ পরীক্ষার আবশ্যকতা না থাকিলেও, নানা সম্প্রদায় কর্ত্তৃক গীতার নানারূপ বিরুদ্ধ ব্যাখ্যা দর্শন করিয়া বিশ্বেশ্বর সরস্বতীর একটী অভিপ্রায় হইয়াছিল যে, ভগবদুপদিষ্ট গীতার একটী উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা হওয়া আবশ্যক, যদ্দ্বারা ভগবদ্বাক্যের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করা যাইতে পারে। শিষ্যপরীক্ষাচ্ছলে মধুসূদনের দ্বারা তিনি ঐ কার্য্য সম্পাদন করাইয়া লইলেন। কারণ, তাঁহার বিশ্বাস ছিল, এবিষয়ে মধুসূদনের ন্যায় যোগ্য লোক কেহই নাই।

বিশ্বেশ্বর সরস্বতী মধুসূদনের টীকা দেখিতে আরম্ভ করিলেন। দেখিলেন লেখার কি অপূর্ব্ব ভঙ্গি! ভগবদুক্ত প্রত্যেক পদের সার্থকতা দেখাইয়া এরূপ সরল ভাব ও তাৎপর্য্য ইহাতে নিবেশিত হইয়াছে যে, তাহা অবর্ণনীয়। প্রত্যেক পঙ্‌ক্তিপাঠে বিশ্বেশ্বর সরস্বতীর আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি মনে করিলেন, মধুসূদন সামান্য মানুষ নহেন, ইনি জন্মান্তরসিদ্ধ মহাযোগী। নতুবা জ্ঞান ও ভক্তির এরূপ সমন্বয় কথনও সম্ভাবিত হইত না। সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থের সহিত সামঞ্জস্য, সাম্প্রদায়িক বিরোধ শূন্যতা, ন্যায়ানুবর্ত্তিতা ও ভগবৎপ্রবণতা ইহার প্রত্যেক অক্ষরে পরিস্ফুট হইয়াছে। যাহাহউক, আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে, এত অল্পবয়সে এইরূপ জ্ঞানের পরিপক্কতা আমি আর কোথাও দেখি নাই। মধুসূদনকে শিষ্যরূপে প্রাপ্ত হইয়া আমি ধন্য হইলাম।

কয়েকদিন পরে মধুসূদন বিশ্বেশ্বর সরস্বতীর নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি সস্নেহ মধুর সম্ভাষণে তাঁহাকে বলিলেন, বাবা! তুমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছ, তোমার টীকা দেখিয়া আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। শুভদিন ও শুভক্ষণে তুমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পার। পরে তাহাই হইল। শুভদিন ও শুভক্ষণে মধুসূদন সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। তাঁহার অপূর্ব্বতেজঃ শরীর ফুটিয়া যেন বাহির হইতে লাগিল। নররূপী মধুসূদন

এখন "সন্ন্যাসগ্রহণমাত্রেণ নরোনারায়ণঃ স্বয়ং" এই শাস্ত্রানুসারে নারায়ণ-রূপী মধুসূদন হইলেন। তিনি এখন স্বয়ং জ্যোতিঃ, জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ হইলেন। এখন শাস্ত্রচর্চ্চা অপেক্ষা সাধন ভজনের দিকেই অতিশয় আগ্রহান্বিত হইলেন। গীতার টীকার অবশিষ্ট অংশটুকু সমাপ্ত করিয়া গুরুর চরণে অর্পণ করিলেন। এ বিষয়ে তাঁহার নিজের উক্তি এই ;

"শ্রীরাম-বিশ্বেশ্বর-মাধবানাং প্রসাদমাসাদ্য ময়া গুরূণাং।
ব্যাখ্যানমেতদ্ বিহিতং সুবোধং সমর্পিতং তচ্চরণাম্বুজেষু॥"

অর্থাৎ ; শ্রীরাম, বিশ্বেশ্বর ও মাধব নামক গুরুগণের প্রসন্নতা লাভ করিয়া সংকৃত এই অনায়াসগম্য গীতার ব্যাখ্যাগ্রন্থ তাঁহাদের চরণপদ্মে সমর্পণ করিলাম।

অদ্বৈতসিদ্ধি রচনা।

অদ্বৈতসিদ্ধি রচনা করিবার জন্য মধুসূদন পূর্ব্বেই গুরু রামতীর্থ কর্তৃক আদিষ্ট হইয়াছেন। বিশ্বেশ্বর সরস্বতীর আদেশে গীতার টীকা ইতিপূর্ব্বেই পরিসমাপ্ত হইয়াছে। এখন অবকাশক্রমে অদ্বৈতসিদ্ধি রচনা করিবার সঙ্কল্প করিলেন। এইরূপ গ্রন্থ লিখিতে হইলে, বিপক্ষগণের সমুদয় মত জানা একান্ত আবশ্যক। এজন্য গুরু রামতীর্থের সহিত মিলিতভাবে মাধ্বসম্প্রদায়ের গ্রন্থসকল আলোচনা করিতে লাগিলেন। মাধ্বসম্প্রদায়গণ শিষ্য-প্রশিষ্য ক্রমে বহু পুরুষ যাবৎ অদ্বৈতমত খণ্ডনার্থ বহু যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে অখণ্ডনীয় প্রভূত যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া, নিজ মতকে দৃঢ় ও পরিপুষ্ট করিয়াছেন। ঐ সকল যুক্তিতর্ক অপূর্ব্বকৌশলে ও বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া, পণ্ডিতাগ্রগণ্য ব্যাসতীর্থ মহাশয় নিজের উদ্ভাবিত বহু তর্ক ও যুক্তি দ্বারা পরিপুষ্ট করিয়া যে ন্যায়ামৃত গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহাতে পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যগণের সমুদয় মত এবং স্বোদ্ভাবিত বহু যুক্তি তর্ক ও ভবিষ্যতে যে সকল আপত্তি উঠিতে পারে, তাহার সমুদয় বিবরণ বিস্তৃত

ভাবে নিবদ্ধ আছে। সুতরাং, একমাত্র ন্যায়ামৃতের খণ্ডন করিতে পারিলেই মাধ্বমতের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান আক্রমণ হইতে অদ্বৈত-মতকে রক্ষা করা যায়। বহুদর্শী ও অশেষশাস্ত্রবিৎ রামতীর্থও মধুসূদনকে এই কথাই বলিয়াছিলেন। মধুসূদন গুরুবাক্যের যাথার্থ্য উপলব্ধি করিয়া ন্যায়ামৃতের প্রত্যেক পঙ্‌ক্তি ধরিয়া খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইলেন। বস্তুতঃ, গুরুর আদেশে ন্যায়ামৃতের মত খণ্ডন করিয়া স্বসম্প্রদায়কে রক্ষা করাই অদ্বৈতসিদ্ধি রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য। যদিও এই বিচিত্র জগৎ প্রপঞ্চ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ বলিয়া বোধ হইতেছে, যদিও এই জগৎপ্রপঞ্চের কার্য্য ও কারণ উভয়ই সৎ, অথবা কোনটী সৎ,কোনটী অসৎ,কিংবা সকলই অসৎ,আত্মা প্রতিদেহে ভিন্ন অথবা সকল আত্মাই এক প্রভৃতি মতবাদ এবং পরিণামবাদ, পরমাণু-বাদ, দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি বহুমতবাদ বহুলযুক্তি তর্ক ও শ্রুতি-দ্বারা কোনটী সমর্থিত ও কোনটী খণ্ডিত হইয়াছে,তথাপি কেবল শ্রুতিবলে তদনুকূল যুক্তি ও অনুমানাদি প্রমাণ দ্বারা বিশ্বপ্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন পূর্ব্বক অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপাদন করায়ই এই গ্রন্থের নাম অদ্বৈতসিদ্ধি হইয়াছে। দ্বৈতজ্ঞান, অদ্বৈতজ্ঞানের বিরোধী বলিয়া এবং অদ্বৈতজ্ঞানই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার বা মুক্তির হেতু বলিয়া দ্বৈতবাদের মিথ্যাত্ব সাধন পূর্ব্বক—

"তত্র কোমোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ।"

এই শ্রুত্যুপদিষ্ট অদ্বৈততত্ত্বপ্রতিপাদন ও আনুষঙ্গিক-ফলস্বরূপ দ্বৈত-বাদিগণের মত নিরাস করাই ইহার অন্যতর উদ্দেশ্য।

একটু প্রণিধান পূর্ব্বক আলোচনা করিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে যে, যে বস্তু কোন প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ করিতে হয়, তাহা হয়ত অসিদ্ধ ছিল, বা তাহার সিদ্ধিতে কোনরূপ সংশয় আছে। সুতরাং, অদ্বৈতসিদ্ধি রচনা দ্বারা ও স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, অদ্বৈতবস্তু পূর্ব্বে অসিদ্ধ ছিল, অথবা তাহার সিদ্ধিতে কোনরূপ সংশয় আছে। প্রথম কথা এই যে—

অদ্বৈত অসিদ্ধ নহে।

অদ্বৈত চিন্তাস্রোতের মূলপ্রস্রবণ সর্ব্বজ্ঞ বেদ। এই অমূল্যরত্ন স্বতঃ-প্রমাণ বেদই জীবনিবহের কল্যাণের জন্য ঋষিগণের মুখে জগতে প্রকাশিত হইয়াছেন। এই অমূল্যরত্নের বিমলজ্যোতিঃ পুরাণ, ইতিহাস, তন্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতির মধ্য দিয়া জগতে প্রচারিত হইয়াছিল। এমন কি অভিনিবেশ সহকারে আলোচনা করিলে দেখা যায়, বৌদ্ধমতও ইহারই প্রভায় প্রদীপ্ত হইয়াছে। শূন্যবাদিগণের মতও শ্রুতিসাগর হইতে উৎপন্ন। নৃসিংহ-তাপনীয় উপনিষদে ব্রহ্মকে "শূন্য" বলা হইয়াছে।

বৌদ্ধ ও অন্যান্য তন্মতানুযায়ী মতবাদ সকল বেদ হইতে উৎপন্ন হইয়াও বিকৃত ব্যাখ্যাবশে আস্তিকগণের অশ্রদ্ধেয় হইয়াছে। সাধারণের ধারণা আছে, ভগবান্ বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্র রচনা করিয়া,জগতে সর্ব্বপ্রথম অদ্বৈতবাদ সংস্থাপন করেন ও ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য উহার পুষ্টিসাধন করেন। এইরূপ সিদ্ধান্ত নিতান্ত বালকোচিত বলিয়াই মনে হয়। কারণ, ব্রহ্মসূত্রেও ভগবান্ বেদব্যাস কাশকৃৎস্ন, ঔড়ুলোমী, কার্ষ্ণাজিনি, আত্রেয়, জৈমিনি, আশ্মরথ্য, বাদরি ও বাদরায়ণ প্রভৃতি আচার্য্যগণের নাম সম্মানের সহিত উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে যে এই চিন্তাস্রোতঃ প্রবাহিত হইয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কালক্রমে বেদের আলোচনার হ্রাস হইলে, এই স্রোতঃ ও ক্রমেই শিথিল হইয়া পড়ে। তখন অদ্বৈত চিন্তাস্রোতের বিরুদ্ধে একটী প্রবল দ্বৈতবাদমূলক মতবাদ সাধারণের মধ্যে প্রচার লাভ করে। তাহার মধ্যে ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য ও পাতঞ্জল প্রভৃতি গ্রন্থ এবং তন্মূলক বহু গ্রন্থ দ্বৈতবাদের সংস্থাপনে বদ্ধপরিকর হইয়া অদ্বৈতবাদের প্রবলসেতুকেও ভাঙ্গিয়া ফেলিবার উপক্রম করে। সুতরাং, দ্বৈতবাদমূলক গ্রন্থের সঙ্গে সঙ্গে অদ্বৈতাচার্য্যগণও তাহার প্রতিবাদ স্বরূপ বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া জগতে অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

মহাভারতের সনৎসুজাতীয় পর্ব্বাধ্যায়ে জানা যায় যে, সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মার মানসপুত্র সনকাদি ঋষি ত্রেতা যুগে বশিষ্ঠাদি ঋষি, দ্বাপরে বেদব্যাস, তৎপুত্র, শুক ও শিষ্য বৌধায়ন প্রভৃতি ঋষিগণ,কলিযুগে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ও তৎসম্প্রদায়ভুক্ত মনীষিগণের মধ্যে এই অদ্বৈতচিন্তা মন্দাকিনীর প্রবলস্রোতঃ প্রবাহিত হইতেছিল। বস্তুতঃ, অঙ্কশাস্ত্রের মূলভূত একত্বসংখ্যা যেরূপ পরার্দ্ধ পর্য্যন্ত সংখ্যায় অনুগত, এবং দ্বিত্বাদিসংখ্যা অপেক্ষাবুদ্ধিজন্য, অপেক্ষাবুদ্ধির নাশ হইলেই দ্বিত্বাদির নাশ হয়। সেইরূপ সর্ব্বমানবের অনুভব সিদ্ধ, অদ্বৈততত্ত্ব জ্ঞান হইলে, সকল ভেদজ্ঞান তিরোহিত হয়! ইহার অপলাপের চেষ্টা করা কেবল বলপূর্ব্বক কূটতর্কের অবলম্বনে বিফল আগ্রহ মাত্র।

অদ্বৈত সিদ্ধিতে সংশয়।

বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পরেও অদ্বৈত মত অক্ষুণ্ণ ছিল। ভগবান্ বুদ্ধদেব সংসারের অনিত্যতা দর্শন করিয়া অদ্বৈততত্ত্বেই শ্রদ্ধাবান্ হইয়াছিলেন, এবং বেদোক্ত সাধনমার্গেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এজন্য কোষগ্রন্থে তিনি "অদ্বয়বাদী" বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। তিনি জ্ঞানের চরম কাষ্ঠা প্রাপ্ত হওয়ায়, কর্ম্মকাণ্ডের অতীত হইয়াছিলেন, এজন্য বৈদিক ক্রিয়াকর্ম্মের প্রতি উপেক্ষা করায় অর্থাৎ কর্ম্ম অপেক্ষা জ্ঞানের উৎকর্ষ প্রতিপাদনে বদ্ধপরিকর হওয়ায়, তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্য সম্প্রদায় বেধবিরোধী অদ্বৈতমতের সৃষ্টি করিল। তাহাতে ক্ষণিকবাদ, ক্ষণভঙ্গুরবাদ, বিজ্ঞানবাদ প্রভৃতি মতবাদের সৃষ্টি হইয়া বেদমূলক অদ্বৈততত্ত্ব বিকৃত আকার ধারণ করিল। এই মূলোচ্ছেদী বৌদ্ধমতের প্রচারে অশ্বঘোষ, নাগার্জ্জুন, দিঙ্‌নাগাচার্য্য, অসঙ্গ, বসুবন্ধু প্রভৃতি মহামনীষিগণ, কর্ণধার হইয়া বেদবিরোধী মতবাদে জগৎকে আলোক দানের পরিবর্ত্তে একটী গাঢ়-তমসাচ্ছন্ন গহ্বরে নিয়া আবদ্ধ

করিলেন। এই মতবাদের বিরুদ্ধে বাৎস্যায়নভাষ্য, পাতঞ্জলভাষ্য, সাংখ্য কারিকা, প্রশস্তপাদভাষ্য, শবরস্বামীর মীমাংসাভাষ্য, দ্রবিড়াচার্য্যের বেদান্ত ব্যাখ্যা, কুসুমাঞ্জলি, ও কুমারিলভট্টের প্রাণপাত চেষ্টা বৈদিক-ধর্ম্মকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। ভারতের অধিকাংশ প্রধান প্রধান রাজগণ বৌদ্ধগণের এই বিকৃত বেদবিরোধী অদ্বৈতবাদেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ সাম্রাজ্যের বিজয়স্তম্ভ ধর্ম্মপাল, ধর্ম্মকীর্ত্তি প্রভৃতি প্রধান প্রধান বৌদ্ধাচার্য্যগণ, মহামনীষি প্রভাকর ও কুমারিলভট্টের সহিত বিচারে পরাজিত হওয়ায়, বৌদ্ধধর্ম্ম নির্জীব ও হতপ্রভ হইল, তাহাদের আর পুনরুত্থানের শক্তি রহিল না। ইহাতে বৈদিকধর্ম্ম রক্ষিত হইলেও অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠা হইল না।

বৌদ্ধগণের প্রবল আক্রমণে অদ্বৈতবাদের চিন্তাধারা ক্রমেই মন্দীভূত হইয়াছিল। ইহার পরে কূটতার্কিক দ্বৈতবাদিগণের কর্কশ তর্কজাল অদ্বৈতমতকে এরূপভাবে আবৃত করিয়াছিল যে, ঐ তর্কজাল ভেদ করিয়া অদ্বৈততত্ত্বের স্বরূপ অবগত হওয়া সাধারণের পক্ষে অসাধ্য হইয়াছিল। এমন কি, ঐ সকল যুক্তিজাল ভেদ করিতে অসমর্থ হইয়া অনেক অদ্বৈতবাদী মহাধুরন্ধর পণ্ডিতবর্গও অদ্বৈততত্ত্ব সম্বন্ধে বিষম সংশয়াকুল হইয়াছিলেন। অদ্বৈতমতের বিরোধিতায় মাধ্বসম্প্রদায় বহু শতাব্দী ধরিয়া শিষ্য-প্রশিষ্য-পরম্পরায় বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। এই মাধ্বসম্প্রদায়ের পণ্ডিত ধুরন্ধর মহামতি ব্যাসাচার্য্য অপূর্ব্ব যুক্তি ও কৌশলপূর্ণ "ন্যায়ামৃত" নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে পূর্ব্ববর্ত্তী দ্বৈতবাদীগণের যাবতীয় যুক্তি ও নিজের উদ্ভাবিত যুক্তি সমূহের সমন্বয় সাধনপূর্ব্বক, পূর্ব্ববর্ত্তি অদ্বৈতাচার্য্য গণের প্রদর্শিত যুক্তি ও ভবিষ্যতে যে সকল যুক্তিতর্ক উপস্থিত হইতে পারে, তাহার আলোচনাপূর্ব্বক অকাট্য যুক্তি ও তর্কবলে অদ্বৈতমত খণ্ডিত হইয়াছে। সুতরাং, সরলমতি সুধীবৃন্দ সত্যান্বেষণে পরাঙ্মুখ হইয়া অদ্বৈততত্ত্বের সত্যতায় বিষম সংশয়াকুল হইয়াছিলেন। সেই

সংশয় নিরাসের জন্য ন্যায়ামৃতের মত বিশদভাবে খণ্ডিত করিয়া অতীত ও বর্ত্তমানকালের মতসমূহ ও ভবিষ্যতে আক্ষেপযোগ্য যাবতীয় দুরূহ মতবাদ কদলীকাননের ন্যায় অনায়াসে ছিন্ন করিয়া, অদ্বৈতসিদ্ধিরূপ নিশিত অসি প্রকাশিত হইয়াছে। এই অদ্বৈতবেদান্তস্রোতঃ দীর্ঘকাল হইতে প্রবাহিত থাকিলেও, অন্তঃসলিলা ফল্গু নদীর ন্যায় সাধারণের নিকট বিশেষ-রূপে অভিব্যক্ত হয় নাই। যখনই এই স্রোতঃ কোনরূপ বিরুদ্ধ পক্ষদ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে, তখনই অদ্বৈতবেদান্তাচার্য্যগণ তাহার পথ পরিষ্কার করিয়া দিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। এইরূপ বহু বাধা প্রাপ্ত হওয়ায়, আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক অত্যুপাদেয় বহু বেদান্তগ্রন্থ নির্ম্মিত হইয়াছে। বহু-কালের চেষ্টায় মাধ্বসম্প্রদায়ের চরম চেষ্টার প্রতীকারের বিজয়স্তম্ভ এই অদ্বৈতসিদ্ধি। বস্তুতঃ, বিপক্ষগণের উদ্দাম-মত-দাবানলে দংদহ্যমান হইয়া, এই অদ্বৈততত্ত্ব অগ্নিদগ্ধ সুবর্ণের ন্যায় আরও অধিকতর পরিশুদ্ধ এবং উজ্জ্বল হইয়া সুধীবৃন্দের নিকট সমধিক আদরণীয় হইয়াছে। অদ্বৈতাচার্য্যগণ, কেহ ভাষ্য, কেহ টীকা, কেহ স্তোত্রাদি ও কেহ বা মূলগ্রন্থ রচনা করিয়া এই ধারার পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। কালক্রমে অনেক গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়াছে। আর, যাহারা গ্রন্থ নির্ম্মাণ না করিয়া অধ্যাপনাদির সাহায্যে এই মতের পোষণ করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম জানিবার কোন উপায় নাই কতকাল যাবৎ কত আচার্য্য নিবিড় অরণ্যে বা নিভৃত গহ্বরে এই অদ্বৈত সাধনায় সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন, তাহা কে বলিবে? আমরা এ সম্বন্ধে কয়েকজনমাত্র আচার্য্যের নাম উল্লেখ করিতেছি।

অদ্বৈতবাদী বেদান্তাচার্য্যগণ শ্রুতি, যুক্তি ও স্বীয় সমাধিসিদ্ধ অনুভবের দ্বারা যে অদ্বৈততত্ত্ব প্রচার করেন, কালক্রমে বৌদ্ধ, জৈন, তার্কিক ও অন্যান্য সম্প্রদায় দ্বারা তাহা খণ্ডিত হয়, সুতরাং সেই সকল বাধার প্রতীকারের জন্যই পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক বহু গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে।

বস্তুতঃ, সকল বাধা অতিক্রম করিয়া ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের সময়েই অদ্বৈততত্ত্বস্রোতঃ প্রবলভাবে প্রবাহিত হয়। তাঁহার অদ্বৈতমত-বাদের প্রবল বন্যায় ভারতবর্ষ প্লাবিত হয়, এবং সাধারণদৃষ্টিতে অখণ্ডনীয় অন্যান্য মতবাদগুলি তৃণরাশির ন্যায় অদৃশ্যদেশে ভাসিয়া যায়। ইহার পরে যে সকল বিরুদ্ধ মতবাদ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যগণ কর্ত্তৃকই সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে। অদ্বৈতমত-বিরোধী ভূত, ভবিষ্যৎ, ও বর্ত্তমান মতবাদের সমষ্টিস্বরূপ ব্যাসতীর্থের আগ্নেয়াস্ত্র ন্যায়ামৃত গ্রন্থ, চিন্তনীয় ও অচিন্তনীয় যাবতীয় বিরুদ্ধমতের নিরাসক অদ্বৈতসিদ্ধিরূপ বারুণাস্ত্রের বিমল-শান্তি-সলিলধারায় নির্ব্বাপিত হইয়াছে। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী সঙ্কলিত ইতিহাসের সাহায্যে সঙ্ক্ষেপে অদ্বৈতবেদান্তাচার্য্যগণের সম্প্রদায় লিখিত হইল। যথা—

১। গৌড়পাদ
তৎশিষ্য
২। গোবিন্দপাদ
তৎশিষ্য
৩। শঙ্করাচার্য্য
তৎশিষ্য ৪ জন
৪। পদ্মপাদাচার্য্য (১)
৫। সুরেশ্বরাচার্য্য (২)
৬। হস্তামলকাচার্য্য (৩)
৭। তোটকাচার্য্য (৪)
সুরেশ্বরাচার্য্যের শিষ্য
৮। সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি
৯। বোধঘনাচার্য্য
১০। বাচস্পতিমিশ্র
অব্যয়াত্ম ভগবানের শিষ্য
১১। অবিমুক্তাত্ম ভগবান্
অনন্যানুভবের শিষ্য
১২। প্রকাশাত্মযতি
নৈয়ায়িক
১৩। রঘুনাথ শিরোমণি
"
১৪। উদয়নাচার্য্য
"
১৫। শ্রীধরাচার্য্য
"

১৬। শ্রীহর্ষ
(খণ্ডনখণ্ডখাদ্য রচয়িতা)
১৭। শ্রীকৃষ্ণমিশ্র যতি
(প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক
রচয়িতা)
১৮। চিদ্বিলাস বা অদ্বৈতানন্দ
১৯। বাদীন্দ্রাচার্য্য বা
বাগীশ্বরাচার্য্য
২০। আনন্দবোধেন্দ্র ভট্টারক
২১। আনন্দপূর্ণ
২২। জ্ঞানোত্তমাচার্য্য
তৎশিষ্য
২৩। চিৎসুখাচার্য্য
তৎশিষ্য
২৪। সুখপ্রকাশ
তৎশিষ্য
২৫। অমলানন্দ যতি
২৬। শঙ্করানন্দ বা
বিদ্যাশঙ্কর
২৭। শ্রীধরস্বামী
২৮। প্রত্যক্প্রকাশ
তৎশিষ্য
২৯। প্রত্যক্স্বরূপ ভগবান্
৩০। ভারতীতীর্থ
৩১। বিদ্যারণ্যমুনি
(পঞ্চদশী প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা)
তদ্ভ্রাতা
৩২। সায়ণাচার্য্য
৩৩। অনুভূতি স্বরূপাচার্য্য
তৎশিষ্যত্রয়
৩৪। নরেন্দ্রগিরি (১)
৩৫। প্রজ্ঞানানন্দ (২)
৩৬। আনন্দজ্ঞান বা
আনন্দগিরি (৩)
তৎশিষ্য
৩৭। অখণ্ডানন্দ
৩৮। প্রকাশানন্দ সরস্বতী
৩৯। রঙ্গরাজ অধ্বরী
তৎপুত্র
৪০। অপ্পয় দীক্ষিত
তৎশিষ্য
৪১। ভট্টোজী দীক্ষিত
৪২। নানা দীক্ষিত
৪৩। মল্লনারাধ্যাচার্য্য
৪৪। জগন্নাথ আশ্রম
তৎশিষ্যদ্বয়
৪৫। রামতীর্থস্বামী (১)
৪৬। নৃসিংহ আশ্রম (২)
তৎশিষ্যদ্বয়
৪৭। নারায়ণ আশ্রম। (১)

৪৮। রঙ্গোজী ভট্ট (২
(ভট্টোজী দীক্ষিতের ভ্রাতা)
৪৯। অদ্বয়ানন্দ সরস্বতী
তৎশিষ্য
৫০। সদানন্দ যোগীন্দ্র
৫১। নীলকণ্ঠসূরি।
৫২। সদাশিবব্রহ্মেন্দ্র
৫৩। রামতীর্থ
৫৪। রাম সরস্বতী
৫৫। মাধব সরস্বতী
৫৬। বিশ্বেশ্বর সরস্বতী
তৎশিষ্য
৫৭। মধুসূদন সরস্বতী
তৎশিষ্যত্রয়
৫৮। বলভদ্র (১
৫৯। পুরুষোত্তমসরস্বতী (২)
৬০। শেষগোবিন্দ (৩)
৬১। সদানন্দ ব্যাস
৬২। বেঙ্কটনাথ
তৎশিষ্য
৬৩। ধর্ম্মরাজ অধ্বরীন্দ্র
(বেদান্ত পরিভাষা প্রণেতা)
তৎপুত্র
৬৪। রামকৃষ্ণাধ্বরী
৬৫। নৃসিংহ সরস্বতী
৬৬। রাঘবেন্দ্র বা
রাঘবানন্দ সরস্বতী
৬৭। পেড়ডা বা
হৃষীকেশ দীক্ষিত
৬৮। শিবরামাচার্য্য
৬৯। পরমানন্দ সরস্বতী
তৎশিষ্য
৭০। ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী
৭১। নারায়ণতীর্থ
৭২। শিবরাম আশ্রম
(এই দুই জনই ব্রহ্মানন্দের
বিদ্যাগুরু)
৭৩। স্বয়ং জ্যোতিঃ সরস্বতী
তৎশিষ্য
৭৪। অচ্যুত কৃষ্ণানন্দতীর্থ
৭৫। গোবিন্দানন্দ
তৎশিষ্য
৭৬। রামানন্দ সরস্বতী
৭৭। কৃষ্ণানন্দ সরস্বতী
৭৮। কাশ্মীরী সদানন্দ স্বামী
৭৯। রঙ্গনাথাচার্য্য
৮০। নরহরি
৮১। দিবাকর
ইত্যাদি।

এই সকল অদ্বৈতবেদান্তাচার্য্যগণের পূর্ব্বেও ভর্তৃহরি, ভর্তৃপ্রপঞ্চ, ব্রহ্মনন্দী, টঙ্ক, গুহদেব, ভারুচি, কপর্দ্দী বোধায়ন, উপবর্ষ, বিষ্ণুস্বামী প্রভৃতি এবং পরবর্ত্তীকালেও ভাস্কর দীক্ষিত, হরিদীক্ষিত, আয়ন্নদীক্ষিত, বিট্‌ঠলেশোপাধ্যায়, মহাদেবেন্দ্র সরস্বতী, সদাশিবেন্দ্র সরস্বতী, উদাসীনস্বামী অমরদাস, ধনপতি সূরি ও শিবদাস আচার্য্য প্রভৃতি অদ্বৈতমতানুকূলকারী বহু আচার্য্যের নাম পাওয়া যায়। বহুকাল যাবৎ দ্বৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, শিববিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ প্রভৃতি মতবাদিগণ অদ্বৈতমতের বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রাম করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে রামানুজাচার্য্য সম্প্রদায়, মাধ্বাচার্য্য সম্প্রদায় ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায়ই বিশেষরূপে অদ্বৈতমতকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। গ্রন্থগৌরব ভয়ে তাহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত হইল না।

অদ্বৈতসিদ্ধির সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

গ্রন্থকার এই অপূর্ব্ব গ্রন্থখানি নব্যন্যায়ের সূক্ষ্ম পদার্থতত্ত্ব লইয়া বিশেষ নিপুণতার সহিত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই গ্রন্থে পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত সকল লিপিবদ্ধ হইয়াছে, এবং পূর্ব্ববর্ত্তী প্রতিপক্ষগণের আপত্তি সকল ও খণ্ডিত হইয়াছে। পরবর্ত্তীকালে বেদান্তশাস্ত্রের যে সকল গুপ্ত রহস্য প্রকাশিত হইতে পারে, তাহার নির্দ্দেশ এবং প্রতিপক্ষগণ কর্তৃক ভবিষ্যৎ-কালে যতপ্রকার দোষের উদ্‌ঘাটন হইতে পারে, আশঙ্কার উত্থাপন প্রসঙ্গে তাহারও নিরাস করা হইয়াছে। সুতরাং, এক কথায় যাবতীয় বেদান্ততত্ত্ব এবং বিপক্ষগণের যাবতীয় আক্ষেপের সমাধান, এই উভয়ই ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এইরূপ নির্দ্দোষ রচনাপরিপাটী আর কোন গ্রন্থে দেখা যায় না। এই গ্রন্থখানি ৪ চারি অধ্যায়ে বিভক্ত। ১ম অধ্যায়ে ৬৪টী পরিচ্ছেদ। ২য় অধ্যায়ে ৩৪টী, ৩য় অধ্যায়ে ৮টী ও ৪র্থ অধ্যায়ে ৬টী পরিচ্ছেদ আছে। সুতরাং, ৪ চারি অধ্যায়ে মোট ১১২টী পরিচ্ছেদে এই গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে।

১ম অধ্যায়ে—প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব নিরূপণ।

২য় ,, আত্মনিরূপণ।

৩য় ,, —শ্রবণ-মননাদি সাধন নিরূপণ।

৪র্থ ,, —মুক্তিনিরূপণ।

এই সকল বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা এই গ্রন্থে আছে। বিশ্বপ্রপঞ্চ মিথ্যা, ব্রহ্ম সত্য, জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন, মুক্তির আনন্দরূপতা প্রভৃতি বিষয়-গুলি অতি পরিস্ফুটরূপে ইহাতে প্রতিপাদিত হইয়াছে। সৎ, অসৎ ও মিথ্যা, এই তিনটী পদার্থ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা আছে। সৎ ব্রহ্ম, অসৎ আকাশকুসুম, বন্ধ্যাপুত্র প্রভৃতি। সৎ' এর ত্রৈকালিকসত্তা আছে, কিন্তু অদৃশ্য। অসৎ' এর কোনকালেই সত্তা নাই, সেও অদৃশ্য। আর মিথ্যার কোনকালেই সত্তা নাই, কিন্তু দৃশ্য বা উপলব্ধির বিষয় হইয়া থাকে। এই জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদনের জন্য শ্রুত্যনুকূল অনুমান প্রমাণ গৃহীত হইয়াছে। এই মিথ্যার অধিষ্ঠান ব্রহ্ম, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইলে সমূল অজ্ঞানের নাশ হয়, তজ্জ্ঞানের নাশ হইলে মিথ্যা পদার্থেরও উপলব্ধি হয় না, ইহাই এই গ্রন্থের মুখ্য প্রতিপাদ্য। জগতের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ করার জন্য দৃশ্যত্ব, জড়ত্ব,অংশিত্ব ও পরিচ্ছিন্নত্ব এই কয়েকটী হেতু প্রদর্শিত হইয়াছে। এই হেতুকয়েকটীর লক্ষণও ইহাতে দেখান হইয়াছে, এবং এই অনুমানের বিরুদ্ধে যতপ্রকার প্রমাণ উপস্থাপিত করা যাইতে পারে, তৎসমুদয়ও বিশেষ যুক্তি ও প্রমাণবলে খণ্ডিত হইয়াছে। সুতরাং, এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি সম্যক্ রূপে হৃদয়ঙ্গম হইলে, অদ্বৈতসিদ্ধান্তের বা তাহার বিরুদ্ধমতের কোনরূপ নূতন কল্পনার অবসর থাকে না। মধুসূদন এই গ্রন্থখানিকে অন্যান্য আচার্য্যগণের গ্রন্থের সমান আসনে বসাইয়াছেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন—

সিদ্ধীনামিষ্ট-নৈষ্কর্ম্ম্য-ব্রহ্মগানামিয়ং চিরাৎ।
অদ্বৈতসিদ্ধিরধুনা চতুর্থী সমজায়ত ॥

অর্থাৎ—সিদ্ধিগ্রন্থের মধ্যে অবিমুক্তাত্ম ভগবান্ কৃত ইষ্টসিদ্ধি, সুরেশ্বরাচার্য্যকৃত নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি ও ব্রহ্মসিদ্ধির পরে এই অদ্বৈতসিদ্ধি চতুর্থ সিদ্ধিগ্রন্থ হইল। বস্তুতঃ,মধুসূদন কঠোর সাধনাবলে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সাধকজীবনের পরে সিদ্ধজীবনে যে পরীক্ষিত সত্যস্বরূপের উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহাই এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গ্রন্থকার অনেক আছেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে হয় ত কাহারও কাহারও কঠোর সাধনা নাই। সাধনা থাকিলেও হয়ত সিদ্ধিলাভ ঘটে নাই। যাঁহারা সিদ্ধ হইয়াছেন, হয়ত তাঁহারা কোন নিজের মত, নিজের অপরোক্ষ সত্যানুভবের বিষয় লিপিবদ্ধ করেন নাই। সুতরাং, সাধন, সিদ্ধি ও গ্রন্থকর্ত্তৃত্বরূপে মধুসূদনের মত কাহারও মতের সম্পূর্ণ প্রামাণ্য বা যাথার্থ্য অঙ্গীকৃত হইতে পারে না ইহাই অন্যান্য আচার্য্যগণ অপেক্ষা মধুসূদনের কৃতিত্ব ও বিশেষত্ব। এক কথায় বলিতে গেলে, এই অদ্বৈতসিদ্ধি মদমত্ত-বিপক্ষ-করিনিকরের মত-কুম্ভবিদারক দৃপ্তকেশরী, বিবুধগণের উপভোগ্য পারিজাতকুসুম, জ্ঞানিগণের ব্রহ্মানন্দসুধার মহাহ্রদ, অজ্ঞান অন্ধকারের নবোদিতভাস্কর, সংসারানল-দগ্ধ মানবগণের বিমল-মন্দাকিনী-সলিলধারা, সাধনশ্রান্ত পথিকের শান্তিদায়ক মৃদু মলয়-সমীরণ, যোগীর ধ্যানতরঙ্গের প্রশান্তমহাসাগর, ত্রিতাপ-নিদাঘতপ্ত, জ্ঞান-সলিলপিপাসু মানবগণের সুগভীর তড়াগ, দুর্গম-শাস্ত্রাটবীসঞ্চরণশীল পণ্ডিত-কেশরিগণের নিভৃতকন্দর, মায়া-মৃগীর অচ্ছেদ্য বাগুড়া, বিচারকুশল মনীষিগণের সম্মোহনবাণ, অদ্বৈত-সাম্রাজ্যের অবিনশ্বর বিজয়স্তম্ভ। অজ্ঞানজরাগ্রস্ত মানবগণের সঞ্জীবন-রসায়ন, মুমুক্ষুগণের অমৃতময় রসালফল। ভবসাগর পারের একমাত্র তরণি। ইহার মনোহারিণী শক্তিতে মানব মন আকৃষ্ট, সম্মোহনী শক্তিতে মুগ্ধ, আনন্দদায়িনী শক্তিতে আনন্দময় হইয়া থাকে।

অদ্বৈতসিদ্ধির বিশেষত্ব।

মধুসূদন সরস্বতী অসাধারণ প্রতিভা লইয়াই জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি গুরুর আদেশে বা শিষ্যের অনুরোধে বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। মধুসূদন, এত গ্রন্থ না লিখিলেও, একমাত্র অদ্বৈতসিদ্ধির দ্বারাই জগতে পণ্ডিতগণের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারিতেন। এই অদ্বৈতসিদ্ধিগ্রন্থে প্রতিপক্ষ দ্বৈতবাদিগণের অতীত, বর্ত্তমান এবং সম্ভাবনীয় ভবিষ্যৎ আপত্তিসমূহ যেমন নিরাকৃত হইয়াছে, তেমন অদ্বৈতবাদিগণেরও অতীত বর্ত্তমান, ও সম্ভাবনীয় ভবিষ্যৎ আপত্তির সিদ্ধান্ত সমূহও প্রদর্শিত হইয়াছে। এই একখানি মাত্র গ্রন্থ পাঠে অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে যাবতীয় সিদ্ধান্ত অবগত হওয়া যায়। ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে, জিগীষা বা উপহাস পূর্ব্বক কোন বিরুদ্ধমত ইহাতে নিরাকৃত হয় নাই। স্বমতের সিদ্ধান্ত দ্বারাই যাবতীয় বিরুদ্ধ মতবাদ নিরস্ত হইয়াছে। ইনি কোন বিরুদ্ধ মতবাদের উপর কোনপ্রকার কটাক্ষপাত করেন নাই। অপূর্ব্ব কৌশলে শ্রুতি, যুক্তি, এবং সমাধিসিদ্ধ অনুভবের দ্বারা যে সকল সিদ্ধান্ত ইহাতে উপন্যস্ত হইয়াছে, প্রবলবাদিগণ ও তাহার নিরাসে অসমর্থ হইয়া, নিজমতের ন্যূনতা ও ভবিষ্যৎ বিলোপাশঙ্কায় দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বস্তুতঃ, পক্ষপাতশূন্য প্রকৃত সত্যসিদ্ধান্ত যে জগতে সকলের মস্তক অবনত করিতে পারে, অদ্বৈতসিদ্ধিই তাহার চরম নিদর্শন।

অদ্বৈতসিদ্ধি প্রশান্তমহাসাগরের ন্যায় স্থির, ধীর, গম্ভীর। ইহাতে প্রবঞ্চনা নাই, কপটতা নাই, তৃষ্ণাতুরের তৃষ্ণা নিবারণে কার্পণ্য নাই, উদ্বেল তরঙ্গমালা নাই। ইহা উদারতাপূর্ণ। অদ্বৈতামৃতবর্ষিণী অদ্বৈতসিদ্ধি বেদকল্পতরুর পূর্ণাবয়ব অপূর্ব্ব রসময় ফল। মহামনীষী, উদার গ্রন্থকার এই সুস্বাদু, তাপনাশক অমৃতময় ফল জগৎকে বিতরণ করিয়াছেন। সংসারশল্য যাঁহার হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়াছে, ধনতৃষ্ণায় যাঁহার কণ্ঠ শুষ্ক হইয়াছে, কামরূপ সারমেয়ের দংশনে যাঁহারা উন্মত্ত হইয়াছেন, কামিনী সেবায় যাঁহারা

ক্ষীণদেহ, হৃতবল ও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াছেন, দারিদ্র্যাসুরের নিপীড়নে যাঁহাদের তালু শোষ হইয়াছে, অভিমান চোর যাঁহাদের জ্ঞানরত্ন চুরি করিয়া নিয়াছে, তাঁহারা অবিলম্বে শ্রুতিসাগর মন্থনোদ্ধৃত মহাযোগীর আবিষ্কৃত এই মহৌষধ অদ্বৈতসিদ্ধি রসায়ন পান করুন। অনাদিকাল হইতে দ্বৈতবাদিগণের যাবতীয় যুক্তিতর্ক, অনাদিকাল হইতে অদ্বৈতবাদিগণের যাবতীয় মতবাদ ইহাতে একাধারে বর্ত্তমান। ইহার পরে, ইহার অনুকূল বা প্রতিকূল যে সকল গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে, তাহা কেবল এই অদ্বৈতসিদ্ধির অংশবিশেষ, টীকা, টীপ্পনী বা তাহার খণ্ডন মণ্ডন লইয়া।

যদিও ঔপনিষদ্ সম্প্রদায় দ্বারা অদ্বৈতসিদ্ধির উপযোগিতা সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইয়াছে, তথাপি কালপ্রভাবে কলির মাহাত্ম্যে দুর্ব্বল ও অনধিকারী, শাস্ত্রার্থ-নির্ণয়ে বিরুদ্ধমত দ্বারা ভ্রান্ত ও সংশয়াকুল কুতার্কিকগণকে উপদেশ দিবার জন্য ন্যায়ের সূক্ষ্মতা লইয়া যুক্তিসহকারে পরিস্ফুটভাষায় সেই উপনিষত্তত্ত্বই এই গ্রন্থে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সুতরাং, সাহসপূর্ব্বক বলা যাইতে পারে যে, এই গ্রন্থ অদ্বৈততত্ত্বের রত্নাকর, উপনিষৎ-কল্পপাদপের সুরভিতকুসুম, চিদাকাশের শান্ত, শীতল, বিমলজ্যোতিঃ, সুধাকর, জ্ঞানদরিদ্রের চিন্তামণি, বিপক্ষ-মত-তিমিরের প্রচণ্ড মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড, বেদান্তসাম্রাজ্যের সম্রাট্, অজ্ঞান-কদলী-কাননের নিশিত অসি, প্রতিবাদি পরাজয়ের গাণ্ডীব, আত্মপ্রতিষ্ঠার অভ্যুন্নত সৌধ ও জ্ঞানভাস্করের উদয়গিরি। বেদ-সিন্ধু মন্থন করিয়া এই অক্ষীণজ্যোতিঃ অদ্বৈতসিদ্ধি—মহামণি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থের তুলনা নাই। গগণের উপমা গগণই, সাগরের উপমাও সাগরই, অদ্বৈতসিদ্ধির উপমাও অদ্বৈতসিদ্ধি। ইহার পরবর্ত্তী অনুকূল ও প্রতিকূল মত সকল ইহারই ব্যাখ্যা, ইহারই টীকা, ইহারই তাৎপর্য্য লইয়া, এবং ইহারই অংশবিশেষের পূর্ব্বপক্ষ বা উত্তরপক্ষ লইয়া পরিপুষ্ট।

গুরুমারা বিদ্যা ও মধুসূদনের উদারতা।

১। মধুসূদনের অদ্বৈতসিদ্ধি প্রকাশিত হইলে, বিপক্ষগণের মস্তক অবনত হইল। পর্ব্বত-পক্ষচ্ছেদী পুরন্দরের ন্যায় মধুসূদন কর্ত্তৃক অত্যুন্নত, বিষম, কঠিন নিজপক্ষ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন দেখিয়া বিপক্ষগণের সকল অভিমান চূর্ণ হইল, তাহাদের প্রত্যুত্তরদানে আর সামর্থ্য রহিল না। ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় তাঁহারা অধঃপতিত হইলেন। ব্যাসাচার্য্যের ন্যায়ামৃতরূপ ব্রহ্মাস্ত্র ব্যর্থ হইল। তাঁহারা মনে করিলেন, এবার অদ্বৈতবাদের প্রবলতরঙ্গে মাধ্ব ও অন্যান্য দ্বৈতবাদিগণের মত সকল তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যাইবে, এবং চিরকালের জন্য কালসাগরে বিলয় প্রাপ্ত হইবে।

অতি ভীষণ কূটতার্কিক পণ্ডিত ধুরন্ধর ব্যাসাচার্য্য অনেক চিন্তা করিয়া নিজ সম্প্রদায়ের রক্ষার মানসে একটী অপূর্ব্ব কৌশল উদ্ভাবন করিলেন। তিনি, ন্যায় মীমাংসাদি নানাশাস্ত্রে প্রগাঢ় পণ্ডিত, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, প্রিয়শিষ্য ব্যাসরামকে ডাকিয়া নিজের সমুদায় মনোবেদনা জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, বৎস! মধুসূদনের অদ্বৈতসিদ্ধি-সাগরের প্রবলবন্যায় আমাদের মতবাদ সকল তৃণরাশির ন্যায় ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে, অতএব তুমি আমার আদেশে মধুসূদনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া অদ্বৈতসিদ্ধির তাৎপর্য্য ও তাহার আপত্তি এবং সমাধানগুলি বিশেষরূপে আয়ত্ত করিয়া আইস, যেন গ্রন্থের চ, বা, তু, হি ও বাদ না পড়ে। আর, অদ্বৈতবাদিগণের এই সমাধানের উপর দ্বৈতবাদিগণ কিরূপ যুক্তিতর্কের দ্বারা আত্মরক্ষা করিতে পারেন, তাহাও তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া আসিও। বর্ত্তমান ভারতে মধুসূদন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও উদারহৃদয়, তাঁহার নিকট দ্বৈতবাদিগণের ইহার পরে কি বক্তব্য আছে, ইহা জিজ্ঞাসা করিলে অবশ্যই তিনি তাহার উত্তর দিবেন। সমুদায় কথাই লিখিয়া আনিও। সাবধান! এই রহস্য যেন ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ না পায়, তাহা হইলে আমাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে। অদ্বৈতমত ভালরূপ শিক্ষা করিয়া, তোমাকেই ঐ মত খণ্ডন করতঃ

অদ্বৈতসিদ্ধির প্রকৃত প্রত্যুত্তর দিতে হইবে। এ বিষয়ে তোমার মত যোগ্যতম শিষ্য আমার আর কেহই নাই। তুমি অবশ্যই জান, ভূধারণ-শক্তি অবগত হইয়াই ভগবান্ নারায়ণ অনন্তদেবকে নিজের দেহ ধারণ করিবার জন্য আদেশ দিয়াছিলেন। তাই, তোমার প্রতি এই গুরুভার অর্পিত হইল। আর দেখ, অদ্বৈতসিদ্ধির ন্যায় দুরূহ গ্রন্থের আলোচনা করিয়া, তাহার নিখিল তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম পূর্ব্বক প্রতিবাদ করা আমার এ বৃদ্ধ বয়সে কখনও সম্ভবপর নহে। অতএব তুমি এ বিষয়ে ঔদাসীন্য করিলে, এই সম্প্রদায় রক্ষার আর উপায়ান্তর নাই।

গুরুর অনুপেক্ষণীয় আদেশকে সারথি করিয়া, সর্ব্বসিদ্ধি বিধায়ক ও সর্ব্ববিঘ্ন বিনাশক গুরুদেবের অমোঘ পাদরজঃ মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক মহামতি ব্যাসরাম অদ্বৈতসিদ্ধি অধ্যয়নের জন্য সুদূর কর্ণাট দেশ হইতে কাশী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যথাসময়ে কাশীতে উপস্থিত হইয়া, সৌম্য-মূর্ত্তি মধুসূদনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। অদ্বৈতসিদ্ধির প্রতি অক্ষর বিশেষ-রূপে আলোচনা ও হৃদয়ঙ্গম করিয়া, দ্বৈতবাদিগণ ইহার বিরুদ্ধে কি কি উপায় অবলম্বন করিতে পারেন, তাহার উপদেশ ও ঐসঙ্গে মধুসূদনের নিকট হইতে আহরণ করিয়া অতিগোপনে "ন্যায়ামৃততরঙ্গিণী" নামে অদ্বৈতসিদ্ধির যুক্তি সমূহের নিরাস মূলক ব্যাসাচার্য্য প্রণীত অদ্বৈতবাদ বিরোধী ব্রহ্মাস্ত্র-স্বরূপ ন্যায়ামৃতের একখানি টীকা লিখিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ টীকার দুইখানি পুস্তক লিখিলেন। এই চাতুর্য্য বহুদিন গোপন থাকিল না। বুদ্ধিমান্ মধুসূদন অল্পদিনের মধ্যেই বিপক্ষের মনোভাব বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু উপদেশে একটুকও কৃপণতা করিলেন না। এইরূপ উদারচেতা কয়জন মহাপুরুষ দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা নিজের নিধনকারী ব্রহ্মাস্ত্রের সন্ধান শত্রুর নিকট অসঙ্কুচিত চিত্তে প্রকাশ করিতে দ্বিধাবোধ না করেন। এদিকে ব্যাসরামের অদ্বৈতসিদ্ধি পড়া শেষ হইল। উপদিষ্ট যাবতীয় যুক্তি তর্কের সাহায্যে দুইভাগে "তরঙ্গিণী"

টীকা লেখাও সমাপ্ত হইল। তখন তিনি গুরুর নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক "তরঙ্গিণী" টীকার একখানি মধুসূদনকে গুরু দক্ষিণাস্বরূপ প্রদান করিলেন। মধুসূদন ঐ টীকাখানি পাইয়া হাসিয়া বলিলেন, আমি ইহা পূর্ব্বেই বুঝিয়াছি। যাহা হউক, তুমি আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া কৃতবিদ্য হইয়াছ, ইহাতেই আমার আনন্দ। তুমি আমার শিষ্য, সুতরাং, এই প্রতিবাদের উত্তর দেওয়া আমার সঙ্গত নহে। তবে কালক্রমে আমার কোন শিষ্য ইহার উত্তর দান করিবে, এই বলিয়া তাহাকে বিদায় দিলেন।

মহামতি ব্যাসরাম নিজগুরু ব্যাসাচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইয়া অপর টীকাখানি প্রদান করিয়া নমস্কার করিলেন। শিষ্যকে কৃতকার্য্য দেখিয়া গুরুদেব অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। বস্তুতঃ, যাহারা যোগ্য হইয়াও ভবিষ্যতে কার্য্য সম্পাদন করিবে, তাহাদের অপেক্ষা যিনি কার্য্যসম্পাদন করিয়াছেন, তিনিই প্রভুর নিকট প্রশংসাভাজন হইয়া থাকেন। এখানে এইটুক বিশেষ প্রণিধান যোগ্য যে, বিপক্ষের অসদভিপ্রায় অবগত হইয়াও গৃহস্থিত নিজের সংহারক ব্রহ্মাস্ত্রের সন্ধান দিয়া কোন্ মহানুভব ব্যক্তি মধুসূদনের ন্যায় মহত্ব দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন ?

যাহা হউক, ব্যাসরামের "তরঙ্গিণী" টীকা রচিত হইবার পরে ব্যাসাচার্য্যের অপর শিষ্য শ্রীনিবাস নামক মহাধুরন্ধর এক পণ্ডিত অদ্বৈত-সিদ্ধির খণ্ডনাত্মক ন্যায়ামৃত গ্রন্থের "প্রকাশ" নামে একখানি টীকা রচনা করেন। বস্তুতঃ, এই দুই খানি টীকায় একদিকে যেমন ন্যায়ামৃতের বহুল প্রচারের সুবিধা হইল, তেমন অপরদিকে অদ্বৈতসিদ্ধির প্রচারেও বিশেষ বাধা পড়িল।

এই সময়ে মধুসূদনের প্রিয়শিষ্য বলভদ্র, উক্ত দুইখানি টীকার সম্যক্ আলোচনা করিয়া "সিদ্ধি ব্যাখ্যাতে" উক্ত টীকাদ্বয়কৃত সমুদয় আপত্তির খণ্ডন করিলেন। পরে, মধুসূদনের প্রশিষ্য স্থানীয় ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী "লঘুচন্দ্রিকা" ও শিবরামবর্ণী "বৃহচ্চন্দ্রিকা" নামক অদ্বৈতসিদ্ধির টীকাদ্বয়

রচনা করিয়া "তরঙ্গিণী" ও "প্রকাশ" টীকার আপত্তিসকল সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন করিলেন।

ইহার পরেও মাধ্বমতালম্বী বনমালী মিশ্র এবং রাজানুজ মতাবলম্বী মহীশূর অনন্তাচার্য্য "ন্যায়ামৃতসৌগন্ধ" (বনমালা) এবং "ন্যায়ভাস্কর" রচনা করিয়া অদ্বৈতসিদ্ধির "চন্দ্রিকা" খণ্ডন করেন। ইহার পরেও বিট্‌ঠলেশ উপাধ্যায় লঘুচন্দ্রিকার উপর বিট্‌ঠলেশী নামক এক টীকা রচনা করিয়া, এবং রাজু শাস্ত্রী "ন্যায়েন্দু-শেখর" নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া, আর রামসুব্বা-শাস্ত্রী ও পঞ্চাবগেশ শাস্ত্রী "ন্যায়ভাস্করখণ্ডন" নামক গ্রন্থদ্বয় লিখিয়া উক্ত মতদ্বয়ের সম্পূর্ণ চেষ্টাই ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং, দেখা যাইতেছে যে, এখনও অদ্বৈতবাদের অনুকূলে বা প্রতিকূলে যে সকল গ্রন্থ নির্ম্মিত হইতেছে, তাহার মূল প্রস্রবণ অদ্বৈতসিদ্ধি ও তাহার ব্যাখ্যাগ্রন্থ সমূহ। অদ্বৈতসিদ্ধির বিরুদ্ধে আজ পর্য্যন্তও আলোচনা চলিতেছে, তাহাতেই বুঝা যায়, আজ পর্য্যন্তও কোন মহাপুরুষ এইমত খণ্ডন করিতে গিয়া সফলতা লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। ইহাই অদ্বৈতসিদ্ধির বৈশিষ্ট্য এবং ইহাই তাহার মহত্ত্বের পরিচায়ক। এই গ্রন্থের প্রামাণ্য বা প্রাধান্য স্থাপনের জন্য আর কোন যুক্তি, তর্ক বা প্রমাণের অপেক্ষা করে না। যে গ্রন্থ দীর্ঘকাল যাবৎ অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় পক্ষেরই আলোচ্য, সেই গ্রন্থের উৎকর্ষ সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়া অনভিজ্ঞতারই পরিচায়ক এবং একতর পক্ষপাতিতারূপ দুরাগ্রহের ফলভিন্ন আর কি হইতে পারে?

২। প্রবাদ আছে যে, ব্যাসরামের ন্যায় পণ্ডিতাগ্রগণ্য জীবগোস্বামীও মধুসূদনের নিকট অদ্বৈতবাদ শিক্ষা করিয়া, পরে সেই মত খণ্ডন করেন। ভারতবর্ষের এই টুকই বৈশিষ্ট্য যে, ভারতীয় পণ্ডিতগণ নিজমতের প্রতিকূল-বাদীও বিদ্যার্থী হইলে, তাহার প্রতি বিদ্যাদানে কৃপণতা করেন না। মধুসূদনের এই বিদ্যাদান পদ্ধতিতে তাঁহার গ্রন্থের উৎকর্ষ এবং নিজের মহত্ত্ব অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। কারণ, নিজ মতের দুর্ব্বলতা থাকিলে,

হৃদয়ের ও দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হয়। ইহাতে মধুসূদনের হৃদয়ের দৃঢ়তা, স্বসিদ্ধান্তে ঐকান্তিকী শ্রদ্ধা, বিপক্ষের নিকট স্বমত ব্যক্ত করিতে নির্ভীকতা, মহতী উদারতা ও অসাধারণী প্রতিভার পরিচয় স্বতঃই ব্যক্ত হইয়াছে।

অন্যান্য আচার্য্যগণের সহিত মধুসূদনের বৈশিষ্ট্য।

দ্বৈত বা অদ্বৈতবাদের আচার্য্যগণের সহিত মধুসূদনের বিশেষ বৈলক্ষণ্য আছে; প্রায় সকল আচার্য্যই স্বমত সংস্থাপনের জন্য পরমত খণ্ডনে বিশেষ প্রয়াস করিয়াছেন। তাঁহাদের গ্রন্থ দেখিলে মনে হয়, হিংসা, দ্বেষ ও ক্রোধবশে পরমত নিরাকরণই যেন তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু যথার্থ তত্ত্বের উদ্‌ঘাটন নহে। মধুসূদনের বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি স্বমতের দৃঢ় সিদ্ধান্ত দ্বারা পরমতের আক্রমণ নিবারণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যদি পরমত নিরাকরণই তাঁহার উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে, তিনি প্রসঙ্গক্রমেও তন্ন তন্ন করিয়া পরমত খণ্ডনের অনেক সুযোগ প্রাপ্ত হইতেন। কিন্তু, হিংসাদ্বেষশূন্যতা ও নির্বৈরভাব, মধুসূদনের উজ্জ্বল চরিত্রকে আরও উজ্জ্বল করিয়াছে। মধুসূদন যশোলাভের বাসনায় বা পাণ্ডিত্য প্রকাশের জন্য গ্রন্থরচনা করেন নাই। তিনি বিনীতভাবে বলিয়াছেন—

"স্বজ্ঞানশুদ্ধ্যৈ কৃতম্" ।

অর্থাৎ—নিজের জ্ঞানশুদ্ধির নিমিত্ত গীতার টীকা রচিত হইয়াছে। তাঁহার যে যশোলিপ্সা ছিল না, তাহা অদ্বৈতসিদ্ধির শেষের লেখাদ্বারাই বেশ বুঝা যায়। যথা—

গ্রন্থস্যৈতস্য যঃ কর্ত্তা স্তূয়তাং বা স নিন্দ্যতাং।
ময়ি নাস্ত্যেব কর্ত্তৃত্বমনন্যানুভবাত্মনি ॥

অর্থাৎ—এই গ্রন্থ যিনি রচনা করিয়াছেন,তিনি প্রশংসনীয়ই হউন, আর নিন্দনীয়ই হউন, তাহাতে আমার কিছু আসে যায় না। কারণ, আত্মাতিরিক্ত পদার্থানুভব বিরহিত আমাতে কর্ত্তৃত্বই নাই।

তিনি অন্যান্য আচার্য্যগণের মত দিগ্‌বিজয়ে বহির্গত হন নাই, বা কোন বাদবিচারে প্রবৃত্ত হইয়া বাদিবিজয়েরও কল্পনা করেন নাই। তাঁহার লিখিত গ্রন্থ সমূহ,নিজের জ্ঞানশুদ্ধির জন্য,গুরুর আদেশ প্রতিপালনের জন্য, এবং মন্দধী শিষ্যগণের উপকারের জন্য। কিন্তু,যশোবাসনা বা পরমত খণ্ডনের জন্য জিগীষামূলক নহে। রামানুজাদি সম্প্রদায় যেমন নিয়তই অন্য সম্প্রদায়কে দ্বেষ করেন, নির্বৈরভাব মধুসূদন তেমন নহেন। কিন্তু তিনি সকল সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ বর্জিত। অনেক আচার্য্যই তাঁহার এই মহত্বলাভের অধিকারী হইতে পারেন নাই। তিনি গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ের টীকার শেষে লিখিয়াছেন—

'শৈবাঃ সৌরাশ্চ গাণেশা বৈষ্ণবাঃ শক্তিপূজকাঃ।
ভবন্তি যন্ময়াঃ সর্ব্বে সোঽহমস্মি পরঃ শিবঃ" ॥

অর্থাৎ—শৈব, সৌর, গাণপত্য, বৈষ্ণব ও শাক্তগণ যন্ময় হইয়া থাকেন, আমি সেই পরম শিবস্বরূপ। ইহাদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তাঁহার একত্ব-জ্ঞানের সংস্কার যেরূপ দৃঢ়তর হইয়াছিল, অন্য কোন আচার্য্যই সেইরূপ অভেদস্বরূপের উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের হৃদয় হিংসাদ্বেষে নিরন্তর মলিন থাকায়, তাঁহারা মধুসূদনের জ্ঞানোৎকর্ষের সন্ধান লইতে সমর্থ হন নাই।

বিদ্যা ও জ্ঞানের চরমোৎকর্ষপ্রাপ্ত মধুসূদনের বহু শিষ্য ছিল, কিন্তু কালসাগরের ভীষণ আবর্ত্তনে তাহাদের নাম মুছিয়া গিয়াছে। তাহাদের কৃত কোন গ্রন্থেরও সন্ধান পাওয়া যায় না। কেবল, বলভদ্র, শেষগোবিন্দ ও পুরুষোত্তম সরস্বতীর নাম অনুসন্ধানে পাওয়া গিয়াছে।

বলভদ্র—ইনি সেবক ব্রহ্মচারিরূপে মধুসূদনের নিকট বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন। ইঁহারই জন্য মধুসূদন ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের "নির্ব্বাণ দশকের" উপর "সিদ্ধান্তবিন্দু" নামক টীকা লিখিয়াছিলেন। বলভদ্রও নিজগুরুর অদ্বৈতসিদ্ধির উপর "সিদ্ধিব্যাখ্যা" রচনা করিয়া ব্যাসাচার্য্যশিষ্য ব্যাসরামকৃত "ন্যায়ামৃত তরঙ্গিণী" ও শ্রীনিবাসকৃত "ন্যায়ামৃত প্রকাশ" নামক টীকাদ্বয়ের প্রবল আক্রমণ হইতে অদ্বৈতসিদ্ধিকে রক্ষা করেন। ইনি "অদ্বৈতসিদ্ধি সংগ্রহ" নামক আর একখানি উপাদেয় গ্রন্থও রচনা করেন।

শেষগোবিন্দ—ইনি ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের "সর্ব্বসিদ্ধান্ত সংগ্রহের" উপর একখানি টীকা রচনা করেন। এই গ্রন্থে ইনি মধুসূদনকে গুরু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইঁহার পিতার নাম শেষপণ্ডিত, অপর নাম কৃষ্ণপণ্ডিত। ইনি বৈয়াকরণকেশরী ভট্টোজী দীক্ষিতের গুরু, মহারাষ্ট্রদেশীয় ব্রাহ্মণ। ইনি মধুসূদনকে সরস্বতীর অবতারজ্ঞানে পূজা করিতেন, এবং অতিশয় ভক্তি করিতেন।

পুরুষোত্তম সরস্বতী—ইনি মধুসূদনের "সিদ্ধান্তবিন্দুর" উপর একখানি টীকা রচনা করেন। তাহাতে তিনি গুরুরূপে মধুসূদনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইঁহাদের শিষ্য প্রশিষ্য ক্রমে মধুসূদনের বিপুল সম্প্রদায় ভারতবর্ষে অদ্বৈত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

মধুসূদনের গ্রন্থাবলী।

১। অদ্বৈতসিদ্ধি।
২। গীতার টীকা।
৩। গীতানিবন্ধ।
৪। ভগবদ্ভক্তিরসায়ন।
৫। ভক্তিসামান্য নিরূপণ।
৬। বেদান্তকল্পলতিকা।
৭। সিদ্ধান্তবিন্দু।
৮। মহিম্নস্তোত্র টীকা। (হরি ও হরপক্ষে)।
৯। প্রস্থানভেদ।

১০। সংক্ষেপ শারীরকব্যাখ্যা-সারসংগ্রহ	১৭। কৃষ্ণকুতূহল নাটক।
	১৮। আত্মবোধ টীকা।
১১। আনন্দ মন্দাকিনী।	১৯। যজুর্ব্বেদ ভাষ্য
১২। অদ্বৈতরত্নরক্ষণ।	২০। জটাদাষ্টবিকৃতি বিবৃতি।
১৩। হরিলীলা বিবেক।	২১। সর্ব্ববিদ্যাসিদ্ধান্ত বর্ণন।
১৪। ভাগবত টীকা (অসম্পূর্ণ)	২২। সিদ্ধান্তলেশ টীকা।
১৫। শাণ্ডিল্যসূত্র টীকা	২৩। রাজ্ঞ প্রতিবোধ।
১৬। রাসপঞ্চাধ্যায়।	২৪। বেদস্তুতি টীকা।

ইহাদিগের মধ্যে ২০ সংখ্যা হইতে ২৪ সংখ্যা পর্য্যন্ত গ্রন্থ সকল মধুসূদনের কৃত কিনা, সে বিষয়ে অনেকেরই সন্দেহ আছে। এই সকল গ্রন্থের পৌর্ব্বাপর্য্য নিশ্চয় করা এখন আর সম্ভবপর নহে। ইহাদের মধ্যে গীতার টীকা রচনা ভগবান্ বিশ্বেশ্বর সরস্বতীর আদেশে, পরীক্ষা প্রদানের জন্য। অদ্বৈতসিদ্ধির রচনা "ন্যায়ামৃত" গ্রন্থের প্রতিবাদের জন্য, সিদ্ধান্তবিন্দুর রচনা—বলভদ্রনামক ব্রহ্মচারি-বালকের অনুরোধে। অদ্বৈতরত্নরক্ষণ, শঙ্করমিশ্রের ভেদরত্ননামক গ্রন্থের প্রতিবাদরূপে লিখিত হইয়াছিল। প্রায় প্রত্যেক গ্রন্থেই প্রত্যেক গ্রন্থের কথা আছে। সুতরাং, মনে হয়, মধুসূদন যেন যোগসিদ্ধির প্রভাবে এক সময়ে অনেক দেহ ধারণ করিয়া এই সকল গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থের রচনাভঙ্গী দেখিলে মনে হয়, ভগবদবতার ভিন্ন এরূপ গাম্ভীর্য্য ও যুক্তিপূর্ণ সরস লেখা কোন মনুষ্যের পক্ষে সম্ভাবিত নহে।

মধুসূদনের যোগৈশ্বর্য্য।

জগদ্বরেণ্য, দার্শনিক পণ্ডিত, পরমভক্ত, মহাজ্ঞানী মধুসূদনের অসাধারণী প্রতিভা, সরলতা, উদারতা, ত্যাগশীলতা, নিরভিমানিতা, লোকানুরাগ, নির্বৈরভাব ও পাণ্ডিত্যের খ্যাতি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃতি লাভ করিল। গুরু-

শুশ্রূষা ও গুরুভক্তিতে তিনি শিষ্যগণের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া পরম জ্ঞানী গুরুদেবকেও আকৃষ্ট করিলেন। কর্ত্তব্যনির্ণয়ে মধুস্থদন, শাস্ত্রচর্চ্চায় মধুস্থদন, যোগানুশীলনে মধুস্থদন, সর্ব্বত্রই মধুস্থদন, সর্ব্বপ্রথমেই মধুস্থদন তাঁহার শিষ্যরূপে, মন্ত্রিরূপে, সখিরূপে গুপ্তরহস্য প্রকাশে নির্জ্জননিকতনের মধুস্থদনই তাহার স্মৃতিপথে উদিত হইত। এজন্য অন্যান্য শিষ্যগণ মধুস্থদনের প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত হইলেন। ধূমায়িত বিদ্বেষ-বহ্নি ক্রমে ক্রমে আত্মপ্রকাশ করিল। তাঁহারা সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করিলেন। একদিন তাঁহারা মিলিত হইয়া স্পষ্টভাবেই গুরুদেবকে বলিলেন, গুরুদেব! আমরা সকলেই ত আপনার শিষ্য, কিন্তু আমাদের অপেক্ষা মধুস্থদনের প্রতি আপনার এত অধিক স্নেহ ও অনুরাগ কেন? আপনি পিতৃস্থানীয়, আপনার সকল সন্তানের প্রতিই সমান দৃষ্টি রাখা উচিত।

গুরুদেব বহুপূর্ব্বেই শিষ্যগণের মানসিকভাব অবগত হইয়াছিলেন, এখন তাহা ব্যক্ত দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। পরে, তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বৎসগণ! তোমরা যাহা বলিয়াছ, তাহা সত্য বটে, কিন্তু মধুস্থদনের অপরিচ্ছিন্ন গুণরাশি আমাকে বাধ্য করিয়াছে। শিষ্যের সম্পূর্ণ যোগ্যতাই গুরুকে বাধ্য করিবার অমোঘ অস্ত্র। গুরুদেব শিষ্যগণকে এইরূপ অনেক উপদেশ দিয়া বিরত হইলেন। কিন্তু, তাহাদের মলিন চিত্তক্ষেত্রে এই উপদেশ বীজ অঙ্কুরিত হইল না।

যমুনাতীরে মধুস্থদন।

গুরুদেব মনে করিলেন, মধুস্থদনের যোগ্যতা দেখাইয়া ইহাদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তিনি শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে দেশপর্য্যটনে বহির্গত হইলেন, এবং নানা তীর্থস্থান, নদ, নদী, গ্রাম, নগর ও অরণ্য অতিক্রম করিয়া যমুনাতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেইখানে কয়েকদিন বিশ্রাম করিয়া, তিনি মধুস্থদনকে



যমুনানদীতীরে সম্রাট্ আকবর ও তাঁহার মহিষী কর্ত্তৃক মধুসূদনের পূজা।

চিত্রশিল্পী—শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য ব্যাকরণতীর্থ।

২৭১পৃঃ

বলিলেন, মধুসূদন ! তুমি কয়েকদিন এইখানে থাক, আমরা ফিরিবার সময় তোমাকে লইয়া যাইব। মধুসূদন, গুরুর আদেশ মাল্যের ন্যায় শিরে ধারণ করিলেন। গুরুদেব তাহার গন্তব্যস্থানে চলিয়া গেলেন। মধুসূদন সেই নির্জ্জন, হিংস্রজন্তুসমাকুল যমুনাতীরে অবস্থিত রহিলেন। মনে মনে কত ভাবের উদয় হইল, পক্ষিগণের মধুর কূজন, হিংস্রজন্তুগণের ভীষণ গর্জ্জন, শ্যামায়মান অরণ্যরাজির বিচিত্র শোভা, যমুনার অপূর্ব্ব তরঙ্গলীলা, তাহার হৃদয়ে ভগবানের অলৌকিক সৃষ্টিবৈচিত্র্যের চিত্রপট অঙ্কিত করিয়া দিল।

দ্বন্দ্বসহিষ্ণু, ক্ষুধাতৃষ্ণা বর্জিত, নির্বৈর, যোগসিদ্ধ মধুসূদন ভগবদ্ভাবে বিভোর হইয়া সেই যমুনাতীরেই সমাধিমগ্ন হইলেন। ক্রমে দিনের পরে দিন, রাত্রির পরে রাত্রি, মাসের পরে মাস কাটিয়া গেল, গুরুদেব এখন পর্য্যন্ত ও ফিরিলেন না। কিন্তু তিনি সমাধি অবস্থায়ই অবস্থিত রহিলেন। এদিকে তটস্থিত বালুকারাশি যমুনার প্রবল তরঙ্গে সঞ্চালিত হইয়া মধুসূদনের বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত আবৃত করিল।

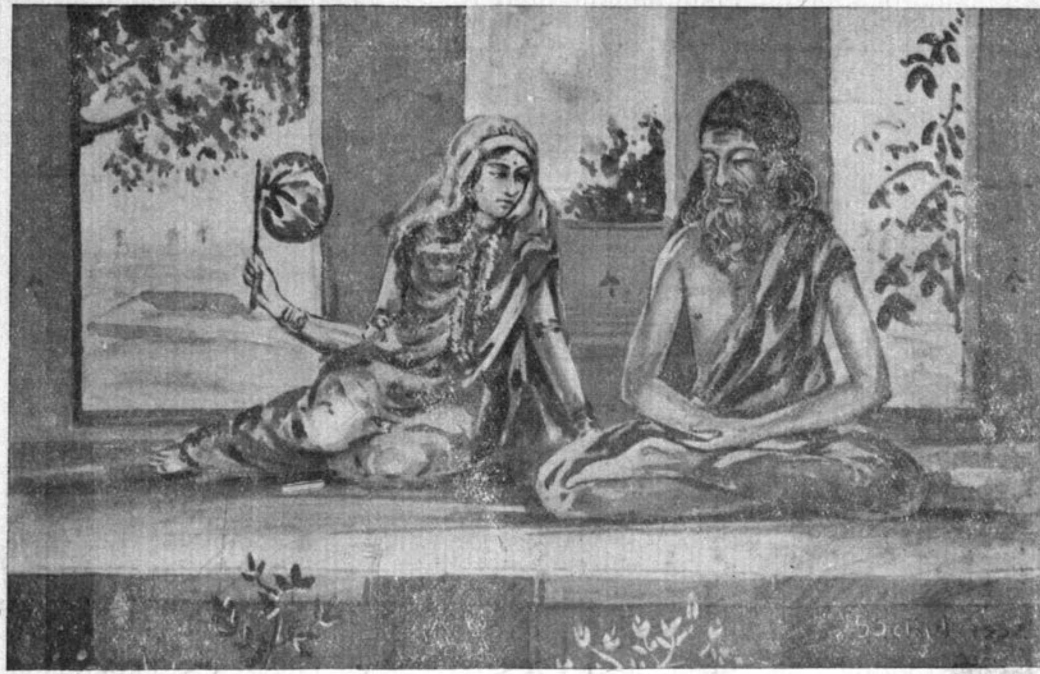
সম্রাট্ আকবর মহিষীর স্বপ্নাদেশ।

এদিকে সম্রাট্ আকবর বাদসাহ দিল্লীর লোভনীয় রত্নসিংহাসনে অধিষ্ঠিত। তিনি মনুষ্যদুর্লভ যাবতীয় সুখসৌভাগ্য সম্পন্ন হইয়াও পারিবারিক অশান্তিতে কালযাপন করিতেছিলেন। তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী বহুদিন যাবৎ শূলরোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। কোনরূপ চিকিৎসায়ই তিনি ঐ দুর্জ্জয় রোগের যাতনা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন নাই। সম্রাট্ বহু পুরস্কার ঘোষণা করিলেন, বহু প্রবীণ চিকিৎসকের আগমন হইল, কিন্তু কিছুই ফলোদয় হইল না। সম্রাট্, মহিষীর জীবনে হতাশ হইলেন, তাঁহার মুখ মলিন হইল, রাজকার্য্যে মনোযোগ হ্রাসপ্রাপ্ত হইল, উৎসাহশক্তি কমিয়া গেল, কেবল ভাবেন, কি উপায়ে এই হৃদয় সর্ব্বস্ব

প্রিয়তম রমণীরত্নকে রক্ষা করিবেন। রাজমহিষীও রোগের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পরদিনেই বিষভক্ষণে প্রাণ পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিলেন।

দৈবের কি বিচিত্রলীলা! কি অলৌকিক ও অচিন্তনীয় শক্তি! তাহা সাধারণ মানবের হৃদয়ঙ্গম হয় না। সেই দিনই রাজমহিষী নিশিশেষে স্বপ্ন দেখিলেন —এক তেজঃপুঞ্জ কলেবর ব্রাহ্মণ দূর হইতে বাহু উত্তোলন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে, "রাজমহিষি! প্রাণ পরিত্যাগ করিও না, আত্মহত্যা মহাপাপ! আত্মঘাতীর ইহলোক পরলোক উভয়ই নষ্ট হয়,তাহার আর গতি নাই। ছি,ছি, তুমি রাজমহিষী হইয়া এইরূপ ঘৃণিত পাপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছ? তুমি কত পুণ্যবলে এই অনুপম সৌন্দর্য্য, অতুল ঐশ্বর্য্য এবং কমনীয় দেহ লাভ করিয়া, এই নূতন বয়সে অফুরন্ত ভোগের উপভোগ না করিয়া, কেন এই অমূল্য দেহ বিসর্জ্জন করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছ? তোমার কি এজন্য দুঃখ হয় না? তুমি নিখিল মানবের শাসনের অধিকারিণী হইয়া নিজকে শাসন করিতে পারিতেছ না, ইহাতে কি তোমার লজ্জা হয় না? সাধু মধুসূদনের সেবা কর, অচিরেই রোগমুক্ত হইবে" এই বলিয়া সেই তেজোময় পুরুষ তেজোরাশিতে মিলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। রাজমহিষীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল, প্রাণপরিত্যাগ বাসনা তিরোহিত হইল। তিনি ভগবানের অপার করুণার কথা মনে করিয়া আনন্দবারি বিসর্জ্জন করিতে করিতে অবশিষ্ট রাত্রি অতিক্রম করিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইল। সম্রাটের নিকট রাজমহিষীর স্বপ্নবৃত্তান্ত চরমুখে প্রেরিত হইল। সম্রাট্ বিস্মিত হইয়া দৈবকৃপায় ভোগের অবসান মনে করিয়া, মন্ত্রিবর্গের সহিত কর্ত্তব্যবিষয়ের আলোচনা পূর্ব্বক সাধুর অন্বেষণে চতুর্দ্দিকে চর প্রেরণ করিবার আদেশ দিলেন। চরগণ দেশদেশান্তর পরিভ্রমণ করিয়াও সাধুর অনুসন্ধান করিতে না পারায় বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিল। সম্রাট্ এই সংবাদ পাইয়া অতিশয় বিষণ্ণ



মরুভূমিতে ৺মধুসূদনের প্রতি ৺গঙ্গাদেবীর কৃপা।

২৭৭পৃঃ

চিত্রশিল্পী— শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য ব্যাকরণতীর্থ।

হইলেন। পরে নিজেই সাধুর অনুসন্ধানে বহির্গত হইবার সঙ্কল্প করিয়া শুভদিনে অল্প পরিমিত সৈন্য, পরিমিত পরিজন, কয়েক জন বিশিষ্ট রাজকর্ম্মচারী ও কতিপয় নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ সঙ্গে লইয়া, মহিষীসমভিব্যাহারে দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইলেন, এবং নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে যমুনা-কূলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনভ্যস্ত পথ-পর্য্যটনক্লান্ত, ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর, বিফল-মনোরথ, সুতরাং নিতান্ত বিষাদগ্রস্ত সম্রাট্ সেইখানেই শিবির সন্নিবেশ করিয়া, কর্ম্মচারীবর্গকে আহারের বন্দোবস্ত করিতে আদেশ দিলেন। মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত, প্রচণ্ড সূর্য্য-কিরণ যেন অগ্নিকণা বর্ষণ করিতেছে। তখন পর্য্যন্ত দম্পতি জলগ্রহণও করেন নাই। পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। অনুচরবর্গ এই নিদারুণ নিদাঘ-সন্তাপ দূর করিবার জন্য ক্রমে ক্রমে বিমল-সলিলা-স্রোতস্বিনী যমুনার শীতল জলে অবগাহন করিবার জন্য গমন করিতে লাগিলেন। দৈবক্রমে সমাধিমগ্ন তেজোময় মধুসূদন-মূর্ত্তি তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইল। তিনি জীবিত কি মৃত, কেহ স্থির করিতে পারিলেন না। ক্রমে এই সংবাদ সম্রাটের কর্ণে পৌঁছিল। সম্রাট্ ব্যগ্রতার সহিত ঐ মূর্ত্তি স্পর্শ করিতে নিষেধ করিলেন। তিনি জানিতেন, হিন্দুদের মধ্যে অনেক সাধু মৃত্তিকাস্তূপের মধ্যেও সমাধিমগ্ন অবস্থায় অবস্থিত থাকেন। ম্লেচ্ছ-স্পৃষ্ট হইলে, হয়ত তাঁহাদের ক্রোধবহ্নি উদ্দীপ্ত হইয়া বিপরীত ফলও জন্মাইতে পারে। তিনি ভক্তি-নম্র-হৃদয়ে বিশুদ্ধ বেশে রাজমহিষীর সহিত সাধু-সন্দর্শনে বহির্গত হইলেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন, বালুকারাশি দ্বারা অর্দ্ধ দেহ আচ্ছাদিত, এক তেজোময় সৌম্য মূর্ত্তি। তাঁহার অপূর্ব্ব তেজোরাশি চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। বালুকাস্তূপের মধ্যেও তাঁহার দেহ অক্ষতাবস্থায় বর্ত্তমান দেখিয়া, তিনি যে জীবিত এবং সমাধিমগ্ন সে বিষয়ে সম্রাটের কোন সন্দেহই উপস্থিত হইল না। তিনি মনে করিলেন, অন্যত্র যাওয়ার প্রয়োজন নাই, ইনিই সমাধিমগ্ন সাধু মধুসূদন হইবেন।

ইঁহারই অর্চ্চনা করা যাউক, ভাগ্য প্রসন্ন হইলে ইঁহার অর্চ্চনায়ই আমাদের অভিলষিত ফল লাভ হইবে। এই মনে করিয়া তিনি মধুসূদনের আবরক-বালুকারাশি অপসারণ করিবার জন্য নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণগণকে আদেশ করিলেন। সম্রাটের আদেশে ব্রাহ্মণগণ বালুকাবরণ অপসারণ করিয়া, বদ্ধপদ্মাসনোপবিষ্ট এক তেজোময় দিব্য মূর্ত্তি দর্শন করিলেন। মূর্ত্তির চৈতন্য নাই, তথাপি অক্ষতভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। সম্রাট্ মহিষীর সহিত সেই নিস্পন্দ সৌম্য মূর্ত্তি দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন।

সম্রাটের আদেশে অনুচরবর্গ পূজোপকরণ সংগ্রহের জন্য চতুর্দ্দিকে প্রেরিত হইল। যিনি ভাগ্যবান্, ভারতের দণ্ডবিধাতা, তাঁহার কোথাও কোন বস্তুর অভাব হয় না। অল্প কালের মধ্যেই পূজার সামগ্রীসকল সমাহৃত হইল। বিশুদ্ধ বৈদিক ব্রাহ্মণগণ মধুসূদন মন্ত্রে নির্ম্মল ও শীতল যমুনাসলিলে নানাবিধ গন্ধদ্রব্য মিশ্রিত করিয়া মধুসূদনকে স্নান করাইয়া বিবিধোপচারে তাঁহার পূজা সম্পন্ন করিলেন। পরমরমণীয় বহু-মূল্য মাল্য বনমালার ন্যায় মধুসূদনের গলদেশে শোভা পাইতে লাগিল। নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্যে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইল। বিবিধপ্রকার অত্যুত্তম ফল, মূল ও নৈবেদ্যসম্ভারে সেই স্থান পরিপূর্ণ হইল। সুবর্ণ ও রজত পাত্রে নৈবেদ্য সকল স্থাপন করিয়া মধুসূদনের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হইল। রাজদম্পতি প্রণাম করিয়া প্রচুর সুবর্ণ মুদ্রা দ্বারা মধুসূদনের কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত আবৃত করিলেন। পরে কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে ভক্তিপূর্ব্বক অবনতমস্তকে নমস্কার করিয়া মধুসূদনের চরণামৃত পান করিলেন। রাজমহিষীর দেহে বল আসিল, তাঁহার শরীরে যেন একটী অপূর্ব্ব তেজঃ প্রবেশ করিয়া তাঁহার রোগজীর্ণ দেহকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিল। দম্পতি মধুসূদনের নৈবেদ্য প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। মহিষী নিরাময় হইলেন, সম্রাটের আর আনন্দের সীমা রহিল না। ঐ স্থানে কর্ম্মচারিবর্গকে মধুসূদনের জন্য

একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিবার আদেশ দিয়া বিবিধ উৎসব ও ধনাদি বিতরণ করিতে করিতে তাঁহারা দিল্লী নগরীতে উপস্থিত হইলেন।

প্রিয় পাঠক! এই বৃত্তান্তে আপনারা কি দেখিতে পাইলেন? এক জন নিঃস্ব, পর্ণকুটীরবাসী, ভোগৈশ্বর্য্য বিরক্ত ব্রাহ্মণের নিকট ভারত-সম্রাট্ আজ কৃপা-প্রার্থী, কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান। যাঁহার প্রবল প্রতাপে শত্রুগণ অবনতমস্তক, যাঁহার নিকট হইতে একগাছি তৃণও কেহ বলপূর্ব্বক লইতে সাহসী হয় না, সেই হিন্দু-বিদ্বেষী মুসলমানগণের মুকুটমণি আকবরের মুকুট-মধ্যমণি ব্রাহ্মণের চরণাঙ্গুলি রঞ্জিত করিতেছে, কোটি কোটি সুবর্ণ মুদ্রা দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু নির্লোভ, ত্যাগশীল ব্রাহ্মণের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। সহস্র চেষ্টায়ও যাঁহার দর্শন লাভ অসম্ভব, আজ সেই মহাপ্রভাব-সম্পন্ন নরপতি কাতরভাবে ভিক্ষুকের বেশে অপরাধীর ন্যায় দণ্ডায়মান! আমরা মহর্ষি বশিষ্ঠের পর্ণ-কুটীরে সূর্য্যবংশ তিলক মহারাজ দিলীপকে এই বেশে দেখিয়াছিলাম। ব্রাহ্মণ! শাস্ত্রজ্ঞ হও, ত্যাগী হও, নিষ্ঠাবান্ হও, নির্লোভ হও, পৃথিবীর সকল জাতি তোমার পূজা করিবে, তুমি সকলের মিত্র ও শ্রদ্ধেয় হইবে।

এদিকে গুরুদেবও যোগবলে সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইলেন, তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে, শিষ্যদিগের শিক্ষার সময় উপস্থিত হইয়াছে মনে করিয়া, তিনি শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কয়েকদিন পথ পর্য্যটনের পর যমুনাতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যেখানে মধুসূদন ছিলেন, তাহার কিয়দ্দূরে অবস্থান করিয়া শিষ্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বৎসগণ! এই যমুনাতীরেই মধুসূদনকে রাখিয়া গিয়াছিলাম, বলিয়াছিলাম, ফিরিবার সময় তাহাকে লইয়া যাইব। অতএব তোমরা একবার অনুসন্ধান কর, সে কোথায় কি ভাবে অবস্থান করিতেছে। শিষ্যগণ মধুসূদনের অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। অল্প দূরে

গিয়াই একটী বিচিত্র প্রাসাদ দর্শন করিলেন। তাঁহারা মনে করিলেন, বোধ হয় কোন পুণ্যবান্ ধনী ব্যক্তি এই পবিত্রসলিলা যমুনার তীরে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছে। যাহা হউক, বোধ হয়, ঐখানে গেলেই মধুসূদনের খবর পাইব, এই মনে ভাবিয়া তাঁহারা ঐ প্রাসাদের নিকটবর্ত্তী হইলেন, কিন্তু সেখানে কোন লোকের অবস্থান সূচক কোন চিহ্নই দর্শন করিলেন না। ক্রমে বাহির দিক পরিভ্রমণ করিয়া মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক, প্রস্তরের নির্ম্মিত দেবমূর্ত্তির ন্যায় একটী মূর্ত্তি দর্শন করিলেন।

তাঁহারা ক্রমে অগ্রসর হইয়া বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিতে পারিলেন, এই ত আমাদের মধুসূদন! তাঁহারা মধুসূদনের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। দেখিলেন, চতুর্দ্দিকে বহু মূল্যবান্ দ্রব্যসম্ভার সাজান রহিয়াছে, কণ্ঠে বহুমূল্য মাল্য দোলায়মান, আকণ্ঠ সুবর্ণমুদ্রায় আবৃত। তাঁহারা অবিলম্বে গুরুর নিকটে মধুসূদনের এই অবস্থার কথা বর্ণনা করিলেন। গুরুদেব তাঁহাদের বাক্যে সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া মধুসূদনের অবস্থা দর্শনে অত্যন্ত প্রীত হইলেন। মনে করিলেন, এখন বোধ হয় অন্যান্য শিষ্যগণের হিংসাদ্বেষ তিরোহিত হইবে। শিষ্যগণ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, গুরুদেব! এই গভীর অরণ্যে নির্জ্জন যমুনা-তীরে মধুসূদনের এই অপার ঐশ্বর্য্য কোথা হইতে আসিল? গুরুদেব ঈষৎ হাস্য করিয়া সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। পরে যৌগিক সঙ্কেত অনুসারে মধুসূদনের চৈতন্য সম্পাদন করিয়া মধুসূদনকে বলিলেন, বৎস! আমি ফিরিয়া আসিয়াছি, এখন আশ্রমে চল। মধুসূদনের ধ্যান ভঙ্গ হইল, তিনি গুরুদেবকে সম্মুখে দর্শন করিয়া ব্যস্ততার সহিত ভক্তি-পূর্ব্বক নমস্কার করিলেন এবং বাসোপযোগী নূতন অট্টালিকা ও বিচিত্র বহু মূল্য দ্রব্যসম্ভার ও বহু সুবর্ণ মুদ্রা দর্শন করিয়া স্বপ্নের ন্যায় মনে করিলেন। যাহা হউক, গুরুদেব শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে আশ্রমাভি-

মুখে গমন করিলেন, বহুমূল্য বিচিত্র দ্রব্যসমূহ ও ধনরাশি যমুনাতীরেই পড়িয়া রহিল, কেহ তাহার কপর্দ্দকও গ্রহণ করিলেন না।

মরুভূমিতে মধুসূদন।

শিষ্যগণ গুরুর সহিত আশ্রমে গমন করিলেন। মধুসূদনের প্রতি বিদ্বিষ্ট শিষ্যগণ, মধুসূদনের ঐশ্বর্য্য দর্শনে তাঁহার প্রতি হিংসা-দ্বেষ ত্যাগ করা দূরে থাকুক, বরং আরও অতিশয় সন্তপ্ত হইলেন, প্রজ্বলিত বহ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় তাঁহাদের বিদ্বেষ-বহ্নি ক্রমেই বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল। গুরুদেব এবারেও তাঁহাদের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন। মনে করিলেন, মধুসূদনের যোগ্যতা দেখাইয়াই শিষ্যগণের হিংসা-দ্বেষ বিদূরিত করিতে হইবে। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া, তীর্থভ্রমণোপলক্ষে পুনরায় দেশ ভ্রমণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। আবার শিষ্যগণ সমভি-ব্যাহারে নানা নদ-নদী, বন, উপবন, গ্রাম ও নগর অতিক্রম করিয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত গমন করিলেন। কয়েক দিন পর্য্যটনের পর, একটী বিশাল মরুভূমির নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার চতুর্দ্দিকে কোন গাছপালা বা জলাশয় নাই, কেবল উত্তপ্ত বালুকারাশি ধূ ধূ করিতেছে। এই নিরাশ্রয়, মানব ও পশু-পক্ষী শূন্য মৃত্যুর অব্যর্থ সাধন-স্বরূপ উত্তপ্ত বালুকারাশির মধ্যে মধুসূদনকে রাখিয়া গুরুদেব বলিলেন, মধুসূদন! তুমি এই স্থানে থাক, আমরা ফিরিবার সময় তোমাকে লইয়া যাইব।

মধুসূদন "তথাস্তু" বলিয়া গুরুর আদেশ শিরোধার্য্য করিলেন। গুরুদেব শিষ্যগণ সহ তথা হইতে অন্যত্র চলিয়া গেলেন। সেই অগ্নিকণার ন্যায় উত্তপ্ত বালুকারাশি, মস্তকোপরি মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের অগ্নিকণ-বর্ষী প্রচণ্ড কিরণমালা, শীতোষ্ণ-দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণু যোগসিদ্ধ মধুসূদনের কোনরূপে ক্লেশ জন্মাইতে সমর্থ হইল না। প্রত্যুত, তিনি বহ্নি পরিশুদ্ধ সুবর্ণের ন্যায় তেজঃ-প্রভায় প্রদীপ্ত ও অধিকতর সমুজ্জ্বল হইলেন। যাহা হউক, তিনি এই দুঃসহ বালুকারাশিপূর্ণ মরুভূমির মধ্যেই যোগাসন করিয়া সমাধিমগ্ন

হইলেন। এই ভাবে অনেকদিন কাটিয়া গেল। হঠাৎ কি কারণে জানি না, তাঁহার সমাধি-ভঙ্গ হইল। চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেখিলেন, তিনি এক সুরম্য অট্টালিকায় অবস্থান করিতেছেন, নিকটে একটী পরমা-সুন্দরী দৈব-জ্যোতিঃ-সম্পন্না অনবদ্যাঙ্গী রমণী তাঁহাকে পাখাদ্বারা বীজন করিতেছেন, নানাবিধ সুশীতল পানীয় জল, নানাবিধ ফল-মূল, তাঁহার আহারের জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। ছায়া-প্রধান পাদপ সকল চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া আশ্রম পাদপের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে, নিকটে কুমুদ, কহ্লার, ও নানাবিধ জলচর পক্ষিগণে পরিশোভিত বিমল সরোবরের বিহঙ্গকুলের মধুর কূজন, সেই মরুভূমিকেও তপোবনে পরিণত করিয়াছে। মধুসূদন ভাবিলেন, এ কোথায় আসিলাম, গুরুদেব ত আমাকে মরুভূমির মধ্যে রাখিয়া গিয়াছেন, তবে এ কি স্বপ্ন! কিছুক্ষণ এইরূপ চিন্তা করিলেন পরে জনমানব শূন্য স্থানে রমণীয় রমণীমূর্ত্তিই তাঁহার পরম বিস্ময় উৎপাদন করিল। মধুসূদন বলিলেন, মা! তুমি কে? এই নির্জ্জন স্থানে তুমি একাকিনী কোথা হইতে আসিয়াছ? মা! আমার বড়ই কৌতূহল জন্মিয়াছে, তুমি দয়া করিয়া আমার কৌতূহল নিবৃত্তি কর। রমণী বলিলেন, বৎস! তোমার গুরুদেব শিষ্য-শিক্ষার জন্য তোমার প্রতি যে নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে আমি বড়ই সন্তপ্ত হইয়াছি। সন্তানের ক্লেশ কি মাতা কখনও সহ্য করিতে পারে? আমি তোমার পুত্রবৎসলা জননী, তুমি মধুমতী নদী পার হইবার জন্য আমারই উপাসনা করিয়াছিলে, আমি কলি-কলুষনাশিনী গঙ্গা দেবী। বৎস! তোমার অসীম ক্লেশ দর্শন করিয়া আমি সুস্থ থাকিতে পারি নাই। তোমার শ্রান্তি দূর করিবার জন্য এই বিমল পানীয় জল, এই ফল-মূল ও এই বৃহৎ অট্টালিকা আমি মায়া-বলে সৃজন করিয়াছি। আমি তোমাকে যে বর প্রদান করিয়াছিলাম, তাহা এখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। তোমার যাহা প্রাপ্য তাহা পাইয়াছ। এখন আর তোমার কোন বস্তুই

অভিলষণীয় নাই। মধুসূদন বলিলেন, মা! তোমার এ অকৃতী সন্তানের প্রতি অসীম দয়া, তোমার কৃপায় সামান্য নদী মধুমতী পার হইয়াছি। এখন এই দুস্তর ভবনদী পারের ব্যবস্থা কর! আমার এখন আর ক্ষুধা পিপাসা নাই, আমি তোমার ভক্তিরসামৃত পান করিয়া নিত্য তৃপ্ত হইয়াছি, আমার আর ভোজনের স্পৃহা নাই। দেবী বলিলেন, বৎস! সন্তানের অজীর্ণ বা উদর স্ফীত হইলেও মাতা তাহার আহারের জন্ত ব্যস্ত হইয়া থাকেন। তুমি আপ্তকাম, নিত্যতৃপ্ত হইলেও আমার অনুরোধে কিছু আহার কর, তাহা হইলে আমি বড়ই তৃপ্তিলাভ করিব। মধুসূদন বলিলেন, মা! তোমার আদেশ অলঙ্ঘনীয়, তবে আমার প্রার্থনাও পূর্ণ করিতে হইবে। আমি তোমার প্রসাদ ভক্ষণ করিব। দেবী ঈষৎ হাসিয়া তাহাই করিলেন। মধুসূদনও প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। দেবী বলিলেন, বৎস! তোমার যখন যে কোন প্রয়োজন হইবে আমাকে স্মরণ করিও, আমি তোমার সকল কামনা পূর্ণ করিব। মধুসূদন তাঁহাকে ভক্তিপূর্ব্বক নমস্কার করিলেন, দেবীও অচির-প্রভার ন্যায় অন্তর্হিত হইলেন। মধুসূদন আবার সমাধিস্থ হইলেন।

এদিকে গুরুদেব যোগবলে সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া শিষ্যগণকে বলিলেন, বহুদিন অতীত হইয়াছে, মধুসূদনকে নিরাশ্রয়ভাবে মরুভূমির মধ্যে রাখিয়া আসিয়াছি, সে যেন কতই ক্লেশ ভোগ করিতেছে, হয় ত অসহনীয় উত্তপ্ত বালুকারাশির মধ্যে তাহার প্রাণও বিপন্ন হইতে পারে। অতএব চল, একবার আশ্রমে গমন করি। এই বলিয়া তিনি সেই স্থান হইতে বহির্গত হইয়া কয়েক দিন পথ পর্য্যটনের পরে সেই মরুভূমির নিকটবর্ত্তী হইলেন। তখন শিষ্যগণকে বলিলেন, মধুসূদন কোথায় আছে, তাহার অনুসন্ধান কর। শিষ্যগণ গুরুর আদেশে সেই অলঙ্ঘনীয় দুস্তর মরু-ভূমির মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে একখানি সুরম্য অট্টালিকা দেখিতে

পাইলেন এবং প্রকাণ্ড ছায়া-বৃক্ষ তাঁহাদের দৃষ্টি গোচর হইল। তাঁহারা মনে করিলেন, এখানে মনুষ্যের বাসোপযোগী স্থান দেখা যাইতেছে, হয় ত কোন ধনী ব্যক্তি বিশেষ কারণে এখানে বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। যাহা হউক, এখানে গেলেই বোধ হয় মধুসূদনের সন্ধান পাইব। এই ভাবিয়া ক্রমে তাঁহারা অগ্রসর হইতে লাগিলেন, সুগন্ধি কুসুমের গন্ধবাহী মৃদু সমীরণ তাঁহাদের শ্রান্তি দূর করিল। ক্রমে আরও অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, কুমুদ কহ্লার পরিশোভিত, জলচর পক্ষিগণের কলধ্বনিতে মুখরিত. ফলবান্ পাদপসমূহে পরিবেষ্টিত, একটী প্রকাণ্ড বিমল শীতল জলাশয়। তাঁহারা ইহা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। শীতল সলিল পান করিয়া শ্রান্তি দূর করিলেন এবং কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া অট্টালিকার অভিমুখে গমন করিলেন। গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, এখানে যেন মহোৎসবে একটী দেবপূজা হইয়া গিয়াছে। নানাবিধ পূজোপহারে গৃহখানি পরিপূর্ণ, সুগন্ধি দ্রব্যে আমোদিত, সুগন্ধ শীতল পানীয় জল সুবর্ণময় পাত্রে নিহিত রহিয়াছে,সুবর্ণদণ্ড চামর তাঁহাকে ব্যজন করিবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। এই অগণিত ঐশ্বর্য্য রাশির মধ্যে নিস্পৃহ মধুসূদন ধ্যানস্তিমিত লোচন হইয়া বদ্ধপদ্মাসনে যোগ-নিদ্রায় মগ্ন। বোধ হইল যেন তাহার কঠোর সাধনায় ভীত দেবরাজের আদেশে দেবরমণীগণ মধুসূদনের সেবার জন্য নিযুক্ত রহিয়াছেন। মধুসূদনের এইরূপ অলৌকিক শক্তিদর্শন করিয়া শিষ্যগণ বিস্মিত হইলেন, তাঁহাদের মোহ নিদ্রা কাটিয়া গেল, নিশিত-জ্ঞানাসি তাঁহাদের অবিবেকতরুকে সমূলে ছিন্ন করিল। বিবেক সমীরণের প্রবল বেগে পাপ-মেঘ অদৃশ্য হইল, জ্ঞান-সূর্য্যের নবোদিত বিমল কিরণে মোহান্ধকার ঘুচিয়া গেল, তাঁহারা এতদিনে নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। যাহা হউক, অবিলম্বে গুরুদেবের নিকট মধুসূদনের বার্ত্তা প্রেরিত হইল। গুরুদেব মধুসূদনের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহার যোগৈশ্বর্য্য দর্শনে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। পরে

যৌগিক সঙ্কেতানুসারে মধুসূদনের চৈতন্য সম্পাদন করিয়া তাঁহাকে স্নেহভরে দৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন। মধুসূদনও গুরুদেবকে ভক্তিপূর্ব্বক নমস্কার করিলেন। শিষ্যগণ লজ্জিত হইলেন। তাঁহারা গুরুর নিকটে নিজেদের ত্রুটী স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। মধুসূদনের নিকটও নিজেদের অজ্ঞজনোচিত আচরণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিলেন। তদবধি শিষ্যগণ সকলেই মধুসূদনকে গুরুর ন্যায় মান্য করিতেন। গুরুদেবের এইরূপ ব্যবহারে আমরা একটী নূতন উপদেশ পাইয়াছি। যে সকল শিষ্য গুরুর উপদেশ পাইয়াও অন্যায় আচরণ করে, চিত্তের মালিন্য দূর করিতে পারে না, সরলতা, উদারতা নির্বৈরভাব হৃদয়ে জাগরুক হয় না, সেই সকল শিষ্যকে কেবল দৃষ্টান্ত দ্বারা, মহতের অনুষ্ঠেয় কার্য্যের দ্বারা, অত্যুচ্চ আদর্শের দ্বারা শিক্ষাদান করিতে হয়। নচেৎ কেবল উপদেশের দ্বারা অনাদিকাল-সঞ্চিত অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হয় না। মধুসূদনের সম্বন্ধে এইরূপ বহু কিংবদন্তী যোগি-সমাজে প্রসিদ্ধ আছে।

মধুসূদনের যোগৈশ্বর্য্য সম্বন্ধে আরও অনেক প্রবাদ আছে। তন্মধ্যে এই কয়েকটী বিশেষ প্রসিদ্ধ।

১। মধুসূদন কাশীতে দণ্ডগ্রহণ করিয়া পুরীধামের নিকটবর্ত্তী সমুদ্র-তীরে গভীর অরণ্যে ১৭ বৎসর পর্য্যন্ত কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। তিনি যখন তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করেন, তখন উৎকল দেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। তদানীন্তন উৎকলাধিপতি মুকুন্দদেব মধুসূদনের অলৌকিক তপোবলের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার অনুসন্ধানের জন্য শ্রীক্ষেত্রে আগমন করেন। গহন অরণ্যে বিচরণ করিতে করিতে তিনি একটী কৃষ্ণকায় পুরুষ দর্শন করিলেন। দেখিলেন, উইর মাটীর দ্বারা তাঁহার স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত নিমগ্ন। তিনি যোগাসনে সমাধিযুক্ত ও বাহ্য-জ্ঞান-শূন্য। বৃষ্টির জল নয়নের উপর নিপতিত হইয়া বাহুযুগলে পতিত হইতেছে। বিহঙ্গমেরা নিঃশঙ্কচিত্তে ঐ জল পান করিয়া তৃষ্ণা-নিবারণ

করিতেছে। সেই তেজোময় মূর্ত্তি দর্শন করিয়া রাজা বিস্মিত হইলেন। তিনি উৎকণ্ঠিত-চিত্তে রাত্রির অবস্থা দর্শন করিবার জন্ম অতি নিভৃতভাবে অনতিদূরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ক্রমে কিরণমালী দিবাকর অস্তাচলশিখরে আরোহণ করিলেন। সন্ধ্যা হইল। তখন যোগীবরের দেহ হইতে কোটি সূর্য্যের ন্যায় প্রভাপটল চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতে লাগিল। তাঁহার শিরোদেশ যেন আকাশমার্গ স্পর্শ করিল। ক্রমে নারদ, তুম্বুরু প্রভৃতি ও কিন্নর-কিন্নরীগণ যোগিবরের স্তুতি-গানে প্রবৃত্ত হইলেন। স্বয়ং ব্রহ্মাও স্তুতি-গানে প্রবৃত্ত হইয়া সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তোমরা যোগিবরের অত্যাশ্চর্য্য তপোবল দর্শন কর। অণিমাদি সিদ্ধি সকল ইঁহার করায়ত্ত। ইনি নির্ব্বাসন, নিখিল কর্ম্ম-রাশিকে বিনষ্ট করিয়াছেন, ইঁহার হৃদয়-গ্রন্থি ছিন্ন হইয়াছে, সকল সংশয় দূরীভূত হইয়াছে, ইনি যথার্থই তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হইয়াছেন। অতএব ইঁহাকে দেয় আর কিছুই নাই। মহারাজ মুকুন্দদেব এই সকল কৌতুকাবহ কথা শ্রবণ করিয়া ধীরে ধীরে সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেবগণ তাহা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ বিমান-যানে স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। তখন রাজা মুকুন্দদেব মধুসূদনকে ভক্তিপূর্ব্বক নমস্কার করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন। মধুসূদনের সমাধি ভঙ্গ হইল। তিনি সম্মুখে মুকুন্দদেবকে দর্শন করিয়া তাঁহার মনোভাব অবগত হইয়া বলিলেন, তুমি যাও, শীঘ্রই দেশের দুর্ভিক্ষ প্রশমিত হইবে, কিন্তু, অচিরেই এদেশ যবনের করতল-গত হইবে। আমি আর এখানে থাকিব না। বারাণসীধামে চলিয়া যাইব। এই বলিয়া তিনি গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিলেন, এবং নিজে সমুদ্র জলে স্নান করিয়া পুরুষোত্তমাদি দর্শনপূর্ব্বক, বিশ্বনাথকে একাগ্র মনে চিন্তা করতঃ জল, স্থল ও অরণ্যের ভিতর দিয়া দণ্ডবৎ নমস্কার করিতে করিতে বারাণসীধামে গমন করিলেন।

২। বীরসিংহ নামে একজন সুপ্রসিদ্ধ রাজা অপুত্রক ছিলেন। তিনি অনেক দৈবকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াও পুত্রলাভ করিতে না পারায় বিষণ্নমনে কালযাপন করিতে লাগিলেন। একদিন স্বপ্নে আদেশ হইল, "যতি মধুসূদনের সেবা কর।" তিনি মধুসূদনের অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়া এক নদীর তীরে মৃত্তিকাস্তূপের দ্বারা আবৃত, ধ্যানস্থ মধুসূদনকে দেখিয়া যথাশক্তি অর্চ্চনা করতঃ সেই স্থানে একটী মন্দির নির্ম্মাণপূর্ব্বক মধুসূদনের সেবা শুশ্রূষার জন্য কয়েক জন ভৃত্য নিযুক্ত করিলেন। তিন বৎসর পরে তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইল। সকলে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। রাজা বীরসিংহও মধুসূদনের অর্চ্চনার ফলে পুত্র-রত্ন লাভ করিয়াছিলেন।

৩। প্রবাদ আছে যে দ্বারভাঙ্গার অধিপতি মধুসূদনের বিদ্যাবত্তার পরীক্ষার জন্য একবার হাত চালান দিয়াছিলেন, তাহাতে লিখিত হইল—

"মধুসূদন সরস্বত্যাঃ পারং বেত্তি সরস্বতী।
পারং বেত্তি সরস্বত্যা মধুসূদন সরস্বতী॥"

মধুসূদনের উপাসনা ও উপাস্য।

মধুসূদনের হৃদয়ে জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব্ব সমন্বয় সংঘটিত হইয়াছিল। ইহারা উভয়ে ভাই ও ভগিনীর ন্যায় পরস্পর অবিরুদ্ধভাবে মধুসূদনের অঙ্কগত হইয়াছিল। বস্তুতঃ, মধুসূদনের ন্যায় দার্শনিক ভক্ত ও জ্ঞানী লোক আচার্য্যগণের মধ্যে বিরল। তিনি প্রারব্ধ সংস্কার-বশে, লোক-শিক্ষার্থ অথবা জ্ঞানের পরিপাকের জন্য নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন। সর্ব্ব-কর্ম্ম-ত্যাগী, মন্দ-বুদ্ধি সন্ন্যাসীগণকে উপদেশ দেওয়াই তাঁহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। তিনি জানিতেন

"জ্ঞানিনাঽজ্ঞানিনা বাপি যাবদ্দেহস্য ধারণম্।
তাবদ্বর্ণাশ্রমপ্রোক্তং কর্ত্তব্যং কর্ম্ম মুক্তয়ে"॥

অর্থাৎ—জ্ঞানীই হউক, অথবা অজ্ঞানীই হউক, যে পর্য্যন্ত দেহ ধারণ করিবে, সেই পর্য্যন্তই মুক্তির জন্য বর্ণাশ্রম বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। তিনি আরও জানিতেন যে, ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন—

"ন কর্ম্মাণি ত্যজেদ্ যোগী কর্ম্মভিস্ত্যজ্যতেহ্যসৌ।
কর্ম্মণো মূলভূতস্য সঙ্কল্পস্যৈব নাশতঃ" ॥

অর্থাৎ—যোগী কর্ম্ম ত্যাগ করেন না, কিন্তু কর্ম্মই যোগীকে ত্যাগ করে। যে হেতু কর্ম্মের মূলভূত যে সঙ্কল্প, তাহা তাহার নাশ হইয়া যায়। বিক্ষেপ নিবারণের জন্য, জ্ঞানের পরিপাকের জন্য অবশ্যই উপাসনার প্রয়োজন হয়।

মধুসূদনের ভক্তি অতি প্রবলা ছিল। তিনি মৃদু, মধ্য ও অধিমাত্রভেদে ভক্তিকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

মৃদু ভক্তের ভাব যথা—

"সত্যপি ভেদাপগমে নাথ! তবাহং ন মামকীনস্ত্বং।
সামুদ্রোহি তরঙ্গঃ কচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ ॥"

অর্থাৎ—হে নাথ! ভেদ অপগত হইলেও তোমারই আমি, কিন্তু তুমি আমার নহ, সমুদ্রই তরঙ্গময় হয়, তরঙ্গ কখনও সমুদ্রময় হয় না। এ স্থলে আমি তোমার এই ভাবই স্পষ্ট।

মধ্যম ভক্তের ভাব যথা—

"হস্তমুৎক্ষিপ্য জাতোহসি বলাৎ কৃষ্ণ! কিমদ্ভুতং।
হৃদয়াদ্ যদি নির্য্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে ॥"

অর্থাৎ—হে কৃষ্ণ! তুমি হাত ছাড়াইয়া চলিয়া গেলে, ইহা আর কি আশ্চর্য্য? যদি হৃদয় হইতে যাইতে পার, তবে তোমার পুরুষকার আছে বলিয়া স্বীকার করিতে পারি। এস্থলে "তুমি আমার" এই ভাবই স্পষ্ট।

উত্তম ভক্তের ভাব যথা—

"সকলমিদমহঞ্চ বাসুদেবঃ পরমপুমান্ পরমেশ্বরঃ স একঃ।
ইতি মতিরচলা ভবত্যনন্তে হৃদয়গতে ব্রজ তান্ বিহায় দূরাৎ" ॥

অর্থাৎ—এই দৃশ্যমান জগৎ প্রপঞ্চ, আমি এবং সেই পরম পুরুষ বাসুদেব একই বস্তু। হৃদয়গত অনন্তে এই অচলা মতি যেন আমার হয়। এখানে আমি তুমি অভিন্ন এই ভাবই সুস্পষ্ট। মধুসূদন এই কথাগুলি গীতার ১৮ শ অধ্যায়ে ৬৬ শ্লোকের ব্যাখ্যায় আরও সুস্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। যথা—

"তস্যৈবাহং মমৈবাসৌ স এবাহমিতি ত্রিধা।
ভগবচ্ছরণত্বং স্যাৎ সাধনাভ্যাসপাকতঃ" ॥

অর্থাৎ—সাধনের অভ্যাসের পরিপাক অনুসারে প্রথম "তাঁহার আমি" দ্বিতীয় "আমার তিনি" তৃতীয় "তিনিই আমি" এই ত্রিবিধ ভগবানের শরণ হইয়া থাকে। বৈষ্ণবেরা জ্ঞান হইতে ভক্তি ও ভক্তি হইতে মুক্তি হয় এই কথা বলেন। সমুদয় দর্শনের মতে জ্ঞানই মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ, ভক্তি তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা বিশেষ। বাস্তবিক, জ্ঞানের পরিপাকের জন্য ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ভিন্ন একমাত্র মধুসূদনই পরাভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এখন আলোচ্য বিষয় এই যে, মধুসূদন কোন্ দেবতার উপাসক ছিলেন? তাঁহার নিজের উক্তিতে যাহা জানা যায়, তাহাতে বুঝা যায়, তিনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন, বিষ্ণুকেই তিনি উপাস্য দেবতা বলিয়া আরাধনা করিতেন। প্রবাদ পরম্পরায় শুনা যায়, তাঁহার একটী গোপাল বিগ্রহও ছিল, তিনি প্রতিদিন তাঁহার সেবা করিতেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন—

"যদ্‌ভক্তিং ন বিনা মুক্তি র্যঃ সেব্যঃ সর্ব্বযোগিনাম্।
তং বন্দে পরমানন্দ-মাধবং নন্দনন্দনম্" ॥

অর্থাৎ—যাঁহার ভক্তি বিনা মুক্তি হয় না, যিনি সকল যোগিগণের সেব্য, সেই নন্দনন্দন পরমানন্দময় মাধবকে বন্দনা করি। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তিনি নন্দনন্দনের উপাসক ছিলেন, এবং ভক্তি যে মুক্তির প্রযোজক, তাহা তিনি বিশেষ ভাবেই স্বীকার করিতেন তিনি আর এক স্থানে বলিয়াছেন—

"বংশী-বিভূষিত-করান্নবনীরদাভাৎ
পীতাম্বরাদরুণ-বিম্বফলাধরোষ্ঠাৎ।
পূর্ণেন্দুসুন্দর-মুখাদরবিন্দনেত্রাৎ
কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে" ॥

অর্থাৎ—যাহার হস্ত বংশীবিভূষিত, যিনি নবজলধরকান্তি, যিনি পীতাম্বর, যাঁহার অধর ও ওষ্ঠ রক্তবর্ণ বিম্বফলের ন্যায়, যাহার মুখ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সুন্দর, পদ্মের ন্যায় যাহার চক্ষু, সেই কৃষ্ণ হইতে উৎকৃষ্ট তত্ত্ব আমি কিছুই জানি না। অন্য স্থানে ও বলিয়াছেন—

"অদ্বৈত-সাম্রাজ্য-পথাধিরূঢ়াস্তৃণীকৃতাখণ্ডলবৈভবাশ্চ।
শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন দাসীকৃতা গোপবধূ বিটেন" ॥

এই শ্লোকটীর প্রথমার্দ্ধে এইরূপ পাঠও দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

"অদ্বৈতবীথী পথিকৈরুপাস্যা সাম্রাজ্যসিংহাসন-লব্ধদীক্ষা"।

অর্থাৎ—আমরা অদ্বৈত সাম্রাজ্যের পথে আরূঢ় হইয়াছি, এবং ইন্দ্রের বৈভবকেও তৃণ জ্ঞান করিয়াছি। তথাপি কোন শঠ গোপবধূ লম্পট-কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক দাসীকৃত হইয়াছি।

এই সকল আলোচনা করিলে অনায়াসেই বুঝা যায় যে, মধুসূদন বৈষ্ণব ছিলেন, এবং গোপাল বিগ্রহের সেবা করিতেন। মধুসূদনের মত

শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে এরূপ মত পরিবর্ত্তন কেন হইল, তাহা ভাবিবার বিষয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মধুসূদনের পূর্ব্বপুরুষেরা শাক্ত। সুতরাং তিনি কুলধর্ম্ম ও কুলদেবতাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেবতার উপাসনা করিবেন, ইহা কিরূপে বিশ্বাস করা যায়।

আপাততঃ দৃষ্টিতে এইরূপ কুলদেবতা পরিত্যাগ করা মহামনীষী মধুসূদনের পক্ষে বিরুদ্ধ বোধ হইলেও তাঁহার নিজের উক্তি বলিয়া পূর্ব্বোক্ত বাক্যগুলি অবিশ্বাস করা যায় না। আমরা এ বিষয়ে সাহস-পূর্ব্বক বলিতে পারি যে, মধুসূদনের এই আচরণ শাস্ত্র-বিরুদ্ধ নহে। তিনি পরম ভক্ত ছিলেন এবং অদ্বৈতবাদে তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস এবং দৃঢ়তা ছিল, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যাঁহারা শক্তি মন্ত্রে সিদ্ধ অর্থাৎ প্রকৃত শাক্ত, তাঁহারাই "বৈষ্ণবোত্তম" ইহাই শাস্ত্রের আদেশ, এবং শাক্তই "বশয়েদপি কেশবং" অর্থাৎ কেশবকে বশীভূত করিতে পারে।

যে বৈষ্ণবী মায়া জগৎকে মোহাবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে, যাহার অনির্ব্বচনীয় শক্তিতে এই জগতের বৈচিত্র্য লক্ষিত হইতেছে, যে মায়া-পাশ অখণ্ডনীয়, অভেদ্য ও অচ্ছেদ্য, যাহার আবরণশক্তি ও বিক্ষেপশক্তি অদ্বৈতজ্ঞান-সূর্য্যের প্রকাশের প্রতিবন্ধক নিবিড়-জলদাবলীর ন্যায় চিদাকাশে কর্ম্ম সমীরণের অনুকূলে অবিরাম গতিতে বিচরণ করিতেছে, সেই জগজ্জননী বিশ্ববিমোহিনী, বিচিত্র-বিলাসময়ী মহামায়াকে যিনি বশীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনি বিষ্ণুস্বরূপই হইয়াছেন তাই মধুসূদন নিজেই বলিয়াছেন—

"ত্রিকালপরমার্থতা ত্রিবিধভেদশূন্যাত্মতা।
মম শ্রুতিশতার্পিতা তদহমস্মি পূর্ণোহহরিঃ॥"

যিনি সৎ, চিৎ, আনন্দস্বরূপ, যিনি অনন্ত, অনাদি, নিখিল দৃশ্যনির্মুক্ত স্বপ্রকাশ, সেই পূর্ণ হরি আমি। পাঠক ইহাতে কি বুঝিলেন? সেই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ বিশ্বব্যাপক বিষ্ণুস্বরূপ আমি। শিব,

শান্ত, ত্রিগুণাতীত ব্রহ্মচৈতন্যই আমি। আমি শক্তিরূপিণী মায়াকে বশীভূত করিয়াছি, আমি মায়া বিনির্মুক্ত স্বপ্রকাশ চৈতন্য। কেহ বলেন, মধুসূদন অদ্বৈতসিদ্ধির প্রণেতা হইলেও বাস্তবিক দ্বৈতবাদী ছিলেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন—

"দ্বৈতং মোহায় বোধাৎ প্রাক্ জাতে বোধে মনীষয়া।
ভক্ত্যর্থং কল্পিতং দ্বৈতমদ্বৈতাদপি সুন্দরম্॥"

অর্থাৎ—জ্ঞানের পূর্ব্বে দ্বৈতভাব মোহের নিমিত্ত হয়। আর জ্ঞান জন্মিলে, মনীষা দ্বারা দ্বৈতভাব ভক্তির নিমিত্ত কল্পিত হয়। এই দ্বৈতভাব অদ্বৈত হইতে ও সুন্দর।

এই উক্তি দ্বারা তিনি যে দ্বৈতবাদী ছিলেন, ইহা প্রতিপন্ন হয় না। কারণ, অদ্বৈতের সৌন্দর্য্য পরমানন্দস্বরূপ, তাহা অবিনাশী, অদৃশ্য, অজ্ঞেয় ও অনির্ব্বচনীয়। দ্বৈতের সৌন্দর্য্য দৃশ্যস্বরূপে, ইহা আপাততঃ মনোহর, পরিণাম বিরস। দৃশ্যমাত্রই মিথ্যা, দৃশ্যের চাকচিক্যও মিথ্যা। তথাপি বহির্দৃষ্টিতে জগতের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ও রমণীয়তা সকলের চিত্তই আকর্ষণ করে। স্রক্, চন্দন, বনিতাদিতে কোন্ পুরুষ মুগ্ধ না হয়? সুতরাং অদ্বৈতের সৌন্দর্য্য অনির্ব্বচনীয় ও অনুপভোগ্য বলিয়া এবং দ্বৈতের সৌন্দর্য্য ভোগ্য ও দৃশ্য বলিয়া বহির্দৃষ্টিতে তাহার সৌন্দর্য্য যে সর্ব্বাতিশায়ী, তাহা কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু এই সৌন্দর্য্য যে বন্ধনের নিমিত্ত হয়, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। পরম ভক্ত মধুসূদন ভক্তির উৎকর্ষ দেখাইতে গিয়া ভক্তেরও উৎকর্ষ দেখাইয়াছেন। এই ভক্তির সৌন্দর্য্য কিরূপ, তাহা আমরা ভক্তির ত্রিবিধ প্রকার ভেদে দেখাইয়াছি। বস্তুতঃ, এই সৌন্দর্য্যবোধ কেবল অজ্ঞানীর পক্ষেই খাটে। এইজন্য, উক্ত শ্লোকে "কল্পিতং দ্বৈতং" বলা হইয়াছে। সুতরাং, স্পষ্টই "কল্পিত" শব্দ প্রয়োগ করায় দ্বৈত মতে তাঁহার অনুরাগ ছিল, ইহা কল্পনা করা, বালকোচিত দুরাগ্রহের ফলমাত্র।

এখন কথা হইতেছে যে, মধুসূদন নিজেই বলিয়াছেন,—

"কৃষ্ণাৎপরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে"।

অর্থাৎ—সগুণ সাকার কৃষ্ণতত্ত্ব হইতে পরতত্ত্ব আমি কিছুই জানি না। এই উক্তিতেও তাঁহার অদ্বৈতবাদিত্বের হানি হয় না। কারণ; এই কথাটী উপাস্যতত্ত্ব সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। উপাস্যতত্ত্ব যে সাকার, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যাহা জ্ঞেয় বা দৃশ্য, তাহাই সাকার। পরমতত্ত্ব অজ্ঞেয়, অনির্ব্বচনীয়, অদৃশ্য ও অপ্রমেয়। সুতরাং, জ্ঞানের বিষয়ীভূত তত্ত্ব সাকারই। আমি কৃষ্ণকেই উপাস্যতত্ত্বের শ্রেষ্ঠতত্ত্ব বলিয়া জানি, তাহার পরে যে নিগুর্ণ তত্ত্ব আছে, তাহা আমি জানি না, অর্থাৎ তাহা অজ্ঞেয়, অপ্রমেয় ও অদৃশ্য। ইহাই উক্ত বাক্যের অর্থ। আর এক স্থানেও তিনি বলিয়াছেন—

ধ্যানাভ্যাসবশীকৃতেন মনসা তন্নির্গুণং নিষ্ক্রিয়ং
জ্যোতিঃ কিঞ্চন যোগিনো যদি পরং পশ্যন্তি পশ্যন্তু তে।
অস্মাকন্তু তদেব লোচনচমৎকারায় ভূয়াচ্চিরং
কালিন্দীপুলিনেষু যৎ কিমপি তন্নীলং মহোধাবতি ॥

অর্থাৎ—ধ্যানের অভ্যাস দ্বারা চিত্তকে বশীভূত করিয়া যোগিগণ যদি সেই নিগুর্ণ নিষ্ক্রিয় পরমজ্যোতিঃ দর্শন করেন, তবে করুন। কালিন্দীর পুলিনদেশে যে অনির্ব্বচনীয় নীলবর্ণ তেজঃ ধাবিত হইতেছে, সেই রূপই চিরকালের জন্য আমাদের লোচন দ্বয়ের আনন্দদায়ক হউক। ঐ শ্লোকে "নীলং মনোধাবতি" এইরূপও পাঠ দেখা যায়। তাহার অর্থ এই, আমাদের মন কালিন্দীপুলিনে অনির্ব্বচনীয় যে নীলরূপের উদ্দেশ্যে ধাবিত হইতেছে, সেইরূপই চিরকালের জন্য আমাদের লোচনের তৃপ্তিদায়ক হউক। এই শ্লোকেও মধুসূদনের অদ্বৈতবাদিতার হানি হয় নাই, কারণ, এখানে দৃশ্যতত্ত্বের কথাই বলা হইয়াছে। যোগবলে নিগুর্ণ জ্যোতিঃস্বরূপ পরমতত্ত্বের সাক্ষাৎকার হয়, কিন্তু সেইরূপ চক্ষুরিন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে। নয়নের

তৃপ্তি দায়ক সেই রূপকে যাবতীয় দৃশ্য পদার্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে, ইহাতে নির্গুণ পরমতত্ত্বের অস্তিত্ব নাই বা তাহা মধুসূদনের অভিপ্রেত নহে, একথা বলা যায় না। তিনি আর এক স্থানেও বলিয়াছেন—

"যদ্‌ভক্তিং ন বিনা মুক্তির্যঃ সেব্যঃ সর্ব্ব যোগিনাম্।
তং বন্দে পরমানন্দ মাধবং নন্দনন্দনম্" ॥

অর্থাৎ—যাঁহার ভক্তি ব্যতিরেকে মুক্তি হয় না, যিনি সকল যোগিগণের সেব্য, সেই পরমানন্দময় নন্দনন্দন মাধবকে বন্দনা করি। ইহাও উপাস্য তত্ত্বেরই কথা। পরম ভক্ত মধুসূদনের হৃদয় সর্ব্বদাই ভক্তিভাবে আর্দ্র হইয়াছিল। তিনি নিজকে বিষ্ণুস্বরূপ বলিয়াও প্রারব্ধ-সংস্কারবশে ভক্তিপ্রবণতার হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন নাই। জ্ঞানকে মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ জানিয়াও, অদ্বৈতসিদ্ধান্তে দৃঢ়বিশ্বাসী হইয়াও কঠোর চিত্ত অনধিকারী শিষ্যগণের হৃদয়ে মৃদু মধুর ভক্তিভাব মাখাইয়া তাহাদিগের অদ্বৈততত্ত্বের কণ্টকময় পথ পরিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন। জ্ঞান ও ভক্তির এইরূপ অপূর্ব্ব সমন্বয় অতি অল্প সংখ্যক সাধকের মধ্যেই দৃষ্টি গোচর হইয়া থাকে।

মধুসূদনের সম্প্রদায় রক্ষা।

মধুসূদন অদ্বৈত সিদ্ধি, অদ্বৈতরত্নরক্ষণ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রচার দ্বারা যেমন এক দিকে অদ্বৈততত্ত্ব প্রচারে ব্রতী হইলেন, তেমন অধ্যাপনা দ্বারা শিষ্য প্রশিষ্য ক্রমে নিজের বহুল সম্প্রদায় বৃদ্ধি করিলেন। এই সময়ে সন্ন্যাসিগণের মধ্যে একটী অচিন্তনীয় ও অনভিভবনীয় বিপৎ উপস্থিত হইল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মধুসূদনের কাশীধামে অবস্থিতি কালে মোল্লাগণ নিষ্ঠুরভাবে ইতর জীবজন্তুর ন্যায় সন্ন্যাসিগণকে নিধন করিত। শুনা যায়, মোল্লাদের রাজদ্বারে বিচার নাই ইহা মুসলমান শাস্ত্রানুমোদিত। সম্রাট্ আকবর সর্ব্বজনপ্রিয় ন্যায়বিচারক হইলেও দেশে বিদ্রোহ ও অশান্তির ভয়ে

উহার প্রতীকারে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হন নাই। সশস্ত্র মোল্লাগণের ভয়ে, সন্ন্যাসিগণ অতি ব্যাকুলতার সহিত গৃহ রুদ্ধ করিয়াই প্রায় অবস্থান করিতেন। একাকী কেহ একস্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতেন না। গঙ্গাস্নানের সময়েই এই কার্য্য অতিমাত্রায় অনুষ্ঠিত হইত। এই নৃশংস অনুষ্ঠান ক্রমেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। কাশীর সন্ন্যাসিগণ নিরুপায় হইয়া স্থানান্তরে যাইবার সঙ্কল্প করিয়া মধুসূদনের শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, মধুসূদনের কৃপায় সম্রাট্-মহিষী রোগমুক্ত হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার নিকট মধুসূদনের প্রার্থনা নিশ্চয়ই ফলবতী হইবে। মধুসূদন তাঁহাদের কথায় স্বীকৃত হইয়া দিল্লীতে গমন করিলেন। কি পাণ্ডিত্যে, কি ত্যাগে, কি জ্ঞানে তখন মধুসূদনের সমকক্ষ কোন লোকই ভারতবর্ষে ছিল না। তাঁহার পৃথিবীবিকীর্ণ যশঃ-সুরভি ভারত সম্রাটের পুরমন্দির পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়াছিল। সুতরাং দিল্লীতে গিয়া সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করা তাঁহার পক্ষে অনায়াস সাধ্য হইল। সম্রাট্ তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। মহতী সভার অনুষ্ঠান হইল। সভাসদ্ পণ্ডিতগণের সহিত বিচারে মধুসূদন জয়ী হইলেন। পরে সম্রাটের নিকট সন্ন্যাসিগণের নিধনবার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়া, তাঁহাদের রক্ষার প্রার্থনা জানাইলেন। সম্রাট্ বলিলেন, আপনার বিদ্যার দৈবী পরীক্ষা করিব, সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে আপনার প্রার্থনার বিচার হইবে। পূর্ব্বকালে সংশয়িত বিষয়ের পরিজ্ঞানের জন্য হাত চালান দেওয়া হইত, ঐ কার্য্যে বহু লোকই অভিজ্ঞ ছিল। অভিজ্ঞগণকে ডাকা হইল এবং আদেশ দেওয়া হইল—মধুসূদন কেমন পণ্ডিত, তাহা আমার সমক্ষে হাত চালান দিয়া অবগত হও। ঐ কার্য্যে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাহার অনুষ্ঠান করিলেন। বিনা যন্ত্রে, বিনা লোক সাহায্যে দৈবী শক্তি বলে লিখিত হইল—

"বেত্তি পারং সরস্বত্যা মধুসূদন সরস্বতী।
মধুসূদনসরস্বত্যাঃ পারং বেত্তি সরস্বতী॥"

অর্থাৎ—ভগবতী সরস্বতী, মধুসূদন সরস্বতীর বিদ্যার পার অর্থাৎ সীমা অবগত আছেন, এবং মধুসূদন সরস্বতীও ভগবতী সরস্বতীর বিদ্যার পার অবগত আছেন। এই দৈবীপ্রশস্তি সভাসদ্ পণ্ডিতবর্গ ও সম্রাট্ আকবর কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইল। মধুসূদনের পাণ্ডিত্য ও যশঃ পৃথিবীর সকল স্থানে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিল। সম্রাট্ সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু কিছু কাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তুষ্ণীম্ভাবে অবস্থিত রহিলেন। পরে সুচতুর সম্রাট্ বিশেষ বিবেচনা করিয় বলিলেন, আপনার প্রার্থনায় আমি এই আদেশ করিতেছি যে, "মোল্লাগণের যেমন রাজদ্বারে বিচার নাই, সেইরূপ সন্ন্যাসিগণের ও রাজদ্বারে বিচার হইবে না, তাঁহারা আত্মরক্ষার জন্য যে কোন উপায় অবলম্বন করিতে পারিবেন"। সম্রাটের এই আদেশ চতুর্দ্দিকে বিঘোষিত হইল। মধুসূদন আত্মরক্ষার বিজয় কবচ গ্রহণ করিয়া কাশীতে আসিয়া বিজয় মাল্য গ্রহণ করিলেন। মধুসূদনের আদেশে নাগা সন্ন্যাসি গণের মধ্যে যোগবিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রবিদ্যার ও প্রবর্ত্তন হইতে লাগিল। মোল্লাদের সহিত তাঁহাদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে লাগিল। সন্ন্যাসি-নিধনের সঙ্গে সঙ্গে মোল্লা-নিধনের বার্ত্তাও প্রচারিত হইল। নিজেদের অবারিত অত্যাচারের প্রতীকার দেখিতে পাইয়া মোল্লাগণ নিরস্ত হইলেন। এইবার কাশীধাম নিরাপদ হইল। অত্যাচারের প্রবল বন্যা প্রশমিত হইল। সন্ন্যাসিগণ নির্ভীকভাবে বিচরণ করতঃ ও স্ব স্ব কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন। পৃথিবীব্যাপী মধুসূদনের জয়জয়কার হইল। সন্ন্যাসিগণের নিকট মধুসূদনের গৌরব আরও বৃদ্ধি পাইল।

মধুসূদনের নিস্পৃহতা।

বিশ্ববিশ্রুত কীর্ত্তি মধুসূদনের জ্ঞানৈশ্বর্য্যের কথা ক্রমে ক্রমে যোগি-সম্প্রদায়ের গুরু সিদ্ধযোগী ভগবান্ গোরক্ষনাথের কর্ণগোচর হইল। তিনি মধুসূদনকে পরীক্ষা করিবার বাসনা করিলেন। এখানে প্রিয় পাঠকগণ

অবশ্যই আপত্তি করিতে পারেন যে, যিনি সিদ্ধযোগী তিনি যোগবলেই মধুসূদনের যোগ্যতা অবগত আছেন, এ অবস্থায় আবার লৌকিক পরীক্ষা কেন? এই প্রশ্নের উত্তর ভাবুক পাঠকগণের পক্ষে অতি সরল। সকলেই অবগত আছেন যে, ভগবান্ শঙ্কর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন কিনা, ইহ জানিবার জন্য ভগবান্ বেদব্যাস ছদ্মবেশে শঙ্করাচার্য্যের পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং বদরিকাশ্রমে ও শঙ্করাচার্য্যের সহিত ছদ্মবেশে বেদান্তের বিচার করিয়াছিলেন। আর, ভগবান্ নারায়ণ কৃষ্ণরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন কিনা, ইহার পরীক্ষার জন্য ইন্দ্রাদি দেবগণ পৃথিবীতে নানা প্রকার উৎপাতের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এবং ব্রহ্মাদি দেবগণ ও ছদ্মবেশে নন্দনন্দন প্রকৃতই বিষ্ণুর অবতার কিনা, ইহা জানিবার জন্য পরীক্ষা করিয়াছিলেন।

কিন্তু এইরূপ পরীক্ষার উদ্দেশ্য কি? ত্রিকালদর্শী ব্রহ্মাদি দেবগণ কি ভগবান্ নারায়ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন কিনা এই তত্ত্ব জানিতেন না। সূক্ষ্ম ব্যবহিত বিপ্রকৃষ্টদর্শী ভগবান্ বেদব্যাস কি শঙ্করাচার্য্যের তত্ত্ব অবিদিত ছিলেন? ধনবান্ যেরূপ ধনবানের সংবাদ রাখেন, বিদ্বান্ যেরূপ বিদ্বানের খবর রাখেন, সেইরূপ সিদ্ধ মহাযোগী গোরক্ষনাথ কি জ্ঞান ও ভক্তির আধার পরমযোগী মধুসূদনের তত্ত্ব অবগত ছিলেন না? তবে এইরূপ পরীক্ষার উদ্দেশ্য কি? ঐরূপ পরীক্ষার তাৎপর্য্য এই যে, অজ্ঞানাচ্ছন্ন মানবগণের নিকট তাঁহাদের অলৌকিকত্ব ও দেবত্ব স্থাপন করা। যদি এইরূপ অগ্নিপরীক্ষা না হইত, তাহা হইলে কৃষ্ণ গোপতনয়ই থাকিতেন। মধুসূদন ও সামান্য সন্ন্যাসী বলিয়া পরিগণিত হইতেন। যাহা হউক, পরমযোগী ভগবান্ গোরক্ষনাথ মধুসূদনের নিকটে একটী চিন্তামণি রত্ন লইয়া উপস্থিত হইলেন। মধুসূদন তখন কেবল গঙ্গাস্নান করিয়া পারে উঠিয়াছেন। ভগবান্ গোরক্ষনাথ বলিলেন, মধুসূদন! আমার নিকট একটী চিন্তামণি রত্ন আছে, ঐ রত্নটী একটী যোগ্য পাত্রে অর্পণ

করিবার জন্য নানাস্থানে ঘুরিতেছি, এখন তোমাকে ইহার উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া অর্পণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, তুমি ইহা গ্রহণ করিয়া আমার অভিলাষ পূরণ কর, আমি নিরন্তর ইহাকে বহন করিয়া বেড়াইতেছি। আমার প্রারব্ধ ভোগের অবসান হইয়াছে, এখন এই ভৌতিক দেহ ত্যাগ করিবার বাসনা করিয়াছি। তুমি ইহা গ্রহণ কর, তোমার যখন যাহার অভাব হইবে, এই মণিটী থাকিলে তখনই তাহার পূরণ হইবে।

মধুসূদন, সেই তেজঃ পুঞ্জ কলেবর বৃদ্ধ যোগিবরকে দর্শন করিয়া, তাঁহার যথোচিত অভ্যর্থনা পূর্ব্বক বিনীতভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, ভগবন্! আপনার অযাচিত দয়া দর্শন করিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম, আমার অনুরোধ এই যে, ঐ অমূল্য মণিটী কোন দরিদ্র যোগ্য পাত্রে অর্পণ করুন, আমার ত কোন অভাব নাই, আমি এই মণি দিয়া কি করিব? ভগবান্ গোরক্ষ-নাথ বলিলেন, আমি বৃদ্ধ, আমার প্রতি যদি তোমার শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিতে অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে আমার বাক্যের অন্যথা করা সঙ্গত নহে। তখন অবিচারণীয় গুরুজনের আদেশের ন্যায় ভগবান্ গোরক্ষনাথের বাক্যও অলঙ্ঘনীয় মনে করিয়া আপ্তকাম মধুসূদন বলিলেন, ভগবন্! আপনার অপ্রতিহত ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার কিছুই বক্তব্য নাই, যদি নিতান্তই আমাকে ঐ মণিটী দিবার ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আদেশ করুন, আমি ইচ্ছামত উহার ব্যবহার করিতে পারিব। ভগবান্ গোরক্ষনাথ বলিলেন, আচ্ছা তাহাই হইবে।

তখন মধুসূদন উত্তরাস্য হইয়া আচমন পূর্ব্বক করপুটদ্বয় একত্র যোজিত করিয়া হস্ত প্রসারণ করিলেন, ভগবান্ গোরক্ষনাথও তখন মহামূল্য মণিটী তাঁহার করে অর্পণ করিলেন। তখন মধুসূদন বলিলেন, এখন আমি ইহা ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে পারি? গোরক্ষনাথ বলিলেন, হাঁ। মধুসূদন তখন ঐ অমূল্য মণিটী গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিলেন। ভগবান্ গোরক্ষ-

-নাথের পরীক্ষা শেষ হইল। মধুসূদন সংস্কৃত মণির ন্যায় আরও উজ্জ্বল হইলেন। ভগবান্ গোরক্ষনাথ বলিলেন, মধুসূদন! বল দেখি আমি যোগ্য পাত্রে মণিটী দান করিয়াছি কিনা? মধুসূদন লজ্জায় মস্তক অবনত করিলেন। পরে, উভয়ে পরস্পরের প্রতি যথোচিত শিষ্টাচার প্রদর্শন পূর্ব্বক নিজ নিজ অভীষ্ট স্থানে গমন করিলেন।

আমরা মধুসূদনের এই ত্যাগের প্রশংসা করিতে পারি না, কেননা, যিনি গঙ্গেশের তত্বচিন্তামণি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, যিনি পরম তত্ব চিন্তামণির সাক্ষাৎকার লাভ কবিয়াছেন, তাঁহার লব্ধব্য বা প্রাপ্তব্য আর কি আছে! সামান্য চিন্তামণি প্রস্তর কি তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে পারে?

মধুসূদনের উপাসনা স্থান।

কোন গ্রন্থে লিখিত আছে যে, মধুসূদন সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পরে পুরীধামে জগন্নাথ ক্ষেত্রে আগমন করেন, এবং পুরীর নিকটবর্ত্তী একটী গভীর অরণ্যে ১৭ সতর বৎসর কাল যোগাবলম্বন করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। পরে, পুনরায় কাশীধামে গিয়া চৌষট্টি যোগিনীর ঘাটে একটি মঠ মধ্যে অবস্থান করেন। ঐ মঠের সংলগ্ন আর একটী মঠ ছিল, ঐ মঠে গোপাল বিগ্রহ থাকিতেন, প্রত্যেক দিন মধুসূদন স্বহস্তেই তাঁহার সেবা করিতেন। তখন চৌষট্টি যোগিনীর ঘাট অত্যন্ত জীর্ণ হইয়াছিল। তৎকালে যশোহরের প্রবলপ্রতাপ রাজা প্রতাপাদিত্য মধুসূদনের পৃথিবীব্যাপী যশের সংবাদ পাইয়া পুলকিত হইলেন। যেহেতুক মধুসূদন তাহারই দেশের; বঙ্গদেশের গৌরবস্তম্ভ। মহারাজ প্রতাপাদিত্য কাশীতে গমন করিয়া মধুসূদনকে জীবন ধারণ ও সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানের জন্য প্রচুর ধন দান করিতে ইচ্ছা করিলে, মধুসূদন তাহা উপেক্ষা করেন, কিন্তু মহারাজ প্রতাপাদিত্য সাধারণের সুবিধার জন্য চৌষট্টি যোগিনীর ঘাটের পুনঃ সংস্কার সাধন করেন, এবং মধুসূদনের মঠ ও গোপাল মন্দিরেরও পুনঃ

সংস্কার সম্পন্ন করেন। এখন ঐ মঠ ও গোপাল মন্দির একরূপ নাম মাত্রেই পর্য্যবসিত হইয়াছে।

মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জন্মকাল ১৫৬০ কিংবা ১৫৬১ খ্রীষ্টাব্দ। ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যশোহর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে গৌড়ের ধ্বংস হয়। ১৫৮৪ খ্রীঃ তাঁহার রাজ্যাভিষেক হয়। ১৫৯৯ খ্রীঃ তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১৬০২ খ্রীঃ চন্দ্রদ্বীপের রাজপুত্র রামচন্দ্রের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ হয়। ১৬০৩।৪ খ্রীঃ যশোহর আক্রমণ, মানসিংহের সুবেদারী ত্যাগ ও আগ্রায় গমন। ১৬০৯ খ্রীঃ ঢাকায় রাজধানী স্থাপন। ১৬১০ খ্রীঃ পরাজয়। ১৬১১ খ্রীঃ ৫০ বৎসর বয়সে কাশীতে মৃত্যু। (যশোহর খুলনার ইতিহাস)।

মধুসূদনের নবদ্বীপে আগমন।

বহুদিন কাশীতে বাস করিয়া মধুসূদনের দেশপর্য্যটনের ইচ্ছা হইল। মনে করিলেন, একবার পূর্ব্ব গুরুগণের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। নবদ্বীপ তখনও জগদ্বিজয়ী নৈয়ায়িকগণের আবাসভূমি। তখন জগদীশ বৃদ্ধ, মথুরানাথ অতি বৃদ্ধ, মদমত্ত করিযুবকের ন্যায় বিদ্যাবলদৃপ্ত গদাধর তখন নবদ্বীপের উদীয়মান নৈয়ায়িক। মধুসূদন মনে করিলেন, মত্ত-মাতঙ্গের ন্যায় নবদ্বীপের বিজয়স্তম্ভ দ্বৈতবাদী নৈয়ায়িকগণের নিকট আমার সদ্যঃ প্রসূত সিংহশিশুর ন্যায় অদ্বৈতসিদ্ধির অগ্নিপরীক্ষা হইবে। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই অদ্বৈতসিদ্ধির গুরুত্ব বর্দ্ধিত হইবে, নচেৎ প্রতিপক্ষগণের নিশিত-পূর্ব্বপক্ষ-শরনিকরে জর্জরিত হইয়া ইহার প্রাণ রক্ষা দুরূহ হইবে। সুতরাং অদ্বৈতমতের বহুল প্রচারই মধুসূদনের নবদ্বীপ গমনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। মধুসূদন, প্রবীণ নিখিলবিদ্যা-নিষ্ণাত, শিষ্যমণ্ডলী পরিবৃত হইয়া পূর্ব্বগুরুস্থান নবদ্বীপধামে উপনীত হইলেন। নানাস্থানে হইতেই তাঁহার সাদর অভ্যর্থনা হইল। তিনি

শিষ্যমণ্ডলী সহ নবদ্বীপের উদীয়মান গৌরবরবি গদাধরের গৃহেই আতিথ্য স্বীকার করিলেন! অদ্বিতীয় বেদান্তী সশিষ্য সন্ন্যাসী মধুসূদনকে পাইয়া গদাধর আনন্দসাগরে মগ্ন হইলেন। মনে হইল, যেন বহু দিনের সাধনার ফলস্বরূপ ভগবান্ মধুসূদনকে প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থতা লাভ করিলেন। বিচারমল্ল গদাধর, শাস্ত্রীয় বিচারের কণ্ডূয়ন নিবৃত্তির ও একটী অপূর্ব্ব সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। পণ্ডিত সন্ন্যাসীকে দেখিবার জন্য দলে দলে লোক আসিয়া গদাধরের গৃহ দেবতার উৎসব ক্ষেত্রে পরিণত করিল। মুসলমানদের অত্যাচারে ভারতের বাহ্য ঐশ্বর্য্য বিলুপ্ত হইলেও জ্ঞানৈশ্বর্য্য বিলুপ্ত করিবার কোন সুচিন্তিত উপায় তাহারা তখনও উদ্ভাবিত করিতে পারে নাই। বস্তুতঃ, তৎকালে নবদ্বীপের বিদ্যা ও ভক্তিতরঙ্গিণীর প্রবল-বন্যা ভারতবর্ষকে প্লাবিত করিয়াছিল।

পাণ্ডিত্যাভিমানী বিচারমল্ল দ্বৈতমতাবলম্বী গদাধর মধুসূদনের সহিত শাস্ত্রালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। দাবানলের দ্বারা তৃণরাশির ন্যায় তাঁহার দুরুত্তর আপত্তি সকল যেন ভস্মসাৎ হইল। তিনি মধুসূদনের নানাশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য, লোকাতিশায়িনী প্রতিভা ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পদার্থানুভবের এবং বিচারপদ্ধতির নৈপুণ্য দর্শন করিয়া হতপ্রভ হইলেন। তিনি যে অনুমিতি গ্রন্থে দীধিতির "অখণ্ডানন্দবোধায়" পদের দ্বৈতমতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা কেবল স্বপক্ষের দ্বৈতসংস্কারের প্রবল প্রেরণায়, বাস্তবিক মধুসূদনের বিচারনৈপুণ্য তাঁহাকে অদ্বৈতমতের উৎকর্ষ স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছিল। পণ্ডিতকুল-চূড়ামণি জগদীশ তর্কালঙ্কার এবং অতি বৃদ্ধ মথুরানাথ তর্কবাগীশ ও মধুসূদনের অসাধারণী প্রতিভার নিকট মস্তক অবনত করিলেন। সুতরাং জগদীশ ও দীধিতির ব্যাখ্যায় "অখণ্ডানন্দবোধায়" পদের অদ্বৈতপক্ষেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অতি বৃদ্ধ মথুরানাথ তর্কবাগীশ মহাশয় তাঁহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন না। বরং তাঁহার উৎকর্ষ দর্শনে আনন্দাতিশয়ই প্রকাশ করিতে লাগিলেন,

এবং তাঁহার উৎকর্ষ দ্বারা নবদ্বীপের মহত্ত্ব ও গৌরবই অনুভব করিলেন। কেননা, তিনি নবদ্বীপেরই ছাত্র। কিন্তু সাধারণে বুঝিল ও ঘোষণা করিল, পরাজয়ের আশঙ্কায় ভীত হইয়া মথুরানাথ বিচার করিলেন না।

নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ মধুসূদনের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন, এবং তিনি যে নবদ্বীপের শিষ্য হইয়া নবদ্বীপ বিজয়ী হইয়াছেন, ইহাতে তাঁহারা নিজের গর্ব্বই অনুভব করিলেন। মধুসূদন সকলের সহিত বিশেষ শিষ্টাচার ও সদ্ব্যবহার প্রদর্শন করিলেন। পণ্ডিতগণও তাঁহার প্রতি সম্মান ও সমাদর প্রদর্শন করিলেন। বাস্তবিক মধুসূদনের অলৌকিক প্রতিভায় নবদ্বীপ যে হতপ্রভ হইল, ইহা সাধারণ লোকেই বুঝিতে পারিল, এবং তৎকালে নবদ্বীপে সকলের মুখেই এই শ্লোকটী শ্রুত হইল। যথা—

"নবদ্বীপে সমায়াতে মধুসূদন-বাক্পতৌ।
চকম্পে তর্কবাগীশঃ কাতরোঽভূদ্গদাধরঃ" ॥

অর্থাৎ—মধুসূদন সরস্বতী নবদ্বীপে আগমন করিলে, মথুরানাথ তর্ক-বাগীশ মহাশয় বিচার ভয়ে কম্পিত হইলেন, এবং গদাধর ও ব্যাকুল হইলেন।

কেহ কেহ এই শ্লোকটী এইরূপ পাঠ করেন —

মথুরায়াঃ সমায়াতে মধুসূদন-বাক্পতৌ।
অনাশো জগদীশোঽভূৎ কাতরশ্চ গদাধরঃ" ॥

মধুসূদন শিষ্যবর্গ সহ একদিন অতিবৃদ্ধ মথুরানাথ তর্কবাগীশের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। সন্ন্যাসী হইলেও মধুসূদন অতি বৃদ্ধ তর্কবাগীশের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিলেন। মথুরানাথও সন্ন্যাসিজনোচিত সম্মানই মধুসূদনের প্রতি প্রদর্শন করিলেন। কারণ, ব্রাহ্মণগণ জ্ঞান দ্বারাই উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকেন। উভয়ে বহুক্ষণ নানা প্রকার শিষ্টালাপ ও কথাপ্রসঙ্গে অনেক শাস্ত্রীয় কথারও

আলোচনা করিলেন। তর্কবাগীশ মহাশয় মধুসূদনের অসামান্য প্রতিভায় মুগ্ধ হইলেন। এইরূপে উভয়ে মিলিত হইয়া মহানন্দে ২।৩ দিন অতিবাহিত করিলেন। একদিন মধুসূদন দেখিলেন, যে বৃদ্ধ তর্কবাগীশ মহাশয় ক্ষীণ দৃষ্টি সম্পন্ন হইয়াও একাগ্রতা সহকারে কি যেন লিখিতেছেন। মধুসূদন কৌতুহল পরবশ হইয়া রসিকতার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—

তর্ক-কর্কশবিচারচাতুরী, আকুলী ভবতি যত্র মানসং।
কিং তুরীয়বয়সা বিভাব্যতে ?··· ··· ··· ··· ···

অর্থাৎ—হে পণ্ডিতকুলচূড়ামণে! যাহাতে বুদ্ধি আকুল হয়, সেই তর্ক-শাস্ত্রের কর্কশ বিচার চাতুর্য্য এই চতুর্থ বয়সে অর্থাৎ জীবনের শেষ সময়ে কেন চিন্তা করেন? এখন চিত্ত স্থির করিয়া সমাধিমগ্ন হওয়ার সময়, এ সময়ে যাহাতে চিত্তের চঞ্চলতা বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ কার্য্য আপনার মত মহামনীষির পক্ষে কি কর্ত্তব্য ?

মথুরানাথ মধুসূদনের সদভিপ্রায় বুঝিয়া সন্তুষ্ট হইলেন, এবং হাসিতে হাসিতে ঐ শ্লোকটীর চতুর্থচরণ পূরণ করিয়া উত্তর দিলেন—

"ধাতুরীপ্সিত মপাকরোতি কঃ"।

অর্থাৎ বিধাতার ইচ্ছার কে প্রতিরোধ করে ?

মধুসূদন এইরূপে কয়েকদিন নবদ্বীপে অতিবাহিত করিয়া বেদান্ত-শাস্ত্রের উপযোগিতা প্রচার পূর্ব্বক পণ্ডিতগণের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে পণ্ডিতবহুল মিথিলা প্রভৃতি নানাদেশ ভ্রমণ ও বেদান্তবিদ্যার প্রচার করিতে করিতে মুক্তিক্ষেত্র হরিদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মধুসূদনের নির্ব্বাণ।

মধুসূদন, দৃষ্টও আনুশ্রবিক বিষয়ে বিতৃষ্ণ হইয়াছিলেন। আত্মজ্ঞান-নিবন্ধন সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মক বস্তু মাত্রেই তাঁহার বৈতৃষ্ণ্যরূপ পরম-

বৈরাগ্যের উৎপত্তি হইয়াছিল। তখন তাঁহার প্রারব্ধ কর্ম্মভোগ শেষ হইয়াছে। সুতরাং, তিনি পুরাতন গৃহের ন্যায়, অশুচি জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিতে বাসনা করিলেন। তাঁহাতে জীবন্মুক্তের সমুদয় লক্ষণই প্রকাশ পাইয়াছিল। জীবন্মুক্তের দেহপাতানন্তরই নির্ব্বাণ লাভ হইয়া থাকে। তিনি মনে করিলেন—এই অপবিত্র দেহ ত্যাগের সময় উপস্থিত হইয়াছে। এখন আর ইহার ভার বহন করা উচিত নহে। কেননা, পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন—

"স্থানাদ্বীজাদুপষ্টম্ভান্নিষ্যন্দান্নিধনাদপি।
কায়মাধেয়শৌচত্বাৎ পণ্ডিতা হ্যশুচিং বিদুঃ" ॥

অর্থাৎ—মাতার উদররূপ অতি অপবিত্র স্থানে, অপবিত্র শুক্র শোণিতে উৎপন্ন, মাতার ভুক্ত ও পীত বস্তুর রসে পরিবর্দ্ধিত, এই দেহ অতিশয় অপবিত্র। ইহার প্রত্যেক অঙ্গ ও ছিদ্র দ্বারা স্বেদ ও মলাদি নির্গত হইয়া থাকে। বেদবিৎ ব্রাহ্মণের দেহও মৃতাবস্থায় অপবিত্র ও অস্পৃশ্য। মৃত্তিকাও জলাদি বাহ্য বস্তু দ্বারা ইহার পবিত্রতা সম্পাদিত হয়। সুতরাং, পণ্ডিতেরা ভ্রান্তবুদ্ধি মানবগণের পরমাদরের পাত্র এই দেহকে অশুচি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শাস্ত্রকারেরা আরও বলিয়াছেন—

"অস্থিস্থূণং স্নায়ুযুতং মাংসশোণিতলেপনং।
চর্ম্মাবনদ্ধং দুর্গন্ধি পূর্ণং মূত্রপুরীষয়োঃ" ॥

অর্থাৎ—দেহরূপ গৃহের অস্থিই খুঁটী, স্নায়ু বন্ধনরজ্জু, মাংস ও শোণিত দ্বারা তাহা লিপ্ত, চর্ম্ম দ্বারা আচ্ছাদিত, দুর্গন্ধযুক্ত, এবং মূত্রও পুরীষ দ্বারা পরিপূর্ণ। সুতরাং, এই অপবিত্র দেহ আর ধারণ করা কর্ত্তব্য নহে। তিনি মনে করিলেন, স্বর্গদ্বার হরিদ্বার ও মোক্ষক্ষেত্র। শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন—

"অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ ॥"

অর্থাৎ—অযোধ্যা, মথুরা, মায়াপুরী বা হরিদ্বার, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তি ও দ্বারকাপুরী, এই সাতটী স্থান মোক্ষদায়ক। সুতরাং, কাশীক্ষেত্রের ন্যায় পবিত্র, গঙ্গা-সলিলপূত হরিদ্বারেই এই জীর্ণ দেহ পাত করিব। তিনি এই সঙ্কল্প করিয়া শিষ্যবর্গকে নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। অন্যের সহিত কথাবার্ত্তা প্রায় বন্ধ করিলেন। দীর্ঘকালই সমাধিমগ্ন হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। শিষ্যবর্গকে ভবিষ্যৎকর্ত্তব্য সম্বন্ধে আবশ্যকীয় সমুদয় উপদেশই প্রদান করিলেন। তাঁহার পরেচ্ছাজনিত প্রারব্ধভোগের অবসান হইল। মানুষ ও ব্রাহ্মণ হইয়া দেহধারণ করার সমুদয় উদ্দেশ্যই তিনি সাধন করিলেন।

মধুসূদনের মহাপ্রয়াণকাল নিকটবর্ত্তী হইল। তিনি শিষ্যবর্গকে ডাকিয়া তাঁহার মহাপ্রয়াণের সময় নির্দ্দেশ করিলেন এবং স্বয়ং গঙ্গাতীরে যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া সমাধি মগ্ন হইলেন। এই সমাধিই তাঁহার চিরসমাধি! আর সমাধি ভঙ্গ হইল না। ঘটভঙ্গে ঘটাকাশ মহাকাশে মিশিয়া গেল, জলের তরঙ্গ সলিলরাশির সহিত একীভূত হইল, ভক্তি-তরঙ্গিণী জ্ঞান-গঙ্গায় মিশিয়া ব্রহ্মানন্দ সাগরে বিলীন হইল। সব ফুরাইল, মধুসূদনের নশ্বর দেহ সন্ন্যাসিগণের বিধি অনুসারে শিষ্যগণ কর্ত্তৃক গঙ্গা সলিলে সমাহিত হইল। মধুসূদনের নশ্বর ভৌতিক দেহ ভূতে মিশিয়া গেল, কিন্তু তাঁহার অক্ষয়কীর্ত্তি-মন্দাকিনীর বিমল ধারা জগৎকে শান্ত ও শীতল করিল, তাঁহার যশঃ-সুরভি চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইল, ভারত পণ্ডিতশূন্য হইল, ভারতের গৌরব-সূর্য্য চিরকালের জন্য অস্তমিত হইল, বেদান্তসাম্রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট্ আজ চিরকালের জন্য বিদায় গ্রহণ করিলেন। মধুসূদন বিবাহ করেন নাই, তাঁহার পুত্র কন্যা কেহই নাই। কিন্তু তাঁহার অদ্বৈত-সিদ্ধি, অদ্বৈতরত্নরক্ষণ প্রভৃতি কন্যা ও পুত্র স্থানীয় হইয়া রহিয়াছে। তাহাদের বহু সন্তান জন্মিয়াছে, সুতরাং মধুসূদনের বংশ অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত থাকিবে। শিষ্য, প্রশিষ্য ও অনুশিষ্যবর্গ তাঁহার পুত্রপৌত্র

প্রভৃতি স্থানীয়। সুতরাং, অদ্বৈতবেদান্তের সম্প্রদায় যে পর্য্যন্ত থাকিবে, মধুসূদনের বংশ ততকাল পর্য্যন্তই অবছিন্ন থাকিবে। যোগী সম্প্রদায়ের মধ্যে সকলেই বলিয়া থাকেন যে, মধুসূদন ১০৭ বৎসরে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন।

নিবেদন।

মধুসূদন! আমরা অল্পবুদ্ধি, তোমার গ্রন্থের অর্থ বুঝিবার সামর্থ্যও আমাদের নাই। তোমার চরিত্র অঙ্কিত করিতে গিয়া কতই না ভুল করিয়াছি, তোমার পবিত্র চিত্র কতই না বিকৃত করিয়াছি, কতই না কালিমালেপ করিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। আমি ত চিত্রকর নই, অচিত্রকরের হাতে পড়িয়া চিত্রের যেরূপ অবস্থা হয়, আমার হাতেও তাহাই হইয়াছে। আমি তোমার পরিচয় দিবার জন্য, তোমার কীর্ত্তি-খ্যাপনের জন্য, তোমার বিলুপ্ত নাম প্রচারের জন্য, ভারতীয় ইতিহাসের সহায়তার জন্য, লেখনী-কণ্ডুয়ন জন্য, বিদ্যাবত্তা প্রকাশের জন্য, বা গ্রন্থকারোচিত যশোলাভের জন্য, এই উদ্যম প্রকাশ করি নাই। আমি চিত্রকর না হইলেও তোমার পবিত্র চিত্র অঙ্কিত করিতে গিয়া লেখনীর সার্থকতা, রসনার পবিত্রতা, হৃদয়ের নির্ম্মলতা, ও বংশের নির্দ্দোষতাই প্রতিপাদন করিয়াছি, তোমার বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতে আনন্দ বোধ করিতেছি। এই চিত্র তোমার উৎকর্ষ সাধনের জন্য অঙ্কিত করি নাই, আমারই তৃপ্তির জন্য। তুমি নিজেই ত বলিয়াছ—

"স্বজ্ঞানশুদ্ধ্যৈ কৃতং"

আমি তোমার বংশধর, আমি ঐ কথাই বেদ বাক্যের ন্যায় পবিত্র মনে করিয়া বলিতেছি যে, আমিও নিজের জ্ঞান শুদ্ধির জন্য, তৃপ্তির জন্য, এই বালচাপল্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমি গানের "গ"ও জানি না, কিন্তু নির্জ্জনে গান করিয়া বড়ই আনন্দ অনুভব করি, তাই এই আনন্দে বাধা দিও না, এই অনুচিত বর্ণনায় অভিশাপ করিও না।

পণ্ডিতগণের মধ্যে শিষ্টাচার ও বিনয় প্রদর্শনের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার একটী রীতি আছে। কিন্তু আমার পাণ্ডিত্য নাই, শিষ্টতা নাই, বিনয় নাই। সুতরাং, আমি তাহাদের নিয়মে বাধ্য হইব কেন? আমাদের বংশ ক্ষমাশীল, কিন্তু বিনা অপরাধে ক্ষমাপ্রার্থী নহে। কম্বলের লোম একটী একটী করিয়া বাছিয়া বাহির করিলে যেমন তাহার অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়, সেইরূপ বহুল ভ্রমপ্রমাদ সমন্বিত এই গ্রন্থের আলোচনা করিলে, ইহারও যে প্রত্যেক পৃষ্ঠায় প্রতি পঙ্‌ক্তিতে ভাষাগত ভাবগত বর্ণনীয় বিষয়গত বহুল ত্রুটী লক্ষিত হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তথাপিও সুধীবর্গের নিকট কেন ক্ষমা প্রার্থনা করিব না, ইহার উত্তর আমি কাতন্ত্রগণমালার টীকার শেষ ভাগে বলিয়াছি, এখানে কেবল তাহারই পুনরুক্তি করিব—

"অজ্ঞানতৈব মে সর্ব্বান্ দোষান্ সম্মার্জয়িষ্যতি।
ইতি ক্ষমধ্বং ধীরা মাং নেত্যুক্তাঃ কৃপণা গিরঃ॥"

অর্থাৎ—আমি অজ্ঞান, আমার অজ্ঞানতাই সকল দোষ মার্জ্জনা করিবে। অতএব "হে পণ্ডিতগণ, আমাকে ক্ষমা করুন" এইরূপ কাতরতা-সূচক বাক্য আমি বলি নাই। মহাকবি ভারবিও বলিয়াছেন—

"সংবৃণোতি খলু দোষমজ্ঞতা"

অর্থাৎ—অজ্ঞতাই সকল দোষকে ঢাকিয়া রাখে।

এস মধুসূদন! একবার, এস। আসিয়া তোমার বংশ-বিটপি-পরিবেষ্টিত, বেত্রলতাসমাচ্ছন্ন, আম্র, পনস, নারিকেল, গুবাক প্রভৃতি তরুরাজি পরিশোভিত পবিত্র পিতৃনিকেতন দর্শন করিয়া যাও। তোমার পিতার অক্ষয় কীর্ত্তি পুরন্দরের বিশাল দীর্ঘিকার ও প্রতিষ্ঠিত ৺কালীমাতার সেবার অবস্থা একবার প্রত্যক্ষ করিয়া যাও। তোমার মূর্খ, দরিদ্র, অল্পায়ু ও শ্ববৃত্তিসম্পন্ন বংশের দিকে একবার দৃষ্টিপাত কর। তুমি নির্ব্বাণ

লাভ করিয়া কি সুখে আছ, তুমিই জান, কিন্তু তোমার অলৌকিক, অচিন্তনীয়, অননুভবনীয় নির্ব্বাণের প্রলোভনে তোমার বংশও নির্ব্বাণের স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। কুল, শীল, মর্য্যাদা, বিদ্যা, ব্রহ্মণ্য, শাস্ত্রানুরাগ, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, সত্যবাদিতা, তেজস্বিতা, সদাচারনিষ্ঠা, পরোপকার, ত্যাগ প্রভৃতি সকলই তোমার সঙ্গে সঙ্গে নির্ব্বাণের দিকে চলিয়াছে। অকালমৃত্যুর তাণ্ডবলীলা, বৈধব্যের দারুণ করুণ দৃশ্য, রোগের ভীষণ যন্ত্রণা, দারিদ্র্যের নিদারুণ নিষ্পেষণ, তোমার বংশে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। এস মধুসূদন! একবার এস! তুমি কখনও সংসারী ছিলে না, সংসার নাটকের একটী নূতন অভিনয় দেখিয়া যাও। এখন পুকুরে জল নাই, গাছে ফল নাই, মাঠে শস্য নাই, রুগ্ন, কৃশ, দুর্ব্বল গাভীগণে দুগ্ধ নাই, দেহে বল নাই, মনে স্ফূর্ত্তি নাই। আজ তোমার পিতার অক্ষয়কীর্ত্তি পুরন্দরের দীঘির ঘাটে প্রাতঃকালে সন্ধ্যা তর্পণ করিবার লোক দেখা যায় না। ব্রাহ্মণের শিখা নাই, তিলক নাই, যজ্ঞোপবীত ও গুপ্তভাবে অবস্থিত ভার স্বরূপ হইয়াছে। এখন আর হোমাগ্নির পবিত্র শিখা তরুপল্লবকে স্নিগ্ধ করে না। এখন আর ফুলের বাগান নাই, কোটালী পাড়ে প্রত্যহ লক্ষ শিব পূজার কথা এখন উপন্যাসে পরিণত হইয়াছে। তুলসী ও বিল্বদলের পবিত্রতা বিলুপ্ত হইয়াছে। পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধ অসভ্য বর্ব্বরোচিত কুসংস্কারে পরিণত হইয়াছে। এখন আর পাতিব্রত্যের অস্তিত্ব নাই, বিবাহবন্ধনচ্ছেদনের নিশিত ছুরিকা সমাজের বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়াছে। অসবর্ণা বিবাহ, বিধবা-বিবাহ প্রভৃতির প্রবল স্রোতে হিন্দুসমাজের অস্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। এখন ভারতে গৌরী, রোহিণী ও কন্যা * দানের ব্যবস্থা তিরোহিত হইয়াছে। এখন রাজকীয় বিধান অনুসারে প্রকারান্তরে রজস্বলা যুবতীর বিবাহের ব্যবস্থা হইয়াছে। মধুসূদন! মাতৃস্থানীয়,

---

* "অষ্টবর্ষা ভবেদ্‌গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী।
দশমে কন্যকা প্রোক্তা অতউর্দ্ধং রজস্বলা॥"

ভগিনীস্থানীয়, কন্যাস্থানীয় রমণীগণ নরপশুগণ কর্ত্তৃক ধর্ষিত, লাঞ্ছিত ও বলপূর্ব্বক গৃহীত হইয়া জাতীয় মর্য্যাদা হারাইতে বসিয়াছে। মধুসূদন! এখন একবার আসিয়া দেখ, ভারত নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। ভারতীয়গণ স্বাধীনতার নবোদিত গৌরব-রবির অরুণিমা লক্ষ্য করিতেছে, নূতন আশার মলয়-সমীরণ ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। গণতন্ত্ররূপ নবোদিত শারদ-সুধাংশুর বিমল শীতল কিরণে ভারতবর্ষ উদ্ভাসিত। ভারতের উন্নতির জন্য, ভাবিমঙ্গলের জন্য, প্রজাবর্গের সুখশান্তির জন্য, আজ আমাদের ভারত সম্রাট্ মুক্তহস্ত, কল্পতরু সাজিয়াছেন। সমগ্র ব্রিটিশ জাতি ভারতের ভবিষ্যৎ কল্যাণের উপায় নির্দ্ধারণের জন্য অহোরাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন। প্রধান মন্ত্রীগণ আহার নিদ্রাবর্জ্জিত হইয়া, রাজভক্ত ভারতীয় প্রজাবর্গকে উপযুক্ত পুরস্কার দিবার জন্য সম্রাটের অনুমতির অপেক্ষায় রহিয়াছেন। কিন্তু কাহারও গৃহে অন্ন নাই, উৎসব ও দেবার্চ্চনার ঘণ্টাধ্বনিও আইনের কঠোর শৃঙ্খলে আবদ্ধ। ভারতে নবযুগের প্রবর্ত্তনে স্ত্রীপুরুষের সমান অধিকার, রাজ্যশাসন, বিচারবিভাগ,রেলওয়ে, পোষ্টাফিস, পুলিশ, শিক্ষাবিভাগ, ওকালতী, ব্যারিষ্টারী, রাজকীয় ব্যবস্থাপরিষদ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি যাবতীয় অধিষ্ঠানে স্ত্রীপুরুষের সমান অধিকার। এখন আর স্ত্রীজাতির কবরী বন্ধন নাই, ললাটে সিন্দূরতিলক নাই, নয়নে অঞ্জনরাগ নাই, বিম্বাধরের মাধুর্য্য নাই, চরণ-পল্লবে অলক্তকরাগ নাই, প্রাচীন অসভ্যোচিত অবরোধপ্রথা ও অবগুণ্ঠন নাই। এখন ভারতীয়-ভদ্রমহিলাগণও উৎসবে, সভাসমিতিতে, অভিনয়ে, নৃত্য ও গীতে সভ্যজগতের আদর্শস্থানীয় হইয়াছেন। মধুসূদন! যোগীপুরুষ তুমি, ত্রিকালজ্ঞ তুমি, সংসারবিরক্ত ও শাস্ত্রজ্ঞ তুমি; ভ্রূভঙ্গী করিও না, আমার কথায় অবিশ্বাস করিও না, একবার চাহিয়া দেখ, তোমার মাতৃগণ, ভগিনীগণ স্বরাজলাভের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে রণচণ্ডীমূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়া ব্রিটিশ সিংহের কেশর আকর্ষণ করিতেছে। পুরুষের ন্যায় চশমা, কোট,

সার্ট, ছত্র ও পাদুকায় সুশোভিত হইয়া যুযুৎসুর বেশে স্ফীতবক্ষে নগর-মার্গে দলে দলে বিচরণ করিতেছে। মধুসূদন! ভারতের নির্ম্মল আকাশে নবোদিত স্বরাজ-সুধাংশুর বিমলকিরণ, ধনী, দরিদ্র, মূর্খ, পণ্ডিত, স্ত্রী, পুরুষ সকলকেই সমান অধিকার দিতে আহ্বান করিতেছে। এখন ভারতে সরস্বতীদেবীর বিবিধ উপচারে অর্চ্চনার আয়োজন হইতেছে। নাটক নভেলের স্রোতে দেশ ভাসিয়া যাইতেছে। ভারতীয় ললনাগণ "বীণারঞ্জিত পুস্তকহস্তে" ভারতীর প্রতিমূর্ত্তিরূপে অংশাবতাররূপে প্রতিগৃহে বিরাজমানা। সপত্নী সৌভাগ্যে অভিমানিনী ভারতলক্ষ্মী ভারত ছাড়িয়া ইউরোপের অধীশ্বরী হইয়াছেন। মধুসূদন! তুমি সূক্ষ্মযোগ-দৃষ্টিতে যাহা কল্পনা করিতে পার নাই, আজ সেই সুখ, সমৃদ্ধি ও আনন্দে ভারতের প্রতিগৃহ ভরপূর। ভারতে এখন অব্রাহ্মণ নাই, অস্পৃশ্য জাতি-সকলও ব্রাহ্মণ সাজিয়াছে। ভারতে এখন আর বর্ণাশ্রম বিভাগ নাই, ভারতীয় স্বরাজ আইনে তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে। সকলেই "হিন্দু" একজাতি, জাতিগত কোন উৎকর্ষ বা অপকর্ষ নাই। বোধ হয় যেন, ভগবান্ ব্রাহ্মণের প্রাধান্য রক্ষা করিবার জন্য ভারতের সমগ্র হিন্দুজাতিকে এক জাতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ জাতিতে পরিণত করিবার অভিলাষ করিয়াছেন।

মধুসূদন! এখন আর ভারতে জ্ঞানবৃদ্ধ বা বয়োবৃদ্ধ নাই। তোমার বয়সে আমাদের ২।৩ জন্ম কাটিয়া যায়। এখন জ্ঞানদৃষ্টি ও স্থূলদৃষ্টি উভয়ই বিলুপ্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে শতায়ু পুরুষও বিনা যন্ত্রসাহায্যে যুবকের ন্যায় দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন ছিলেন, এখন ১০।১২ বৎসর বয়সেই চশ্‌মার দরকার হয়। পূর্ব্বে অশীতিবর্ষেও পক্ককেশ ও দন্তশূন্য পুরুষ দেখা যায় নাই, এখন ২০।২৫ বৎসরেই পলিত কেশ, গলিত দন্ত মানবের সংখ্যাই অধিক। তোমাদের আমলে মানুষ বাঘের সহিত যুদ্ধ করিত, এখন মশককেও ভয় করে, মশক বিনাশের জন্য জাল নির্ম্মাণ করে। সদাচার-বিহীন, খাদ্যাখাদ্য-বিচারশূন্য, যথেচ্ছাচারী, নাস্তিক মানবগণ, অল্পায়ু ও

নানাবিধ নূতন নূতন রোগে আক্রান্ত ও দুর্ব্বল হইতেছে। সভ্যতার সহিত ভারতের নূতন অভ্যুদয়ের সঙ্গে দুর্ভিক্ষ, মহামারী অকালমৃত্যু ও দারিদ্র্য, ভারতে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। স্ত্রীজাতি ইন্দ্রিয়জয়ে অসমর্থ হইয়া গর্ভ নিরোধের উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক সৃষ্টি লোপ করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহারা এখন আর সন্তানকে স্তন্য দেয় না. পাকশালার ভার ব্রাহ্মণের উপর, পূজা ও পূজোপকরণ প্রস্তুতের ভার পূজারির উপর অর্পণ করিয়াছে। এখন ভারতীয় পণ্ডিতগণের মস্তিষ্ক—তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনায় বহির্মুখ, কর্ণ—শাস্ত্রোপদেশ গ্রহণে অনিচ্ছুক, চক্ষু—ভগবদ্রূপ দর্শনে বিমুখ, ঘ্রাণ—পুষ্পের গন্ধ গ্রহণে অনভিলাষী, রসনা—ভগবন্নাম সঙ্কীর্ত্তনে বীতস্পৃহ, ত্বক্—দেবতাও গুরুজনের চরণস্পর্শে বিরক্ত, হস্ত—জপমালার পরিবর্ত্তে চৌর্য্যবৃত্তি ধারণ করিয়াছে। বাগিন্দ্রিয়—পরকুৎসা কীর্ত্তনে রত ও ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে অনুৎসুক, রেল ও ষ্টীমার প্রভৃতি যান বাহনের কল্যাণে চরণও "আমীর" হইয়া বসিয়া আছে, এখন আর তীর্থ পর্য্যটন শক্তি নাই। স্বামী, স্ত্রী, পিতা, পুত্র ও সহোদর ভ্রাতাগণ নিজ নিজ স্বার্থের জন্য কেহ বা কাহাকেও হত্যা করিতেছে, অথবা ছল কিংবা চাতুর্য্যের আশ্রয় লইয়া প্রতিপক্ষভাবে রাজদ্বারে দণ্ডায়মান। আর অধিক কি বলিব, সকলই নূতন, সকলেই অকর্ম্মণ্য। মহাকালের তাণ্ডবলীলার সময় উপস্থিত, সকলেই ধ্বংসের মুখে চলিয়াছে।

মধুসূদন! তুমি দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য পালনপূর্ব্বক গুরু গৃহে অবস্থিত থাকিয়া যোগসিদ্ধ হইয়াছ, যাহার বলে সর্ব্বভূতে সমত্বজ্ঞান লাভ করিয়া ত্যাগের আদর্শস্থানীয় হইয়াছ, আর আমরা সৌভাগ্যক্রমে তোমার বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া বিনা ক্লেশে বিনা চেষ্টায় জন্মান্তর-সিদ্ধ যোগীর ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞানী ও ত্যাগের আদর্শস্থানীয় হইয়াছি। দেখ, আমরা বিধিনিষেধের অতীত, তোমাদের মাননীয় মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যকে ভস্মীভূত করিয়াছি, খাদ্যাখাদ্য বিচার নাই, পরস্ত্রী জ্ঞান নাই, পরধন বোধ নাই। "শুনি চৈব শ্বপাকে চ"

আমাদের তুল্য জ্ঞান জন্মিয়াছে, আমরা কুকুর লইয়া খেলা করি, কুকুরের সঙ্গে ভোজন ও শয়ন করি। অনুরাগ জন্মিলে যে কোন জাতির কন্যাকে সহধর্ম্মিণী করিতে পারি, আর ব্রহ্মজ্ঞানের বাকী কত বল দেখি ? আর আমরা কতবড় ত্যাগী একবার দেখ দেখি ! আমরা পৈতৃক সম্পত্তি শিখা, তিলক, যজ্ঞসূত্র ত্যাগ করিয়াছি, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ত্যাগ করিয়াছি, অতিথিসেবা, দেবসেবা, নিত্যকর্ম্ম—সন্ধ্যা, তর্পণ এবং দেবার্চ্চনা, জপ, হোম, পুরশ্চরণ ও শাস্ত্রবিশ্বাস, সকলই ত্যাগ করিয়াছি, ধন ও মান ত্যাগ করিয়াছি, আদালতের সাহায্যে দাম্পত্যবন্ধন ছিন্ন করিয়াছি, পিতা, মাতার শুশ্রূষা ও ভরণ পোষণ করা প্রভৃতি সকলই ত্যাগ করিয়াছি। এমন কি গুরুজনকে নমস্কার করা পর্য্যন্তও ত্যাগ করিয়াছি। পরোপকার, আত্মীয় স্বজন ও দীন-দরিদ্রের সাহায্য করা ত্যাগ করিয়াছি! পূর্ব্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত কুলদেবতার বিগ্রহ বিসর্জ্জন করিয়াছি। শিবলিঙ্গ ও শালগ্রাম শিলাকে জলগর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছি। এমনকি সহৃদয়-শ্লাঘ্য, পরম আদরের বস্তু 'গোঁফ'টীকেও অর্দ্ধেক রাখিয়া অর্দ্ধেক কামাইয়া ত্যাগের জলন্ত দৃষ্টান্ত দিয়াছি। ভ্রাতা ভগিনীকে নির্ব্বাসন করিয়াছি, খুড়ীমা, জেঠীমার কথাবলিবার অধিকার পর্য্যন্তও রহিত করিয়াছি। সত্যবাক্য, ন্যায়বিচার ও ধৈর্য্যকে প্রশান্ত মহাসাগরে ডুবাইয়া দিয়াছি। আর কত বলিব, ত্যাগের জলন্ত দৃষ্টান্ত আর কত দিব ? নিজমুখে ত্যাগশীলতার পরিচয় দিয়া আর আত্মশ্লাঘাজনিত পাপে লিপ্ত হইব না।

মধুসূদন ! তোমার দীর্ঘকাল কঠোর ক্লেশসাধ্য যোগসিদ্ধি, জ্ঞানৈশ্বর্য্য ও অদ্বৈতসিদ্ধির প্রয়োজনীয়তা আমরা উপলব্ধি করিতে পারি নাই, বা তাহার আবশ্যকতাও নাই। কারণ তুমি নিজেই বলিয়াছ—

"দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন"

তুমি একজন ধূর্ত্ত লম্পট কর্ত্তৃক দাসীকৃত হইয়াছ, এখন তোমার সেই দাসত্ব বা দাসীত্ব বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে, তুমি নিজেই লম্পট হইয়াছ, আর

আমরা এই রমণীয় বিশ্বপ্রপঞ্চের—স্থাবর জঙ্গমাত্মক চরাচর বিশ্বের দাসত্ব-শৃঙ্খলে চিরকাল আবদ্ধ রহিয়াছি, আমরা এই দৃঢ় বন্ধন-গ্রন্থি কখনও ছিন্ন করিব না। তুমি মাত্র একজনের দাস বা দাসী, আমরা সকলের দাস, একজন প্রভুর তুষ্টি সম্পাদন অপেক্ষা বহু প্রভুর মনজোগান কি অল্প যোগ্যতার পরিচায়ক !

মধুসূদন ! তুমি যে সুধাসমুদ্রে নিমগ্ন রহিয়া নিজেরই তৃপ্তিসাধন করিতেছ, ইহা তোমার নিতান্ত স্বার্থপরতা ! তুমি যে ব্রহ্মানন্দ-সাগরে ডুবিয়াছ তাহার একটুমাত্র কণা, এই অধঃপতিত, নির্য্যাতিত, রুগ্ন, দুর্ব্বল, অল্পায়ু, মূর্খ, আচারভ্রষ্ট বংশকে বিতরণ কর। তুমি ত কৃপণ নও, শ্রুতি বলিয়াছেন—

"য এতদক্ষরং অবিদিত্বা গার্গি প্রৈতি স কৃপণঃ"

যিনি এই অক্ষর পরমব্রহ্মকে না জানিয়া পরলোকে গমন করেন.তিনিই কৃপণ। তুমি ত সেই অক্ষরকে সম্যক্‌রূপে জানিয়াই মহাপ্রয়াণ করিয়াছ, তুমি কৃপণতা করিও না। তোমার বংশ কৃপণ নহে। হে অদ্বৈত-সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ! আমার শেষ প্রার্থনা এই ; সীতা লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন যে,"তুমি রামচন্দ্রকে বলিও—আমার দুর্ভাগ্য ও জন্মান্তরীয় দুষ্কৃতির ফলে রামচন্দ্রের মত সর্ব্বজনপ্রিয় এবং সর্ব্বগুণসম্পন্ন স্বামী লাভ করিয়াও বিনাকারণে হিংস্রজন্তু সমাকীর্ণ নির্জন কাননে নির্ব্বাসিত হইলাম, কিন্তু জন্মান্তরেও যেন তাঁহাকেই পতিরূপে প্রাপ্ত হই। তিনি রাজা, সুতরাং সহধর্ম্মিণীরূপে না হইলেও, সাধারণ প্রজার ন্যায়, দীন দরিদ্র নিরাশ্রয় তপস্বিনীর ন্যায় যেন আমাকে দর্শন করেন।" আমরাও বলি—হে মধুসূদন ! জ্ঞানসমুদ্র যাহার পরিখা, তুমি সেই অদ্বৈত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর। তুমি আমাদিগকে নিরাশ্রয়ভাবে কাম-ক্রোধাদি রিপুগণের নৃত্যভূমি অন্ধকারময় সংসার-কাননে ফেলিয়া অপার আনন্দৈশ্বর্য্য ভোগ করিতেছ, তুমি স্বয়ং হরি

সাজিয়াও নির্দ্দয় কেন? তোমার যদি নিজ বংশের প্রতি দয়া মমতা না থাকে, তথাপি অরুন্তুদ পাপ-তুষানলে দগ্ধ, ত্রিতাপ-দাবক্লিষ্ট সাধারণ জনের ন্যায় এই বংশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিও, তুমি আবার অংশরূপে শারদ-পূর্ণ-শশধরের ন্যায় এই ক্ষীরসাগর সদৃশ পবিত্র বংশে উদিত হও, হৃদয়াকাশের মালিন্য-মেঘ বিদূরিত করিয়া দেও। তোমার পিতৃবংশ উজ্জ্বল হউক, পুরন্দরের সুধাধবল কীর্ত্তিরাশি চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হউক, অদ্বৈত সিদ্ধান্তের বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীয়মান হউক, গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমের ন্যায় জ্ঞান ও ভক্তির পবিত্র ধারা ভারতকে প্লাবিত করুক, পুরন্দরের বংশে ব্রহ্মণ্য, শাস্ত্রনিষ্ঠা, সদাচার, ত্যাগশীলতা, তেজস্বিতা ও পরোপকারিতা প্রতিষ্ঠালাভ করুক। মধুসূদনের কৃপায় ভারতের ভূতবিকৃতি তিরোহিত হউক, স্বধর্ম্মনিষ্ঠা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও বর্ণাশ্রমের পবিত্রতা রক্ষা করিয়া ভারতের পঞ্চভূত মধুময় হউক।

মধুসূদন! বড় দুঃখের সহিত আবারও বলিতেছি যে, তুমি বড় স্বার্থপর। তুমি নিজে ভূমানন্দে মগ্ন হইয়া রহিয়াছ, কিন্তু বাস্তভূমিস্থিত এই বংশ-বিটপীকে রক্ষা করিবার জন্য কি একবিন্দুও কৃপাবারি সিঞ্চন করিয়াছ? অথবা আশীর্ব্বাদরূপ মৃৎকণা দ্বারাও কি তাহাকে বদ্ধমূল করিতে চেষ্টা করিয়াছ? ক্ষীরসাগরের ন্যায় নির্ম্মল যে পবিত্র বংশে লোকলোচন-লোভনীয় শারদ-শশধরের ন্যায় তুমি উৎপন্ন হইয়াছ; সেই বংশে আমার মত অকালকুষ্মাণ্ড যে জন্মগ্রহণ করিবে তাহা কি তুমি কখনও ভাবিয়াছ? বা জ্ঞানদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার কোন প্রতীকার করিয়াছ? এই বংশের প্রাধান্য ও গৌরব রক্ষা করিবার জন্য তুমি কিছুই কর নাই। তুমি শাস্ত্রজ্ঞ, তুমি জ্ঞানী, সুতরাং তুমি তাহা করিতেও পার না, ইহা সত্য। কেননা, তুমি বিধাতার নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পার না। তুমি নিশ্চয়ই ভাবিয়াছ, যাহাতে কৌস্তুভমণির ন্যায় উৎকৃষ্ট ও অমূল্য মণিরত্ন জন্মগ্রহণ করে, তাহাতে শুক্তি শম্বুকও জন্মিয়া

থাকে। যাহাতে পদ্ম ফোটে, তাহাতে শৈবালেরও উৎপত্তি হয়। সুতরাং, তোমাকে অনুযোগ করি না।

তুমি স্বপ্রকাশ, জ্যোতির্ম্ময় শিব বা বিষ্ণু হইয়াছ, তুমি আমাদিগকে উপেক্ষা করিতে পাঁর, কিন্তু তোমার নাম স্মরণ করিয়া আমরা পবিত্র, তোমার নাম উচ্চারণ করিয়া, তোমার কীর্ত্তিকাহিনী কীর্ত্তন করিয়া, আমাদের রসনা পবিত্র হইয়াছে, আমরা গৌরবান্বিত হইয়াছি, আমাদের বংশ লাভবান্ হইয়াছে। আমরা তোমাকে ভুলিতে পারিব না। কেননা—

"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা, বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপার-সম্বিৎ-সুখসাগরেঽস্মিন্ লীনং পরে ব্রহ্মণি যস্য চেতঃ" ॥

অর্থাৎ—অপার জ্ঞান-সুখের সাগর পরব্রহ্মে যাঁহার চিত্ত লীন হইয়াছে, তাহার দ্বারা কুল পবিত্র হয়, জননী কৃতার্থা হন, এবং বসুন্ধরা পুণ্যবতী হইয়া থাকেন। সুতরাং তোমার নিকট আর প্রার্থনীয় কিছুই নাই।

হে কাশ্যপবংশ ভাস্কর! তোমার জগদ্রক্ষক ও জগৎপ্রকাশক তেজোরাশিতে আমার বহুকালের সঞ্চিত ত্রিতাপরূপ ত্রিপত্র বিল্বপত্র কাম-হব্যে সিক্ত করিয়া, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যরূপ পঞ্চশস্যের সহিত তোমাতে আহুতি প্রদান করিলাম। আমার এই আহুতি তুমি পূর্ণাহুতিরূপে গ্রহণ কর। তোমাকে কোটি কোটি নমস্কার!

যজুর্ব্বেদীয় কাশ্যপ-বংশাবলী

প্রাচীন বংশলিপি। *

ওঁ নমঃ কুল দেবতায়ৈ।

পদ্মপুরাণে—

"কশ্যপাৎ কাশ্যপো জাতো ভরদ্বাজো বৃহস্পতেঃ।
স্বয়ং বাৎস্যশ্চ পুলহাৎ সাবর্ণির্গৌতমাত্তথা ॥১
শাণ্ডিল্যশ্চ রুচেঃ পুত্রোমুনিস্তেজস্বিনাং বরঃ।
বভূবুঃ পঞ্চগোত্রাশ্চ এতেষাং প্রবরোঽভবৎ ॥২
ব্রহ্মণো বদনোদ্ভূতা অন্যা ব্রাহ্মণজাতয়ঃ।
আস্থিতা দেশদেশেষু গোত্রশূন্যাশ্চ শৌনক ॥৩

পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে—কশ্যপ হইতে কাশ্যপ, বৃহস্পতি হইতে ভরদ্বাজ, পুলহ হইতে বাৎস্য, গোতম হইতে সাবর্ণি, রুচি হইতে তেজস্বিগণের শ্রেষ্ঠ শাণ্ডিল্য উৎপন্ন হইয়াছেন। ইহারা পঞ্চগোত্র নামে খ্যাত। ব্রহ্মার বদন হইতে উদ্ভূত অন্য ব্রাহ্মণ জাতি ইহাদের প্রবর। হে শৌনক! তাহারা গোত্র শূন্য হইয়া নানাদেশে অবস্থিত আছে ১।২।৩

---

* এই বংশলিপিখানি অত্যন্ত প্রাচীন। আগড়পাড়া প্রবাসী অদ্বিতীয় স্মার্ত্ত ৺নীলকান্ত তর্কবাগীশ মহাশয়ের গৃহে ইহা সুরক্ষিত ছিল। তাঁহার কৃতী পুত্র শ্রীমান্ কালীচরণ স্মৃতিপুরাণতীর্থ মহাশয় সদিচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া ইহা প্রদান করিয়াছেন। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, বহুগৃহেই গুপ্তধনের ন্যায় ইহা অপেক্ষাও বিস্তৃত বংশাবলী সুরক্ষিতভাবে অবস্থিত আছে। দুঃখের বিষয় বহু অনুসন্ধানেও তাহা পাওয়া গেল না।

তাম্রপট্টোপরি যুধিষ্ঠিরলেখো যথা—

রাজন্যাশ্চ বিশশ্চ বা কলিযুগে শূদ্রাশ্চ বাহন্বক্রমা-
দ্রাজানো ভবিতার এব যবনাশ্চাপীন্দ্রপ্রস্থেশ্বরাঃ।
কাঙ্ক্ষন্তঃ খলু লোকনির্বৃতি ফলং যে তেষু ধন্যা জনা
স্তে পশ্যন্তু বিচার্য্য মে লিপিমিমাং তাম্রস্য পট্টোপরি ॥৪
হে ভূপা! ভুবি ভাবিনঃ কলিযুগে ধর্ম্মাত্মজন্মাহস্ম্যহং
যুষ্মভ্যং বিনিবেদয়ামি রচয়ন্ মূর্দ্ধ্না নিবদ্ধাঞ্জলিঃ।
যদ্ গোত্রে ভবিতা কথাস্বিতি ভবিষ্যোক্তা প্রতিজ্ঞা হরে-
রস্তীত্যুক্তবশীকৃতোহস্মি যদহং পৌরাণিকৈঃ পণ্ডিতৈঃ ॥৫
এতজ্জন্মসুখং ন বৎসরশতাদপ্যুত্তরং কস্যচিৎ
শ্রেয়ঃ কিন্তু তদাচরন্তু সুধিয়ঃ! পারত্রিকং যদ্ ভবেৎ।
দত্ত্বা বেদবিদে যথা ফলমিতি শ্রুত্বান্যদত্তাং মহীং
হৃত্বা পাপচয়ং হি বেদবচনাদ্ যূয়ং সমাধাস্যথ ॥৬

তামারপাতে যুধিষ্ঠিরের লিপি যথা—

কলিযুগে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ এবং যবনেরা যথাক্রমে ইন্দ্রপ্রস্থের অধিপতি হইবেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা ধন্য, তাঁহারা প্রজাদিগের শান্তি কামনা করিবেন। সেই সকল রাজগণ বিচার করিয়া তামার পাতে লিখিত আমার এই লিপি অবলোকন করুন।৪

যাহারা ভবিষ্যতে এই পৃথিবীতে রাজা হইবেন, হে সেই সকল ভূপালগণ! আমি ধর্ম্মতনয় মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন করিয়া তোমাদিগকে নিবেদন করিতেছি যে, যে গোত্রে কথাই কবিতা হইবে ইহা ভবিষ্যপুরাণোক্ত নারায়ণের প্রতিজ্ঞা আছে। আমি পৌরাণিকপণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক এই উক্তি দ্বারা বশীকৃত হইয়াছি। ৫

ইহ জন্মের সুখ শত বৎসরের অধিক কাহারও থাকে না। অতএব

ভবিষ্যে—কশ্যপং প্রতি নারায়ণস্য তত্তপস্যাবশীকৃতস্যাজ্ঞা-শ্লোকদ্বয়ী যথা—

যদ্‌গোত্রে ভবিতা কথা সুকবিতা বিদ্যানবদ্যা সদা
সৌব্রহ্মণ্যমগণ্য পুণ্যসহিতং বন্ধেব বাগ্‌দেবতা।
কিংবান্যৎ কথয়ামি যত্র ভবিতুং কৃষ্ণোঽপি ধন্যঃ স্বয়ং
শ্যামঃ শ্রীমধুসূদনো যতিরহো ভূমৌ ভবিষ্যাম্যহম্ ॥৭
তাপস্যেন বশীচকার স চিরান্নারায়ণং কশ্যপঃ
শ্রীনারায়ণ ইত্যুবাচ তমৃষিং হে কশ্যপ! শ্রূয়তাম্।
পুত্রস্তে ভবিতাস্মি বামন ইতি ত্রেতাযুগে, দ্বাপরে
শ্রীকৃষ্ণো বসুদেবতঃ কুলভবাত্তৎকাশ্যপস্য ক্ষিতৌ ॥৮

হে পণ্ডিতগণ! যাহাতে পারত্রিক মঙ্গল হয়, আপনারা তাহার অনুষ্ঠান করুন। বেদবিদ্ ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করিলে যে ফল হয়, তাহা শ্রবণ করিয়া, অন্য প্রদত্ত ভূমিকে হরণ করিয়া যে ব্যক্তি পাপ সঞ্চয় করে, আপনারা বেদবাক্যানুসারে তাহার সমাধান করুন। ৬

ভবিষ্যপুরাণে কশ্যপের তপস্যা দ্বারা বশীকৃত নারায়ণের কশ্যপের প্রতি আদেশরূপ শ্লোকদ্বয় যথা—

যে গোত্রে কথাই সুকবিতা, সর্ব্বদা অনিন্দনীয় বিদ্যা, অগণনীয় পুণ্যের সহিত সুব্রাহ্মণত্ব এবং বাগ্‌দেবতা বশীভূতার ন্যায় হইবেন। অন্য আর কি বলিব, যে গোত্রে জন্মগ্রহণকরিবার জন্য স্বয়ং কৃষ্ণও ধন্য হইয়াছেন। বিস্ময়ের কথা এই যে, সেই গোত্রে আমি কৃষ্ণবর্ণ যতি মধুসূদনরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইব। ৭

কশ্যপঋষি দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যা করিয়া নারায়ণকে বশীভূত করিয়াছিলেন। ভগবান্ নারায়ণ সেই ঋষিকে বলিয়াছিলেন—হে কশ্যপ!

পূতা কাশ্যপিকা কুলঞ্চ সকলং যজ্জন্মমাত্রাদভূৎ,
শ্রীল শ্রীমধুসূদনঃ কলিযুগেত্বাচার্য্যপৌরন্দরিঃ।
এষা কাশ্যপিকৈব ভূমিরভবত্তত্রাপি কিঞ্চিৎ স্থলং
তদ্‌গোত্রপ্রভবায় যে দদতি ন ক্ষৌণীভুজঃ পামরাঃ ॥ ৯
তেষাং কা গতিরস্তি ভূমিমপহৃত্যান্যস্য দত্তাং পরৈ
শ্চৈবং সম্মতয়ো যথানিজমতং কুর্ব্বন্ত্বলং পল্লবৈঃ ॥১০
কাশীপ্রতীচ্যাং দিশি নর্ম্মদাখ্য-নদ্যুত্তরস্যাং পুরি বৈদিকানাম্।
কনৌজদেশেঽজনি কাশ্যপস্য বংশে গুণগ্রামনি রামমিশ্রঃ ॥১১

শ্রবণ কর। আমি ত্রেতাযুগে বামন নামে তোমার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইব, দ্বাপরযুগে তোমার পুত্র কাশ্যপের কুলে উৎপন্ন বসুদেব হইতে শ্রীকৃষ্ণ নামে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইব। ৮

যাঁহার জন্মমাত্রে পৃথিবী ও কাশ্যপ বংশ পবিত্র হইবে, সেই আমি কলিযুগে পুরন্দরাচার্য্যের পুত্ররূপে মধুসূদন নামে জন্মগ্রহণ করিব। এই অখণ্ড পৃথিবীমণ্ডল সমুদয়ই কশ্যপঋষির। সুতরাং যে রাজগণ এই পৃথিবীর কিয়দংশও কাশ্যপগোত্রোৎপন্ন ব্রাহ্মণকে দান না করেন, তাহারা নিতান্ত পাপিষ্ঠ।

পর কর্ত্তৃক প্রদত্ত অন্যের ভূমি যাহারা অপহরণ করে, তাহাদের কি গতি আছে? সাধুদিগের এই মত, তোমাদের যাহা মত তাহা কর, অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। ১০

৺কাশীধামের পশ্চিমে নর্ম্মদা নদীর উত্তর দিকে বৈদিকগণের আবাস-ভূমি কনৌজ দেশে অশেষ গুণগ্রামসম্পন্ন কাশ্যপবংশে রামমিশ্র নামে একজন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। ১১

প্রাচীমবেক্ষ্যারুণরোচিরাভাং স্নাত্বোপনীতাবধিজীবনান্তম।
যঃ স্থাপিতেঽগ্নৌ নিয়তং ন হুত্বা পপৌ ন পানীয়মপি ভ্রমেণ ॥১২
যথোচিতশ্রোত্রিয়মীহমানৈঃ স্বসেবিভির্ধার্ম্মিকরাজশূদ্রৈঃ।
নিবেদিতশ্চানয়তি স্ম কান্যকুব্জাচ্চ যং বঙ্গপ-বাদসাহঃ ॥১৩
তদ্‌বাদসাহেন করাগ্রহেণ তৎসন্নিধানগ্রহিলেন যত্নাৎ।
বিশ্রাণিতে খ্যাতসমুদ্রগৌরে শ্রীরামমিশ্রোবসতিঞ্চকার ॥১৪
ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরপূর্ণকীর্ত্তিঃ সুশিক্ষিতাশেষবিশেষশাস্ত্রঃ।
শ্রীমাধবেনোপনীতো বভূব যস্যাত্মজো মাধবনাম মিশ্রঃ ॥১৫
শ্রীমাধবাদপ্যজনি প্রধানো গুণৈরুদারৈর্বিদুষামুদারঃ।
গোপালমিশ্রঃ প্রচুরপ্রতিষ্ঠস্তপস্যয়া ব্যাসবশিষ্ঠকল্পঃ ॥১৬

যিনি উপনয়নকাল হইতে শেষ পর্য্যন্ত পূর্ব্বদিক্ অরুণরাগে রঞ্জিত দেখিয়া স্নান ও সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতেন এবং স্থাপিত অগ্নিতে নিয়ত হোম না করিয়া ভ্রমক্রমে জলপানও করেন নাই। ১২

উপযুক্ত শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ দর্শন করিয়া শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণসেবী শূদ্ররাজগণের নিবেদন অনুসারে বাঙ্গালাদেশে অবস্থিত বাদসাহ কর্ত্তৃক যিনি কান্যকুব্জ হইতে আনীত হইয়াছিলেন। ১৩

কর গ্রহণ না করিয়া, তাহার নিকট থাকিবার জন্য আগ্রহযুক্ত সেই বাদসাহ কর্ত্তৃক প্রদত্ত সমুদ্রগৌর (সমুদ্র গড়) নামক স্থানে শ্রীরাম মিশ্র বাস করিতে লাগিলেন। ১৪

ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল মধ্যে যাঁহার পূর্ণকীর্ত্তি বিরাজমান, যিনি নানাশাস্ত্রে বিশেষ-পারদর্শী ও শ্রীমাধব কর্ত্তৃক উপনীত, এইরূপ মাধবমিশ্র নামে যাঁহার পুত্র হইয়াছিল।১৫

শ্রীমাধবমিশ্র হইতে উদার গুণসম্পন্ন, পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রধান, উদারস্বভাব, প্রচুর প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন, তপস্যায় ব্যাস ও বশিষ্ঠ তুল্য গোপালমিশ্র নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ১৬

বিদ্যাবতামুত্তমকীর্ত্তিভাজাং যদ্বৈদিকানাং স পতির্গণেষু।
যথার্থনাম্না গণপত্যভিখ্যো গোপালমিশ্রস্য সুতস্ততোঽভূৎ ॥১৭
গণপতিঃ প্রথমং পরিপূজ্যতে সুমনসামিতি বেদবিদাং নয়ঃ।
নিয়মিতো বিদিতঃ প্রতিপূরুষৈর্গণপতাবিহ যন্ন স বিচ্যুতঃ ॥১৮
গুরু-কবি-দ্বিজরাজসমাযুতা সুমনসামপি বেদবিদাং সভা।
গণপতেরনধিষ্ঠিত-নিষ্ঠিতা ন পুরুষোত্তমসাধুসমাদৃতা ॥১৯
গণপতেঃ প্রণতিঃ প্রথমং ভবেৎ সুসমিতৌ স সমাজ-সভাসদাং।
বিফলমীদৃশমর্চ্চনমুচ্যতে বিবিধ-বেদবিদামিতিবার্ত্তিকং ॥ ২০
গণপতিঃ প্রথমং পরিপূজ্যতে ন পুরুষোত্তম ঈশ্বর এব বা।
গুণিগণোত্তমশীলবিশালিনাং গণপতেরধিকস্তদিহাস্তি কঃ ॥২১

উত্তম কীর্ত্তিসম্পন্ন, বিদ্বান্ বৈদিকগণের অধিপতি যথার্থ নামা গণপতি নামে এক মহাপুরুষ গোপালমিশ্রের পুত্ররূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ১৭

দেবতাদিগের মধ্যে গণেশই প্রথম পরিপূজিত হইয়া থাকেন, ইহা বেদবিৎ পণ্ডিতগণের ব্যবস্থাপিত নীতি। ইহা প্রত্যেক ব্যক্তিই অবগত আছেন, গণপতিমিশ্রেও সেই নিয়ম বিচ্যুত হয় নাই। ১৮

গণপতি কর্ত্তৃক অনধিষ্ঠিত দেবসভা যেরূপ বৃহস্পতি, শুক্র, চন্দ্র এবং পুরুষোত্তম কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইলেও শোভা প্রাপ্ত হয় না, সেইরূপ গণপতি মিশ্র যে সভায় অধিষ্ঠিত না হন, বেদবিৎ পুরুষশ্রেষ্ঠগণ কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইলেও সেই সভা শোভা প্রাপ্ত হয় না। ১৯

উৎকৃষ্ট সভাতে প্রথমেই গণপতির নমস্কার হইয়া থাকে। সমাজে ও সভাতে প্রথমে অন্য ব্যক্তির অর্চ্চনা বিফল, ইহা বহু বেদবিৎ পণ্ডিতের অভিমত। ২০

গণপতিই প্রথমে পূজিত হন, কিন্তু বিষ্ণু বা মহেশ্বর প্রথমে পূজিত হন না। উত্তম চরিত্র গুণিগণের মধ্যে গণপতির অধিক কে আছে? ২১

গুণার্ণবাচার্য্যমসূত নাম্না কৃষ্ণং তনূজং গণপত্যভিখ্যঃ।
গুণেন নাম্না নিজকর্ম্মণা চ পরং ক্ষিতৌ কৃষ্ণমিবাবতীর্ণং ॥২২
দিশোঽবতংসীকৃতবংশকীর্ত্তিঃ সুধানিধির্নাম গুণার্ণবাখ্যঃ।
সদা গুণগ্রামবিহারভূমৌ বংশেঽজনি শ্রীযুতকাশ্যপস্য ॥২৩
গম্ভীরিমা বিস্তরতাস্তি নিত্যং গুণেষু তস্যেতি গুণার্ণবোঽসৌ।
কোটালিপাটাগমনস্য হেতুমেতস্য চাত্রাবসরে বদামি ॥ ২৪
যদ্বাঙ্গলাবস্থিতবাদসাহ-পৌত্রঃ প্রতিষ্ঠানকবংশকেতুঃ।
অদৃষ্টপূর্ব্বামবলোক্য নৌকাস্তদর্থমত্যন্তকুতূহলোঽভূৎ ॥ ২৫
নৌকা ন বঙ্গেন বিনা তদাসীন্নৌকাবিহারস্পৃহয়ালুরেষঃ।
বঙ্গেষু নৌকা ঘটনার্থমিত্থং স বাদসাহো বদতি স্ম রাজ্ঞঃ ॥ ২৬

গণপতিমিশ্র, গুণ, নাম ও নিজ কর্ম্ম দ্বারা এই মহীমণ্ডলে কৃষ্ণের ন্যায় অবতীর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ গুণার্ণবাচার্য্য নামে একটী পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। ২২

যৎকর্ত্তৃক বংশের কীর্ত্তি দিঙ্মণ্ডলকে অলঙ্কৃত করিয়াছিল, সেই সুধানিধির ন্যায় গুণার্ণবাচার্য্য, গুণরাশির বিহারভূমি স্বরূপ শ্রীযুক্ত কাশ্যপের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ২৩

তাঁহার গুণসমূহের গভীরতা ও বিস্তৃততা ছিল বলিয়া তিনি গুণরাশির অর্ণব স্বরূপ গুণার্ণবাচার্য্য নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার কোটালিপাড়া আগমনের হেতু এই অবসরে বলিতেছি। ২৪

পাঠানবংশকেতু, বাঙ্গালায় অবস্থিত বাদসাহের পৌত্র, অদৃষ্টপূর্ব্ব নৌকা দর্শন করিয়া সেজন্য অত্যন্ত কুতূহলী হইলেন। ২৫

সেই সময়ে বঙ্গদেশ ভিন্ন অন্য স্থানে নৌকা ছিল না। তিনি নৌকা বিহারের জন্য অভিলাষী হইয়াছিলেন। সুতরাং বঙ্গদেশে এইরূপ নৌকা সংগ্রহের জন্য তিনি রাজাকে বলিলেন। ২৬

শ্রীবিক্রমাদিত্যপিতামহায় যশোহরং রাজ্যমদায়ি তেন।
আগত্য চানীয়ত তেন রাজ্ঞা গুণার্ণবাচার্য্য ইতঃ প্রযত্নাৎ ॥ ২৭

স তাম্রপট্টোপরি বৃত্তিলেখমালোক্য যৌধিষ্ঠিরমস্য তস্মৈ।
দত্ত্বা তদন্যূনতমাঞ্চ বৃত্তিং দদৌ চ সুল্‌তানপুরে নিবাসং ॥ ২৮

তস্মিন্নকস্মাদিহ বঙ্গদেশে সমাগতেঽশঙ্কি সমস্তসভ্যৈঃ।
অহো চিরস্য প্রধৃতভ্রমো বা মহেন্দ্রজালভ্রমসম্ভবো বা। ২৯

অসৌ স্বয়ং মূর্ত্তিমতী ধরায়াং কৃতাবতারেব সরস্বতী বা।
বাচস্পতির্বাবনিদর্শনেচ্ছু গুর্ণার্ণবাচার্য্যবরো নরো বা ॥ ৩০

অরণ্য-দস্যু-দ্বিপ-ভীতিশূন্যে মঘেন দুর্গম্যতমোপভূমৌ।
বিশেষতো বিজ্ঞনিবাসযোগ্যে সুলতানপুরাদেকতপাভিধানাৎ ॥৩১

সেই বাদসাহ শ্রীবিক্রমাদিত্যের পিতামহকে যশোহর রাজ্য দান করিলেন। সেই রাজা আগমন পূর্ব্বক যত্ন সহকারে গুণার্ণবাচার্য্যকে যশোহরে আনয়ন করিলেন। ২৭

তিনি তামার পাতের উপরি যুধিষ্ঠিরের বৃত্তিপত্র দর্শন করিয়া, গুণার্ণবাচার্য্যকে তদন্যূন বৃত্তি দান করিয়া সুলতানপুরে বাস করিবার স্থান প্রদান করিলেন। ২৮

গুণার্ণবাচার্য্য অকস্মাৎ বঙ্গদেশে আগমন করিলে, সমস্ত সভ্যবর্গের বিতর্ক উপস্থিত হইল। তাহারা ভাবিলেন, একি আমাদের দীর্ঘকাল সঞ্চিত ভ্রম, অথবা ইন্দ্রজাল। ২৯

পৃথিবীতে মূর্ত্তিমতী সরস্বতীই কি অবতার গ্রহণ করিয়াছেন? বৃহস্পতি কি পৃথিবীমণ্ডল পরিদর্শনের ইচ্ছা করিয়া আগমন করিয়াছেন? অথবা এই গুণার্ণবাচার্য্য কি মানুষ? ৩০

অধীত তর্কাগমধর্ম্মশাস্ত্রঃ কণ্ঠস্ফুরৎ সাঙ্গ-সমস্তবেদঃ।
গুণার্ণবাচার্য্যবরস্তদানীং কোটালিপাটে বসতিঞ্চকার ॥ ৩২
সৎকীর্ত্তিভাজো নিরবদ্যবিদ্যাঃ ষট্‌সূনবস্তস্য গুণার্ণবস্য।
তেষাং ত্রয়াণাং স্থিতসন্ততীনা মেকৈকশোবংশমুদাহরামি ॥ ৩৩
গুণার্ণবস্য প্রথমাত্মজোঽভূন্নাম্না জিতামিত্র ইতি প্রতীতঃ।
বদন্তি সর্ব্বে কবিরাজমেতমেতস্য সার্ব্বজ্ঞ্যমুদাহরামি ॥৩৪
স বক্তি সদ্যঃ সমুদীক্ষ্য বৃক্ষমিয়ন্তি পত্রাণি তরোরমুষ্য।
শাখাসুতানি ক্রমশো বিশিষ্য বক্রাণি পক্কাণ্যপরাণি চেতি ॥৩৫
স্ফুরন্তি যাবন্তি ফলান্তরালে তাবন্তি বীজান্যমৃষা বভাষে ॥
তেষাঞ্চ যাবন্ত্যুদিতাঙ্কুরাণি সূক্ষ্মাণি কুব্জান্যপরাণি চেতি ॥৩৬

যিনি তর্ক, আগম ও ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, যাঁহার কণ্ঠে সমস্ত সাঙ্গবেদ প্রকাশ পাইতেছে, সেই গুণার্ণবাচার্য্য সুলতানপুর হইতে অরণ্য, দস্যু ও হস্তিভয়শূন্য, মগদিগের দুর্গম্য স্থান, বিজ্ঞগণের বিশেষ বাসযোগ্য কোটালিপাড়ে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ৩১।৩২

সেই গুণার্ণবাচার্য্যের সৎকীর্ত্তিসম্পন্ন, অনিন্দনীয় বিদ্যাবান্ ছয়টী পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে যে তিনজনের সন্তান আছে, আমি এক একটী করিয়া তাহাদের বংশ কীর্ত্তন করিব। ৩৩

গুণার্ণবাচার্য্যের প্রথম পুত্র জিতামিত্র নামে প্রসিদ্ধ। লোকে তাঁহাকে কবিরাজ বলিত। ইঁহার সর্ব্বজ্ঞতা বিষয়ে কিছু বলিতেছি। ৩৪

তিনি একটী বৃক্ষ দেখিয়া—এই বৃক্ষটীর এত পাতা, এবং শাখা প্রশাখাগুলি ক্রমে বিশেষরূপে বলিয়া তাহার মধ্যে কতগুলি বক্র, কতগুলি শুষ্ক, কতগুলি পক্ক, কতগুলি সরল ও অপক্ক তাহা তৎক্ষণাৎ বলিতে পারিতেন। ৩৫

ফলের মধ্যে যতগুলি বীজ, তাহা সমস্তই তিনি যথার্থরূপে বলিতে পারিতেন। তাহার মধ্যে কতগুলির অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়াছে, কতগুলি সূক্ষ্ম, কুব্জ বা অন্যপ্রকার তাহাও বলিতে পারিতেন। ৩৬

আচার্য্যশেখর ইতি প্রথিতঃ পৃথিব্যামাসীদ্‌দ্বিতীয়তনয়োঽস্য
গুণার্ণবস্য।

আরুহ্য দোলাঞ্চরতঃ পুরস্তাদ্ধাবন্তি বশ্যাইব যস্য সভ্যাঃ ॥৩৭

তস্যাচার্য্যগুণার্ণবস্য তনয়ো জাতস্তৃতীয়স্ততো
বেদান্ত-শ্রুতি-ভারত-স্মৃতি-পুরাণ-ন্যায় বিদ্যোত্তমঃ।
শ্রীলাচার্য্যপুরন্দরোদ্বিজজুষাং বৃন্দারকেন্দ্রোপম-
স্তস্যাসীদ্বদনারবিন্দকুহরে বদ্ধেব বাগ্‌দেবতা ॥ ৩৮

ব্যাসং ভাগবতং মহর্ষিকপিলং যোগপ্রসিদ্ধাজনা
মার্কণ্ডেয় মুপাত্তবাল্যতপসং সূর্য্যং সভাধীশ্বরাঃ।
শ্রীলাচার্য্য-পুরন্দরং সুমতয়ঃ পশ্যন্তি বাচস্পতিং
কিন্তু স্পর্শমণীতি বৈদিককুলান্যেতং ক্ষিতৌ মেনিরে ॥ ৩৯

গুণার্ণবাচার্য্যের দ্বিতীয় পুত্র আচার্য্যশেখর নামে পৃথিবীতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি দোলাতে আরোহণ করিয়া যখন গমন করিতেন, তখন সভ্যবর্গ বশীভূত ব্যক্তির ন্যায় তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিত। ৩৭

সেই গুণার্ণবাচার্য্যের তৃতীয় পুত্র পুরন্দরাচার্য্য নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বেদ, বেদান্ত, মহাভারত, স্মৃতি, পুরাণ ও ন্যায়শাস্ত্রে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। দেবতাগণের মধ্যে ইন্দ্রের ন্যায় ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও তিনি শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বদন-পদ্মের বিবরে বাগ্‌দেবতা যেন আবদ্ধ হইয়াছিলেন। ৩৮

যোগসিদ্ধ ব্যক্তিগণ পুরন্দরাচার্য্যকে ভগবদ্‌ভক্ত ব্যাস ও মহর্ষি কপিলের ন্যায় মনে করিতেন এবং বাল্যকাল হইতে তপশ্চর্য্যাহেতুক মার্কণ্ডেয়ের ন্যায় মনে করিতেন। সভাপতিগণ তাঁহাকে সূর্য্যের ন্যায়,

ষট্ সূনবস্তস্য বভূবুরেষামাচার্য্যচূড়ামণিরাদিভূতঃ।
নেমুর্ন কে বা তমনল্পকীর্ত্তিং ধর্ম্মৈকনিষ্ঠাসু বশিষ্ঠকল্পং ॥ ৪০
পুরন্দরাচার্য্যসুতস্ততোঽভূন্ন্যায়োত্তরাচার্য্য ইতি দ্বিতীয়ঃ।
বেদান্তসিদ্ধান্ত-নিতান্তদক্ষো বৈশেষিকাশেষবিশেষবিজ্ঞঃ ॥৪১
ধর্ম্মৈকতানো যশসা বিশালো মৈমাংসিকোঽলঙ্করণপ্রবীরঃ।
কৌমার-সারস্বত-পাণিনিজ্ঞঃ স্মৃতিপ্রচারঃ প্রচুরপ্রতিষ্ঠঃ ॥ ৪২
তস্যানুজঃ শ্রীমধুসূদনাখ্য-সরস্বতী বিশ্ববিসারিকীর্ত্তিঃ।
অপূর্ণবাল্যার্জ্জিতপূর্ণবিদ্যঃ পুরন্দরাচার্য্যতৃতীয়পুত্রঃ ॥ ৪৩
বাগীশগোস্বাম্যনুজোঽস্য জাতঃ পুরন্দরাচার্য্যচতুর্থপুত্রঃ।
বাগীশনামেতি যথার্থনাম্না গণো গুণানামিব লব্ধকীর্ত্তিঃ ৪৪ ॥

বুদ্ধিমান্ গণ বৃহস্পতির ন্যায় ও বৈদিকসমাজ পৃথিবীতে তাহাকে স্পর্শমণি বলিয়া মনে করিতেন। ৩৯

পুরন্দরাচার্য্যের ছয়টী পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তন্মধ্যে আচার্য্য চূড়ামণিই সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন। সমধিক-কীর্ত্তিসম্পন্ন ধর্ম্মনিষ্ঠায় বশিষ্ঠকল্প তাঁহাকে কোন্ ব্যক্তি নমস্কার না করিত? ৪০

পুরন্দরাচার্য্যের দ্বিতীয় পুত্র যাদবানন্দ ন্যায়াচার্য্য। ইনি বেদান্ত সিদ্ধান্তে বিশেষ কুশল ও বৈশেষিক শাস্ত্রে অত্যন্ত অভিজ্ঞ ছিলেন। ৪১

তিনি ধর্ম্ম বিষয়ে একাগ্র, অত্যন্ত যশস্বী, মীমাংসাশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ও অলঙ্কার শাস্ত্রে প্রবীণ ছিলেন। কলাপ, সারস্বত ও পাণিনি ব্যাকরণে তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। স্মৃতিশাস্ত্রের প্রচার দ্বারা তিনি বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। ৪২

তাঁহার কনিষ্ঠ অর্থাৎ পুরন্দরাচার্য্যের তৃতীয় পুত্র বিশ্ববিশ্রুতকীর্ত্তি মধুসূদন সরস্বতী। তিনি বাল্যকাল উত্তীর্ণ না হইতেই পূর্ণবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন। ৪৩

মধুসূদন সরস্বতীর কনিষ্ঠ গুণরাশির আশ্রয়, লব্ধকীর্ত্তি, বাগীশশব্দের

অথ মধুসূদনসরস্বতীতিহাসঃ।

যঃ সংসারে বিধৃতবিরতি র্যাতগঙ্গাসমীপঃ
সিদ্ধিঃ সাক্ষাদিব মধুমতী যস্য পাদৌ নিষেবে।
যং বীক্ষন্তে গতদলতরোরস্তি মূলে দিবেতি
রাত্রৌ স্বর্গপ্রতিমনগরে রাজতীতি প্রতীতিঃ॥ ৪৫
অসৌ তৃতীয়াশ্রমমাত্রসেবী অস্য প্রতিষ্ঠাঽবসরে বিবেচ্যা।
অতঃপরং শ্রীমধুসূদনাখ্য-সরস্বতীমস্করিণো মহিম্নঃ॥ ৪৬
সরস্বতী বেত্তি নবা সমস্তামুৎকীর্ত্তয়িষ্যাম্যহমস্য কিঞ্চিৎ।
রাজস্বশূন্যীকরণায় ভূমেঃ কালে কদাচিৎ সহ পুত্রবর্গৈঃ॥ ৪৭
ইষূপভূমীপতি রাজধানীং পুরন্দরাচার্য্যকৃতী জগাম।
শ্রীবাকলাধিষ্ঠিতনায়কস্য তদা গতানেকসভাসদোঽস্য॥ ৪৮

অন্বর্থযুক্ত বাগীশগোস্বামী নামে পুরন্দরাচার্য্যের চতুর্থ পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। ৪৪

মধুসূদন সরস্বতীর ইতিহাস।

যিনি সংসারে বিরক্ত হইয়া গঙ্গা সমীপে গমন করিয়াছিলেন। সাক্ষাৎ সিদ্ধির ন্যায় মধুমতী যাঁহার পদসেবা করিয়াছিলেন। দিবাভাগে বিগলিত পত্র বৃক্ষের মূলদেশে লোক সকল যাহাকে দেখিতে পাইত, এবং রাত্রি-কালে স্বর্গতুল্য নগরে যেন তিনি প্রকাশ পাইতেছেন বলিয়া মনে হইত। ৪৫

তিনি কেবল তৃতীয়আশ্রম বাণপ্রস্থাবলম্বী ছিলেন। ইঁহার প্রতিষ্ঠা অবসরক্রমে বলিব। ইহার পরে দণ্ডী মধুসূদন সরস্বতীর মহিমা কিছু কীর্ত্তন করিব। ইঁহার সমুদয় মহিমা সরস্বতীও জানেন কিনা সন্দেহ।

তস্যাগ্রতঃ শ্রীমধুসূদনাখ্য-সরস্বতী কাব্যচয়ঞ্চকার।
পরং চমৎকারি সদর্থশোভং তৎকাব্যমাকর্ণ্য সভাপতীনাং ॥ ৪৯
বিদ্যাবতামপ্রতিভামবেক্ষ্য নৃপঃ স তূষ্ণীমতিবিস্মিতোঽভূৎ।
যদাললম্বে নৃপ এষ মৌন মনাদৃতোঽস্মীত্যমুনেত্যবৈতি ॥ ৫০
ইতি ভ্রমেণৈব তদৈব গত্বা বিরাগভাগ্ বিংশতিবৎসরেঽভূৎ।
বিশ্বেশ্বরানন্দসরস্বতীতো জগ্রাহ গঙ্গাপুলিনে স দণ্ডং ॥৫১
সন্ন্যাসবান্সুৎকলদেশমেষ যযৌ জগন্নাথবিরাজমানং।
সমুদ্রতীরে বিপিনে বিবিক্তে চক্রে নিরাহারমসৌ তপস্যাং ॥ ৫২

কোন সময়ে কৃতী পুরন্দরাচার্য্য পুত্রগণের সহিত রাজস্ব রহিত করিবার জন্য চন্দ্রদ্বীপাধিপতির রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বাকলাধিপতির সভায় অনেক সভাসদ্ পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। ৪৬।৪৭।৪৮

শ্রীমধুসূদন সরস্বতী বাকলাধিপতির সমীপে অত্যন্ত চমৎকার, সদর্থ-দ্বারা শোভান্বিত অনেকগুলি কবিতা রচনা করিলেন। তাহা শুনিয়া বিদ্বান্ সভাপতিগণ হতপ্রভ হইলেন। তাহা দেখিয়া সেই রাজা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। (রাজা মনে করিলেন, এইরূপ অসাধারণ পণ্ডিতকে কি দিয়া পুরস্কৃত করিব)। রাজা যখন মৌনাবলম্বন করিলেন, তখন মধুসূদন মনে করিলেন, রাজা কর্ত্তৃক আমি অনাদৃত হইলাম। ৪৯।৫০

এইরূপ ভ্রমবশতঃ বিংশতিবর্ষ বয়সে বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া সেই সময়েই কাশীতে গঙ্গাতীরে গমন করিয়া বিশ্বেশ্বরানন্দ সরস্বতীর নিকট হইতে দণ্ড গ্রহণ করিলেন। ৫১

তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া যেখানে জগন্নাথদেব বিরাজমান আছেন,

এবং ক্রমেণৈব সমুদ্রতীরে সমুদ্র-শীতদ্যুতি-সংখ্যবর্ষে।
যাতে যতেরস্য বভূব সিদ্ধিরুপস্থিতা হস্ততলেঽণিমাদিঃ ॥ ৫৩
ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমস্য লবণাকূপারতীরোদরে
কান্তারে সমুপাসতে নিরুপমং তং সিদ্ধয়ঃ সর্ব্বদা।
ইত্যাকর্ণ্য মুকুন্দদেবনৃপতিস্তং দ্রষ্টুমত্রাগতঃ
কান্তারং পরিতো বিচর্য্য বিজনে কঞ্চিৎ সমালোকত ॥ ৫৪
বিষ্ণুধ্যান-নিবেশিতৈকহৃদয়ং যোগাসনাসীনকং
বাহ্যজ্ঞাননিবর্ত্তমানমনসং নিস্পন্দমানাঙ্গকং।
বল্মীকোদ্ধৃতমৃত্তিকাবৃত-ককুৎপর্য্যন্তমম্ভোধরৈ
রুদ্গীর্ণাভিরতীববৃষ্টিভিরপি ত্যক্তক্ষণোন্মীলনং ॥ ৫৫

সেই উৎকল দেশে গমন করিলেন। তথায় সমুদ্রতীরে নির্জন অরণ্যে নিরাহার হইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। ৫২

এইরূপে সেই সমুদ্রতীরে তপস্যায় ১৭ সতর বৎসর অতীত হইলে, এই সন্ন্যাসীর হস্ত মধ্যে অণিমাদি সিদ্ধি উপস্থিত হইল। ৫৩

পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে লবণসমুদ্রের তীরে নির্জন স্থানে সেই সন্ন্যাসীকে অণিমাদি সিদ্ধি সকল সর্ব্বদা উপাসনা করিতে লাগিল। ইহা শুনিয়া উৎকলদেশের অধীশ্বর রাজা মুকুন্দদেব তাঁহাকে দেখিবার জন্য সেই স্থানে আগমন করিলেন। সেই নির্জন অরণ্যে অতি দুর্গমস্থান সকল বিচরণ করিয়া তিনি একজন সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইলেন। ৫৪

তিনি যোগাসনে উপবিষ্ট, তাঁহার চিত্ত বিষ্ণুর ধ্যানে নিবিষ্ট, তাঁহার মন বাহ্যজ্ঞান শূন্য, তাঁহার অঙ্গ সকল নিস্পন্দ, বল্মীকমৃত্তিকা দ্বারা তাঁহার অংসদেশ পর্য্যন্ত আবৃত। জলধর কর্ত্তৃক উদ্গীর্ণ প্রবল বৃষ্টিপাতেও তাঁহার চক্ষু ক্ষণকালের জন্য উন্মীলিত হয় না। ৫৫

শ্রীমন্নারায়ণচরণয়োর্ধ্যানকালে বিহঙ্গা
বাহুদ্বন্দ্বোপরি নয়নয়োরম্বুবিন্দুং পিবন্তি।
অত্যুদ্দামদ্যুতিরপি রবিঃ সর্ব্বতেজোঽভিভাবী
নান্তর্জ্যোতির্লঘয়িতুমলং যস্য মূর্দ্ধ্নি স্থিতোঽপি ॥ ৫৬
বালঃ কালোপদেশাদিব ন স বুবুধে হতঃ পরং কৌতুকী স-
ন্নেবং দৃষ্ট্বাপি তস্থাবথ বিদিতুমনা রাত্রিবৃত্তান্তমস্য।
রাত্রেরারম্ভমাত্রে সমুদয়তি যথা কোটিসূর্য্যপ্রকাশং
জ্যোতিস্তম্ভং ধরায়ামিব খনিতমিদং পুষ্করস্পর্শিশীর্ষং ॥ ৫৭
তে তে নারদ-তুম্বুরুপ্রভৃতয়ো গন্ধর্ব্ববর্গাবৃতাঃ
ষড়্জাদীনুপবীণয়ন্ত্যতিকলং নৈপুণ্য-বিজ্ঞপ্তয়ে।
সংনৃত্যন্তি নিরন্তরং নিরুপমং তে কিন্নরাণাং গণা
ব্রহ্মা বেদপদানি গানসহিতান্যুদ্দাম মুদ্গায়তি ॥ ৫৮

তিনি যখন নারায়ণের ধ্যান করেন, তখন বিহঙ্গম সকল তাঁহার বাহুযুগ্মে নিপতিত আনন্দজনিত নয়নবারি পান করিয়া থাকে। প্রচণ্ড-কিরণসম্পন্ন সকল তেজের অভিভবকারী সূর্য্যদেব যাঁহার মস্তকোপরি অবস্থিত হইয়াও আভ্যন্তরীণ তেজকে লঘু করিতে সমর্থ হন নাই। ৫৬

কালের উপদেশ হেতুক বালকের ন্যায় রাজা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। এজন্য অত্যন্ত কুতূহলী হইয়া ইঁহার রাত্রি বৃত্তান্ত জানিবার জন্য সেই স্থানে অবস্থান করিলেন। তিনি দেখিলেন, রাত্রির প্রারম্ভেই যেন কোটি সূর্য্য উদিত হইয়াছে, জ্যোতিঃ স্তম্ভ যেন পৃথিবীতে খনিত হইয়াছে, তাঁহার শিরোদেশ যেন আকাশ স্পর্শ করিয়াছে। ৫৭

তখন গন্ধর্ব্ববর্গের সহিত মিলিত হইয়া নারদ, তুম্বুরু প্রভৃতি দেব-

ধাতা বিশ্ববিধান-নির্ভরতর-ব্যাপারবান্মুৎসুক-
স্তস্যাগ্রে বিনিবেদয়ত্যবিরতং ব্যক্তাভিরামাক্ষরং।
পশ্য শ্রীমধুসূদনাস্য ভবতো হস্তেঽস্তি সিদ্ধিঃ স্বয়ং
নাসাধ্যং তপসোঽস্তি কিঞ্চিদপি তেন প্রাপ্তশেষঞ্চ তে॥ ৫৯
তত্ত্বজ্ঞানমপাস্তকর্ম্মনিচয়ং নিষ্পীতহৃদ্‌গ্রন্থিকং
দুঃখাত্যন্তনিবৃত্তি-মুক্তিফলকং তৎকার্য্যমুৎপাদিতং।
নিষ্পন্নেষু ফলেষু তার্কিকতমান্নাস্তি স্পৃহেতি শ্রুতং
যোগাভ্যাসপরিশ্রমেণ ভবতে কিং সাম্প্রতং দাস্যতে॥ ৬০

গায়কগণ নিজ নিজ শিক্ষানৈপুণ্য প্রচারের জন্য ষড়্‌জ প্রভৃতি স্বরে অতি মধুর বীণা বাজাইতে লাগিলেন। কিন্নরগণ নিরন্তর অনুপম নৃত্য করিতে লাগিল, ব্রহ্মা গানের সহিত বেদপদ সকল অতি উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। ৫৮

বিশ্বের বিধান কার্য্যে নিরন্তর আসক্ত বিধাতা অত্যন্ত উৎসুক হইয়া তাঁহার নিকটে স্পষ্ট ও মনোজ্ঞ বাক্যে নিবেদন করিলেন, হে মধুসূদন! দেখ তোমার হস্তে সিদ্ধি স্বয়ং বর্ত্তমান রহিয়াছে। তপস্যার অসাধ্য কিছুই নাই, সেই জন্য তুমি তপস্যার চরম ফল লাভ করিয়াছ। ৫৯

নিখিল কর্ম্মরাশিকে ক্ষয় করিয়া, হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন করিয়া, দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিরূপ মুক্তির জনক তত্ত্বজ্ঞান তোমার উৎপন্ন হইয়াছে। যোগের অভ্যাস জনিত পরিশ্রম হেতুক তত্ত্বজ্ঞানরূপ ফল নিষ্পন্ন হইলে কোন আকাঙ্ক্ষা থাকে না, ইহা পণ্ডিতগণের নিকট শুনিয়াছি, অতএব সম্প্রতি তোমাকে কি দিব? ৬০

দূরাদস্য মুকুন্দদেবনৃপতেরেবং কথাং শৃণ্বত-
শ্চিত্তং কৌতুকি বৃত্তমস্য নিকটে নির্যাতু মুৎকণ্ঠয়া।
গত্বা তেন নিরীক্ষিতা যদি তদা তং বীক্ষ্য সত্বশ্চ তে
সাক্ষাৎ পুষ্করবর্ত্ম নৈব লবণাকূপারপারং যযুঃ ॥ ৬১
ইত্যাশ্চর্য্যময়ং বিলোক্য সকলং তৎকার্য্যমস্যাগ্রতো
মেদিন্যাং নিপপাত দণ্ডবদয়ং তং নন্তুকামস্ততঃ।
যত্তস্মৈ প্রণিপাতপূর্ব্বকমসৌ প্রষ্টুং যদাত্মা তদা
জ্ঞাত্বান্তর্গতিবৃত্তমস্য পুরত স্তস্মৈ বভাষে যতিঃ ॥ ৬২
পাঠানঃ সমুদার-বীর-নিকুরুম্বেষু প্রধানোঽচিরাৎ
কালাপাঢ় ইহাগমিষ্যতি পরং রাজ্যঞ্চ তে নেষ্যতি।
দেবঃ শ্রীপুরুষোত্তমোঽপি বিমুখীভাবং ত্বয়ি প্রাপ্তবান্
ন স্থাতেহ দিনৈকমপ্যহমিতো গচ্ছামি বারাণসীং ॥ ৬৩

দূর হইতে রাজা মুকুন্দদেব এই কথা শ্রবণ করিলে, তাহার চিত্ত মধুসূদনের নিকট যাইবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইল। তিনি সেইখানে গমন করিয়া যখন নিরীক্ষণ করিলেন, তখন তাহাকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ দেবগণ আকাশপথে সমুদ্রপারে গমন করিলেন। ৬১

এইরূপ আশ্চর্য্য জনক কার্য্য সকল দর্শন করিয়া তিনি নমস্কার করিতে অভিলাষী হইয়া তাঁহার নিকটে ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। কিছু জিজ্ঞাসা করিবার জন্য যখন তাঁহার মনের অভিলাষ হইল, তখন তাঁহার মনের ভাব অবগত হইয়া যতি মধুসূদন তাহাকে বলিতে লাগিলেন। ৬২

অত্যন্ত বলবান্ বীর সমূহের মধ্যে প্রধান "কালাপাহাড়" নামে এক পাঠান শীঘ্রই এখানে আগমন করিবে, পরে তোমার রাজ্যও গ্রহণ করিবে।

ইত্যুক্ত্বৈব জহৌ সমাধিমসকৌ স্নাত্বৈব বারাংনিধৌ
মার্কণ্ডেয়হ্রদে চ বীক্ষ্য বিরজাং নত্বা বটঞ্চাক্ষয়ং।
গত্বা শ্রীপুরুষোত্তমস্য পুরতঃ স্তোত্রেণ তং তোষয়ং-
শ্চক্রে ভূরিতরুপ্রদক্ষিণময়ং কাশীপ্রয়াণোৎসুকঃ॥ ৬৪
নত্বা শ্রীপুরুষোত্তমং তদবধি ক্ষৌণৌ পতন্ দণ্ডবৎ
কাশীং যাবদসৌ জগাম প্রণমন্ বিশ্বেশ্বরং চিন্তয়ন্।
পন্থানং সমসূত্রয়ন্নিব চলন্ জ্ঞানামৃতৈকাশনঃ
কান্তারেষু নদীজলেষু চ জহৌ দণ্ডপ্রণামং ন যঃ॥ ৬৫
স্বহস্তবিন্যস্ত-সমস্তসিদ্ধিঃ কাশীং সমায়াত ইদং নিশম্য।
উৎকণ্ঠিতোঽভূত্তদবেক্ষণায় দিল্লীশ একাব্বরবাদসাহঃ॥ ৬৬

শ্রীপুরুষোত্তম দেব ও তোমার প্রতি বিমুখ হইবেন। আমি এখানে আর একদিনও থাকিব না। এই স্থান হইতেই বারাণসী গমন করিব। ৬৩

কাশীধাম গমনেচ্ছু মধুসূদন ইহা বলিয়াই সমাধি ভঙ্গ করিয়া সমুদ্রে স্নান করিলেন। অনন্তর মার্কণ্ডের হ্রদে বিরজাকে দর্শন করিয়া অক্ষয় বটকে নমস্কার করিলেন। পরে শ্রীপুরুষোত্তম দেবের নিকট গমন করিয়া স্তোত্রদ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করতঃ তরুসমূহকে প্রদক্ষিণ করিলেন। ৬৪

শ্রীপুরুষোত্তমদেবকে নমস্কার পূর্ব্বক পুরুষোত্তমক্ষেত্র হইতে কাশী পর্য্যন্ত সমসূত্রপাতে ভূমিতে পতিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে করিতে বিশ্বেশ্বরকে চিন্তা করতঃ একমাত্র জ্ঞানামৃত পান করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। অতি দুর্গম পথ এবং নদীজলেতেও তিনি দণ্ডবৎ প্রণাম পরিত্যাগ করেন নাই। ৬৫

সমস্ত সিদ্ধি করতলগত করিয়া মধুসূদন সরস্বতী কাশীতে আসিয়াছেন,

তমিন্দ্রপ্রস্থে দ্রুতমানয়েতি জিলীপদারান্ বিসসর্জ্জ কাশ্যাম্।
সমেত্য কাশ্যাং দশবাসরেণ সন্ন্যাসিরূপং তমলোকয়ংস্তে ॥ ৬৭

শ্রীবৎসবক্ষাঃ সহ কৌস্তুভেন লক্ষ্মীসরস্বত্যুপসেব্যমানঃ।
স শঙ্খচক্রাব্জগদাধরোঽভূত্তং বিস্মিতাবাক্ষ্য বভূবুরেতে ॥ ৬৮

তমিন্দ্রপ্রস্থং প্রতি সঞ্চরেতি তমূচুরেতে যদি তত্তদানীং
পুরং দহন্তং পুরতোহুতাশং দদর্শ চৈকাব্বরবাদসাহঃ ॥ ৬৯

দদর্শ তত্রাপি স কৃষ্ণবর্ণমেকং যতিং মুষ্টিনিবদ্ধযষ্টিং।
যষ্ট্যা তয়াগ্নৌ সকলং বিভজ্য প্রাচীরপাষাণমপি ক্ষিপন্তং ॥ ৭০

ইহা শ্রবণ করিয়া, দিল্লীশ্বর আকবর বাদসাহ তাঁহাকে দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইলেন। ৬৬

"তাঁহাকে শীঘ্রই আনয়ন কর" এই কথা বলিয়া আকবর বাদসাহ রমণীগণকে কাশীতে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা দশ দিনে কাশীতে উপস্থিত হইয়া সন্ন্যাসীরূপী মধুসূদনকে দর্শন করিলেন। ৬৭

কৌস্তুভমণির সহিত শ্রীবৎস লাঞ্ছিত বক্ষঃস্থল, লক্ষ্মী ও সরস্বতী কর্ত্তৃক পরিসেবিত, শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারী মধুসূদনকে দর্শন করিয়া তাঁহারা বিস্মিত হইলেন। ৬৮

"আপনি ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করুন" তাঁহারা মধুসূদনকে এই কথা বলিলেন। সেই সময়ে দিল্লীশ্বর আকবর বাদসাহ দেখিতে পাইলেন, তাঁহার সমস্ত পুরী হুতাশন দগ্ধ করিতেছে। ৬৯

তিনি সেই অগ্নির মধ্যে দেখিতে পাইলেন, কৃষ্ণবর্ণ এক যতি, তাঁহার হস্ত মুষ্টির মধ্যে একখানি যষ্টি রহিয়াছে। তিনি যষ্টি দ্বারা প্রাচীরস্থ পাষাণগুলিকে বিভক্ত করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতেছেন। ৭০

কিমেতদিত্যদ্ভুতমীক্ষমাণং তং বিস্মিতান্তঃকরণং বভাষে।
সদ্যঃ স্ফুরদ্বস্তুবিচারসারঃ কুশাগ্রধীস্তোড়লমল্লভূপঃ ॥ ৭১
আল্লোপমেয়স্য সমস্ত সেল্‌মৎ সন্ন্যাসিন স্তস্য চরিত্রমেতৎ।
কাশীগমেকং বিনিযুঙ্ক্ষ্ব কাশ্যাং ন তং যতিং সাম্প্রতমানয়েতি ॥ ৭২
তস্মিন্ প্রয়াতে সতি সোঽপি কৃষ্ণবর্ণো যতি র্মুষ্টিনির্বিষ্টযষ্টিঃ।
প্রাচীরপাষাণবিভঞ্জনেভ্যঃ সাকং শশাম জ্বলতানলেন ॥ ৭৩
শ্রীন্যায়আচার্য্য মহামহিম্নঃ ষট্‌সূনবঃ খ্যাতগুণা বভূবুঃ।
যে হেলয়োত্তীর্ণ-সমস্তশাস্ত্রসমুদ্রপারা ধৃতপুণ্যভারাঃ ॥ ৭৪
আদ্যো যেষাং রামভদ্রাবতারঃ খ্যাতঃ প্রায়শ্চক্রবর্ত্তীতি লোকে।
নানাবিদ্যৈকান্তবিশ্রামধামা পুণ্যাধানং রামভদ্রেতিনামা ॥ ৭৫

ইহা কি আশ্চর্য্য ইহা মনে করিয়া বিস্মিতান্তঃকরণ বাদসাহ সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার সকল দর্শন করিতেছিলেন। যাহার সদ্বিচার বুদ্ধি সদ্যঃই প্রকাশ পায়, সেই কুশাগ্রবুদ্ধি তোড়লমল্ল নরপতি তখন বাদসাহকে বলিতে লাগিলেন। ৭১

দিল্লীশ্বর! আল্লার তুল্য সেই সন্ন্যাসীর এই সকল অদ্ভুত চরিত্র। অতএব কাশীতে কোন এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করুন, সম্প্রতি সেই যতিকে আনয়ন করিবেন না। ৭২

সেই ব্যক্তি গমন করিলে পর, সেই যষ্টিধারী কৃষ্ণবর্ণ যতি প্রজ্জলিত অনলের সহিত প্রাচীরস্থিত পাষাণের ভঞ্জন কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইলেন। ৭৩

মহামহিম সম্পন্ন শ্রীযাদবানন্দ ন্যায়াচার্য্যের বিখ্যাত গুণসম্পন্ন ছয়টী পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। যাহারা পুণ্যভার বহন করিয়া অনায়াসে সমস্ত-শাস্ত্রসমুদ্রের পারগামী হইয়াছিলেন। ৭৪

তাহাদিগের মধ্যে লোকপ্রসিদ্ধ রামচন্দ্রের ন্যায় রামভদ্র চক্রবর্ত্তী প্রথম

যদনু জনুরবাপ্য ন্যায়পঞ্চাননোঽভূৎ স্ফুরদবিরতসর্ব্বগ্রন্থ-
সিদ্ধান্তসারঃ ।
সমুপচিত-তপস্যারাশিরম্ভোধিসীম ক্ষিতি সুজনসুগীতোদার-
গম্ভীরকীর্ত্তিঃ ॥ ৭৬

পাণ্ডিত্যপ্রতিভাত-পৈতৃককুলে নৈপুণ্যপুণ্যশ্রুতি-
স্মৃত্যাচার মুরারিপাদকমলধ্যানাদি বিশ্রামভূঃ ।
যস্তাবৎ ফতজঙ্গ খাদিক-নবাবানুগ্রহাদুচ্ছ্রিতঃ
স্বে দেশেঽভবদদ্বিতীয় ইতি স শ্রীগৌরীদাসাভিধঃ ॥ ৭৭

দ্রুতকবিরবিলম্বঃ প্রস্ফুরন্ন্যায়শাস্ত্রপ্রভৃতি-সকলবিদ্যাদান-
লব্ধপ্রতিষ্ঠঃ ।
সুরগুরুরিব সাক্ষাদ্ ভারতে যোঽবতীর্ণো দিশি দিশি পরিপূর্ণা
ভারতে যস্য কীর্ত্তিঃ ॥ ৭৮

পুত্র। তিনি সমস্ত বিদ্যার একমাত্র বিশ্রামস্থান ছিলেন এবং পুণ্যরাশির আশ্রয় ছিলেন। ৭৫

তাহার পরে, রামভদ্রের অনুজ গৌরীদাস ন্যায়পঞ্চানন জন্মগ্রহণ করিলেন। সমস্ত শাস্ত্রের সারসিদ্ধান্ত সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট প্রকাশমান ছিল। তিনি তপস্যারাশির সঞ্চয় করিয়া, আসমুদ্র পৃথিবীমণ্ডলে সুজন, উদার এবং গভীর-কীর্ত্তিসম্পন্ন বলিয়া গীত হইয়াছিলেন। ৭৬

তিনি পাণ্ডিত্য দ্বারা পিতৃকুলকে উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্য-কুশলতা, পুণ্যরাশি, শ্রুতি ও স্মৃতি বিহিত সদাচার, মুরারির পাদকমল ধ্যানে বিশ্রামলাভ করিয়াছিল। তিনি ফতেজঙ্গখা নবাবের অনুগ্রহে অভ্যুদয় প্রাপ্ত হইয়া স্বদেশে অদ্বিতীয় হইয়াছিলেন। ৭৭

যাদবানন্দ ন্যায়াচার্য্যের তৃতীয় পুত্র মাধবানন্দ। তিনি দ্রুতকবি ছিলেন

শ্রীমাধবোনাম ততোঽবিলম্বসরস্বতীতি প্রথিতঃ পৃথিব্যাং।
পাণ্ডিত্য-কাব্যপ্রতিভাপটুত্ব গুণৈরুদারৈরয়মদ্বিতীয়ঃ॥ ৭৯
নিরবধি মুরবৈরিধ্যান-পূজানুরাগ-গ্রহিলহৃদয়দূরন্যস্তদোষপ্রসঙ্গঃ।
বিদিত সকলশাস্ত্রঃ পুণ্যপুঞ্জস্বরূপঃ সমজনি রঘুনাথশ্চক্রবর্ত্তী
চতুর্থঃ॥ ৮০
কমলনয়ননামা চক্রবর্ত্তী ততোঽভূৎ সকল-সুজনলোকে ব্যক্ত-
চারুস্বভাবঃ।
পরমপদমবাপ স্বর্ণদীতীরভূমৌ কতিপয়দিনবাসীভূয়
গঙ্গাপ্রাসাদাৎ॥৮১

বলিয়া পৃথিবীতে অবিলম্বসরস্বতী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি প্রকাশমান ন্যায়শাস্ত্র প্রভৃতি সকল শাস্ত্রের বিদ্যাদানে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন। তিনি সুরগুরুর ন্যায় ভারতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ভারতের প্রত্যেক দিক্ তাঁহার কীর্ত্তিদ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছিল। তিনি পাণ্ডিত্য, কাব্যপ্রতিভায় পটুত্ব এবং উদারতা গুণে অদ্বিতীয় হইয়া ছিলেন। ৭৮।৭৯

রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী নামে যাদবানন্দ ন্যায়াচার্য্যের চতুর্থ পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। তাঁহার হৃদয় নিরন্তর নারায়ণের ধ্যান ও পূজায় আসক্ত থাকায় তাঁহার হৃদয় হইতে সমুদায় দোষরাশি বিদূরিত হইয়াছিল। তিনি সকল শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ও পুণ্যরাশি স্বরূপ ছিলেন। ৮০

কমলনয়ন চক্রবর্ত্তী নামে যাদবানন্দ ন্যায়াচার্য্যের পঞ্চম পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। সকল সাধুব্যক্তির নিকট তিনি উৎকৃষ্ট স্বভাবসম্পন্ন বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছিলেন। তিনি অল্প কয়েকদিন মাত্র গঙ্গাতীরে বাস করিয়া গঙ্গার অনুগ্রহে পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

নিরুপম পরম শ্রীবিশ্বনাথঃ স্ফুরৎ শ্রীরতুলপুরুষকারব্যাপিত-
শ্চক্রবর্ত্তী।
মনুমুনিরিব সাক্ষাম্মানবে ধর্ম্মশাস্ত্রে সমভবদপরস্মিন্নিন্দ্রমন্ত্রীব
শাস্ত্রে ॥৮২

পুরারি-গৌরী-মুরবৈরিদেবেষ্বভেদবুদ্ধ্যা কৃততুল্যভক্তিঃ।
জ্ঞানেন গঙ্গাসলিলে শরীরং বিহায় নির্ব্বাণপদং প্রপেদে ॥ ৮৩

লোকেষু ধন্যজনুষো মনুজাস্ততোঽপি বিপ্রাস্ততোঽপি যদি
বেদবিদঃ কুলীনাঃ।
তত্রাপি কাশ্যপকুলং গুণিনাং বরিষ্ঠং কোটালিপাট কৃতবাস-
মতিপ্রতিষ্ঠং ॥ ৮৪

একাব্বরীয়ং কবিকালিদাসমেকান্ততঃ প্রাহ স বাদসাহঃ।
উৎকীর্ত্তয় শ্রীমধুসূদনাখ্য-সরস্বতীমস্করিণশ্চরিত্রম্ ॥ ৮৫

---

*অনুপম সৌন্দর্য্যসম্পন্ন বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী নামে যাদবানন্দ ন্যায়াচার্য্যের ষষ্ঠ পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। তিনি সম্পদ্‌যুক্ত ও পুরুষকার দ্বারা খ্যাত হইয়াছিলেন। মানব ধর্ম্মশাস্ত্রে তিনি সাক্ষাৎ মনুর ন্যায় ও অন্যশাস্ত্রে বৃহস্পতির ন্যায় ছিলেন। ৮২

তিনি শিব, দুর্গা ও বিষ্ণুতে অভেদবুদ্ধিতে তুল্য ভক্তি করিতেন। তিনি জ্ঞানপূর্ব্বক গঙ্গাসলিলে দেহত্যাগ করিয়া নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন।৮৩

এই লোকে তাঁহারাই ধন্য, যাঁহারা মানুষ হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। মানুষের মধ্যেও ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণের মধ্যে কুলীন অর্থাৎ উচ্চবংশসম্ভূত ব্যক্তিগণই শ্রেষ্ঠ। কুলীনের মধ্যে বেদবিদ্‌গণ শ্রেষ্ঠ। তাহার মধ্যে গুণিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কাশ্যপবংশ শ্রেষ্ঠ। কাশ্যপবংশের মধ্যেও যাঁহারা কোটালিপাড়া বাস করেন, তাঁহারা অতিশয় প্রতিষ্ঠিত॥ ৮৪

সম্রাট্ আকবর বাদসাহ তাঁহার সভাসদ্ কবি কালিদাসকে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত বলিয়াছিলেন, আকবর বাদসাহের সংবাদ সংবলিত পরিব্রাজক মধুসূদন সরস্বতীর চরিত্র নিরন্তর কীর্ত্তন কর।

চূড়ামণির ধারা।

(কোটালিপাড়া। ফরিদপুর)

শ্রীনাথ আচার্য্য চূড়ামণি।

ইনি মহামতি পুরন্দরাচার্য্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কোন বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায় না। তবে ইনি যে একজন নিষ্ঠাবান্ তেজস্বী ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। নানাশাস্ত্রে ইহাঁর অভিজ্ঞতা ছিল, এবং উপাসনাকার্য্যেই ইনি অধিক সময় অতিবাহিত করিতেন। ইঁহার জাত্যভিমান ও কুলাভিমান এত অধিক ছিল যে, এজন্য তিনি নিজের সহোদর ভ্রাতার সহিতও বিরুদ্ধাচরণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ইঁহার বংশাবলী বিস্তৃত। ইহাদের মধ্যে অনেকেরই কিছু কিছু ভূসম্পত্তি আছে। এই বংশে অনেক খ্যাতনামা পণ্ডিত ও সাধক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহার বংশাবলী চূড়ামণির সন্তান বলিয়া প্রসিদ্ধ।

এই বংশের বর্ত্তমান পণ্ডিতগণের নাম—শ্রীযুক্ত কালীপদ তর্কাচার্য্য, (সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক)" যামিনীকান্ত সাহিত্যাচার্য্য, (স্কুলের হেড্ পণ্ডিত) "উপেন্দ্র মোহন কাব্যসাংখ্যতীর্থ (সংস্কৃত সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকার সহকারী সম্পাদকও পরিষদের অধ্যাপক)," মধুসূদন কাব্যতীর্থ (হেড্ পণ্ডিত), "প্রফুল্লকুমার কাব্যতীর্থ (স্কুলের অধ্যাপক), "বিশ্বেশ্বর কাব্যব্যাকরণ স্মৃতিতীর্থ, "সতীশচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ ইত্যাদি।

ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণের নাম—"বিভূতি ভূষণ চক্রবর্ত্তী বি. এ. "মনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বি. এ, ৺জিতেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী এম্. এ. ইত্যাদি।

খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ—

৺দুর্গাধন ন্যায়ভূষণ

ইনি একজন প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ ছিলেন। পুরাণ শাস্ত্র পাঠে ইহার বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল। ইহার মত পাঠক খুব অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীযুক্ত কালীপদ তর্কাচার্য্য

ইনি নানাশস্ত্রে সুপণ্ডিত। ইহার বিনয়, বচনমাধুর্য্য ও সৌম্যমূর্ত্তি শাস্ত্রজ্ঞানকে সমধিক উজ্জল করিয়াছে। ইহার অসাধারণী কবিত্বশক্তি সকলকে চমৎকৃত করিয়া থাকে। দেশে বিদ্যা ও গুণের আদর থাকিলে, ইনি মহাকবি বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন। নাট্যশাস্ত্রে ও ইহার বিশেষ প্রতিষ্ঠা আছে। ইহার অভিনয়নৈপুণ্য ও প্রশংসনীয়। ইনি দীর্ঘকাল "সংস্কৃত-সাহিত্যপরিষদের" আচার্য্য ও "সংস্কৃত-সাহিত্যপরিষৎপত্রিকার" সম্পাদক পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি বর্ত্তমানে কলিকাতা সংস্কৃত-কলেজের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত আছেন। ইহার বিরচিত কয়েকখানি গ্রন্থ আছে। তাহা এই ;—

১। মুক্তিবাদ টীকা বঙ্গানুবাদসহ।
২। প্রশস্তপাদ ভাষ্য, টীকা বঙ্গানুবাদসহ।
৩। সংখ্যকারিকা গৌড়পাদ-ভাষ্য টীকা।
৪। সাংখ্যসার টীকা।
৫। জাতিবাধক বিচার (অপ্রকাশিত)।
৬। নৈষধ চরিত টীকা (অপ্রকাশিত)।
৭। সাহিত্যদর্পণ টীকা (অপ্রকাশিত)।
৮। নলদময়ন্তীয় (নাটক)।
৯। স্যমন্তকোদ্ধার (ব্যায়োগ)।
১০। মালবিকাগ্নিমিত্র টীকা।
১১। দশকুমার চরিত টীকা।
১২। অনুবাদ নবোদয়।
১৩। কাব্যচিন্তা।
১৪। ভাষারত্ন টীকা।

শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত সাহিত্যাচার্য্য

ইনি মেট্রোপলিটনস্কুলের অধ্যাপক। ব্যাকরণশাস্ত্রে ইনি বিশেষ ব্যুৎপন্ন। ইনি একজন সুকবি বলিয়া পরিগণিত। "নবমালিকা" নামে ইনি একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

ন্যায়াচার্য্যের ধারা

৺মাধবানন্দ অবিলম্বসরস্বতী।

(কোটালীপাড়া, ফরিদপুর)

ইনি যাদবানন্দ ন্যায়াচার্য্যের ৩য় পুত্র। এই মহাপুরুষের বিদ্যাবত্তা, অলৌকিক কবিত্ব ও অসাধারণী প্রতিভা পণ্ডিতসমাজকে বিস্মিত করিয়াছিল। ইঁহার অলৌকিক শক্তি দর্শন করিয়া সাধারণের ধারণা হইয়াছিল যে, বাগধিষ্ঠাত্রী দেবতা ইঁহার আজ্ঞাবহ ছিলেন। ইঁহার কীর্ত্তিকলাপের চিহ্নমাত্রও এখন বর্ত্তমান নাই, কেবল কয়েকটী জনশ্রুতি মাত্র তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছে। তাহার মধ্যে কয়েকটী প্রবাদ এই ;—

১। পশ্চিমদেশ হইতে নানা শাস্ত্রপারদর্শী একজন দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত বঙ্গদেশ জয় করিতে আসিয়াছিলেন। যশোহরের রাজবাটীতে এই সভা হয়। সেই সভায় অপরিণতবয়স্ক মাধব বিচারার্থী হইয়া নানা-শাস্ত্রবিশারদ বঙ্গদেশীয় প্রাচীন পণ্ডিতগণকে অতিক্রম পূর্ব্বক বিচারাসনে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। সভাস্থিত পণ্ডিতমণ্ডলী বালক মাধবের এই ধৃষ্টতা দেখিয়া লজ্জিত ও বিস্মিত হইলেন। মাধব বলিলেন, আপনারা ভীত হইবেন না, আশীর্ব্বাদ করুন, বাগ্‌দেবতা আমার সহায় হইবেন, আমি একাকীই বঙ্গদেশের গৌরব রক্ষা করিব। সকলে শুনিয়া

অবাক্। মাধব বয়সে বালক হইলেও ন্যায়শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি পদ্যে নীরস ন্যায়শাস্ত্রের বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার সাহসিকতা, প্রতিভা ও অসাধারণ কবিত্বশক্তি দর্শন করিয়া দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত হতপ্রভ হইলেন। তিনি অসাধারণ পণ্ডিত হইলেও পদ্যে বিচার করিবার তাঁহার সামর্থ্য ছিল না। সুতরাং তিনি পরাজয় স্বীকার করিয়া, মাধবকে সস্নেহ আলিঙ্গন ও আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক সভাসদ্ পণ্ডিতবর্গকে বলিলেন, আমি ইঁহার বিচারে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া ইঁহাকে "অবিলম্ব সরস্বতী" উপাধি প্রদান করিলাম। আপনারা ইঁহাকে বঙ্গদেশের মুখোজ্জ্বলকারীরূপে সম্মান করিলে আমি বিশেষ আনন্দিত হইব। পণ্ডিতগণ সানন্দে মাধবের এইরূপ সম্মানে বিশেষ পুলকিত হইলেন। মাধবও রাজসরকার হইতে বিশেষ পুরস্কৃত হইয়া দেশে গমন করিলেন। দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতও স্বদেশে প্রস্থান করিলেন। কেহ কেহ বলেন, বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপের রাজসভায় এই বিচারকার্য্য সম্পন্ন হয়।

২। প্রসিদ্ধ আছে যে, মাধব নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া যশোহরের প্রবলপ্রতাপসম্পন্ন মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সভায় উপস্থিত হইয়া রাজার প্রশস্তি পাঠ করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে এই শ্লোকটী আছে। যথা—

"প্রতাপাদিত্য ভূপাল ! ভালং মম বিলোকয়।
স্বেদেন প্রোঞ্ছিতাঃ সন্তু বিধের্দুর্লেখপঙ্‌ক্তয়ঃ" ॥

অর্থাৎ—হে মহারাজ প্রতাপাদিত্য ! আপনি আমার কপালের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করুন। ললাটে উৎপন্ন স্বেদের দ্বারা বিধাতার দুর্লিপি সকল মুছিয়া যাউক। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সূর্য্যের কিরণ ললাটদেশে নিপতিত হইলে স্বেদোদ্‌গম হয়, কপালে কোন মলিন বস্তু থাকিলে, তাহা স্বেদ জলে ধুইয়া যায়। সুতরাং আপনার নাম প্রতাপাদিত্য হওয়ায়, আপনি সূর্য্যস্বরূপ, আপনি আমার ললাটের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে

স্বেদোদ্গম হইবে। সেই স্বেদজলে ললাটে বিধাতার লিখিত মলিন দারিদ্র্যাদি দুর্লিপি সকল মুছিয়া যাইবে, অর্থাৎ আপনার কৃপাদৃষ্টিতে আমার দারিদ্র্য দূর হউক।

৩। অনেকে বলেন, মাধবাবিলম্ব সরস্বতী যশোহরের খ্যাতনামা মহারাজ প্রতাপাদিত্যের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। মানসিংহের সহিত যখন প্রতাপাদিত্যের তুমুল সংগ্রাম হয়, তখন তিনি সেনাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন। বাস্তবিক, ইনিই যদি প্রতাপাদিত্যের মন্ত্রী বা সেনাপতি রূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে যশোহরের ইতিহাসেই ইঁহার কীর্ত্তিকলাপ জানিবার বিশেষ সুযোগ হইবে।

৪। কথিত আছে যে, পণ্ডিতকুলধুরন্ধর যাদবানন্দ ন্যায়াচার্য্য মহাশয় সুযোগ্য পুত্র পণ্ডিতকুলতিলক মাধবকে লইয়া, বিক্রমপুরের তদানীন্তন প্রবল পরাক্রান্ত রাজা চাঁদরায় ও কেদার রায়ের রাজসভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। পুত্রের বিদ্যাবত্তা প্রকাশ করাই ন্যায়াচার্য্য মহাশয়ের উদ্দেশ্য ছিল। তিনি রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রাজাও তাঁহাদিগের বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিবার সুযোগ প্রদান করিয়া প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণকে লইয়া একটী সভার আহ্বান করিলেন। স্বয়ং চাঁদরায়ই ন্যায়াচার্য্য মহাশয়ের নিকট প্রশ্ন করিলেন—

"পঞ্চপাদঃ কথং সিংহঃ ভ্রম্বিঃ স্যাত্তু কথং রবিঃ।
চাঁদরায়ঃ কস্য তুল্যঃ দীয়তামেকমুত্তরম্" ॥

অর্থাৎ—সিংহ কি প্রকারে পঞ্চপাদ হয়? রবি কি প্রকারে "ভ্রম্বি" হয়? চাঁদরায় কাহার সদৃশ? এক কথায় ইহার উত্তর দান করুন।

প্রশ্ন শ্রবণমাত্রই পিতৃদেব ন্যায়াচার্য্যের প্রতীক্ষা না করিয়া, মাধব উত্তর করিলেন—"মঘোনঃ"।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে;—২। সওয়া দুই নক্ষত্রে অর্থাৎ নক্ষত্রের ৯ নয়

পাদে এক রাশি হয়, সুতরাং (মঘা+ ঊন) মঘাকে বাদ দিলে ৪ পাদ কমিয়া সিংহ পঞ্চপাদ হইল। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরও ঐ। অর্থাৎ "মুরবি" শব্দের ম' এবং ঘ' বাদ দিলেই (ম—ঘ+ঊন) রবি হয়। তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরও ঐ। অর্থাৎ ; মঘোনঃ—ইন্দ্রস্য তুল্যঃ। চাঁদরায় ইন্দ্রের তুল্য। এই উত্তর শুনিয়া চাঁদরায় বিস্মিত হইলেন, বুঝিলেন—বাগ্‌দেবতা ইঁহার কণ্ঠে নিয়ত অধিষ্ঠিত আছেন। সভাসদ্‌গণ এইরূপ অচিন্তনীয় অদ্ভুত উত্তর শুনিয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। চাঁদরায় বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া মাধবকে "অবিলম্ব সরস্বতী" উপাধি প্রদান করিলেন এবং বিশেষরূপে পুরস্কৃত করিয়া বিদায় দিলেন।

এই বংশের বর্ত্তমান পণ্ডিতগণের নাম—শ্রীরামধন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ, "তারাকান্ত কাব্যতীর্থ (স্কুলের অধ্যাপক), "যোগেন্দ্রমোহন বিদ্যারত্ন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ (হেড্ পণ্ডিত), "ধীরেন্দ্রমোহন কাব্যতীর্থ, "গোবিন্দচন্দ্র কাব্যতীর্থ (স্কুলের অধ্যাপক), "বসন্তকুমার কাব্যতীর্থ (ভূতপূর্ব্ব হেড্ পণ্ডিত) ইত্যাদি।

ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণের নাম—শ্রীচিন্তাহরণ কাব্যতীর্থ এম্. এ., "রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী এম্. এ., "দুঃখহরণ চক্রবর্ত্তী এম্. এ. ইত্যাদি।

খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ—

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রমোহন বিদ্যারত্ন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

ইনি ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন এবং সুকবি বলিয়া প্রসিদ্ধ। সংস্কৃতভাষায় লিখিত ইহার প্রবন্ধগুলি গবেষণাপূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক।

শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম্. এ.

ইনি একজন সুবক্তা ও মধুরভাষী। ইনি সংস্কৃত ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারেন। সমালোচনায় ইহার বিশেষ দক্ষতা আছে। ইনি সম্প্রতি বেথুন কলেজের অধ্যাপক এবং ব্যাকরণকৌমুদী, পবনদূত, জৈন-

পদ্মপুরাণ প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থের সম্পাদক ও নানাবিধ প্রবন্ধের রচয়িতা। ইনি সংস্কৃত-সাহিত্যপরিষৎ ও বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষদের অকৃত্রিম হিতৈষী ও সদস্য।

শ্রীযুক্ত দুঃখহরণ চক্রবর্ত্তী এম্. এস্. সি.

ইনি ইংরেজী বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী, গবর্ণমেণ্টরিসার্চ্চ স্কলার, কলিকাতা মেডিকেল স্কুলের শিক্ষক, টাইগার কেমিক্যাল ওয়ার্কসের কেমিক্যাল অ্যানালিষ্ট ব্র ও কোটালীপাড়া সম্মিলনীর সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী এম্. এ.

ইনি ইংরেজী বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী এবং সংস্কৃতভাষায় ব্যুৎপন্ন। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার বিভাগে কাজ করেন ও সংস্কৃত-সাহিত্যপরিষদের সহকারী সম্পাদক।

৺রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী

(কোটালীপাড়া, ফরিদপুর)

ইনি যাদবানন্দ ন্যায়াচার্য্যের ৪র্থ পুত্র। ইনি একজন সুপণ্ডিত ও তাপস ছিলেন। এই বংশে অনেক খ্যাতনামা পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বুদ্ধিমত্তায় ও সালিশীতে এই বংশের মধ্যস্থ বংশ বিশেষ প্রসিদ্ধ। রঘুনাথের বংশেরই এক শাখা স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতির পৌরোহিত্য করেন।

এই বংশের বর্ত্তমান পণ্ডিতগণের নাম—শ্রীযুক্ত কালিদাস বিদ্যাবিনোদ, ”রেবতীমোহন কাব্যরত্ন, ”কামাখ্যাচরণ শাস্ত্রী,”প্রফুল্লকুমার কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্যতীর্থ, ”অনন্তপ্রসাদ ব্যাকরণতীর্থ, ”রামধন কাব্যতীর্থ, ”জিতেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ (হেড্ পণ্ডিত গবর্ণমেণ্ট স্কুল), ”হরিনারায়ণ স্মৃতিতীর্থ ”কাশীনাথ কাব্যতীর্থ (হেড্ পণ্ডিত), ”রামেশ্বর কাব্যতীর্থ (হেড্ পণ্ডিত), ”দেবীদাস ব্যাকরণতীর্থ ইত্যাদি।

ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণ—শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি. এ.

(মেট্রোপলিটন ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী), ''ভূপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি. এ. শ্যামাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য বি. এ., ''মণীন্দ্রলাল চক্রবর্ত্তী বি. এ., ''ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি. এ. বি. এল., শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী (ওভারসিয়ার) ইত্যাদি। খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের নাম—

৺রজনীকান্ত সন্ন্যাসী

ইনি রঘুনাথ চক্রবর্ত্তীর বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার মত সাধু পুরুষ অতি বিরল। ইনি ভারতের প্রায় সমুদায় তীর্থস্থানই পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। ইঁহার তপোবল ও অত্যাশ্চার্য্য ক্ষমতার কথা বহুলোকেই অবগত আছেন। ইঁহার মত কঠোর সংসার বৈরাগ্যসম্পন্ন প্রকৃত সাধু পুরুষ অনেকের ভাগ্যেই দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ইঁহার ভগিনী ৺কাশীবাসী ৺মহামহোপাধ্যায় বামাচরণ ন্যায়াচার্য্য মহাশয় বিবাহ করেন।

৺ জয়নারায়ণ তর্করত্ন

ইনি একজন অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক ছিলেন। ইঁহার বিচারবুদ্ধি এমন প্রখরা ছিল যে, তাঁহার সমসাময়িক পণ্ডিতগণ সভাস্থলে তাঁহাকে দেখিলে কম্পান্বিত কলেবর হইতেন। ইনি যখন ফরিদপুরের অন্তর্গত কোড়কদী গ্রাম নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ৺ কৈলাসচন্দ্র তর্করত্ন মহাশয়ের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, তখন তাঁহার সহিত বিক্রমপুরের প্রধান নৈয়ায়িক ৺গোলোকচন্দ্র সার্ব্বভৌমের তুমুল বিচার হয়। এই বিচারে তর্করত্ন মহাশয় জয়ী হইয়াছিলেন। উত্তরবাদী সার্ব্বভৌম মহাশয় ঐ বিচারে তর্করত্ন মহাশয়ের বিচার-নৈপুণ্য দর্শন করিয়া এত প্রীত হইয়াছিলেন যে, তাহাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন। তিনি ইঙ্গিতে অধ্যাপকের অপকর্ষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, তোমার মত ছাত্রের এই অধ্যয়ন স্থান উপযুক্ত নহে। তুমি আমার সহিত চল, আমি যত্ন করিয়া তোমাকে পড়াইব। আমার নিকট পড়িলে তোমার অসাধারণ প্রতিভা

আরও বৃদ্ধি পাইবে। তর্করত্ন মহাশয় এই কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, সার্ব্বভৌম মহাশয়! মশাল হইতেও প্রদীপ হয়, আবার প্রদীপ হইতেও মশাল হয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ছাত্র প্রতিভাবান্ হইলে, ছোট অধ্যাপকের নিকট হইতেও বড় পণ্ডিত হইতে পারে, আর বড় পণ্ডিতের নিকট পড়িয়াও প্রতিভাহীন ছাত্রগণ মূর্খ ই থাকে। সার্ব্বভৌম মহাশয় ইহা শুনিয়া একটু হাসিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক সস্নেহ আলিঙ্গন করিলেন। ইনি নবদ্বীপে ৺মহামহোপাধ্যায় ভুবনমোহন বিদ্যারত্নের নিকট অধ্যয়ন করেন। ইনি ন্যায়শাস্ত্রে অদ্বিতীয় বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, এবং ৺ কাশীর মহারাজার সভাপণ্ডিত হইয়াছিলেন। নবদ্বীপে ৺ ভুবনমোহন বিদ্যারত্নের মৃত্যুর পরে তাঁহার পত্নীর অনুরোধে ইনি নবদ্বীপের ৺ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন মহাশয়ের টোলেই দীর্ঘকাল সুখ্যাতির সহিত অধ্যাপনা কার্য্য করিয়াছেন। ইনি অন্যান্য দর্শনেও বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। "তর্করত্নাবলী" নামে ইহার একখানি দার্শনিক গ্রন্থ আছে।

৺উমাকান্ত চক্রবর্ত্তী

এই স্বনাম খ্যাত মহাপুরুষ স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতির পৌরোহিত্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। ইনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান্, প্রতিভাসম্পন্ন ও নানা শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন। ইঁহার সময়ে দেশে "টিপ্‌রার দলাদলি" একটী প্রসিদ্ধ ঘটনা। যে সকল ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ত্রিপুরার রাজবাটী হইতে দান গ্রহণ করিয়াছিলেন, পূর্ব্ববঙ্গের সমগ্র হিন্দুসমাজ তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া "একঘরে" করিয়াছিলেন। এমন কি তাহাদিগের জলও অনাচরণীয় এবং অস্পৃশ্য ছিল। অনেক বড় বড় পণ্ডিতও এই দলাদলিতে বিশেষ লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। এইরূপ ব্যাপক দলাদলি বঙ্গদেশে খুব কমই হইয়াছে, এই দলাদলির প্রভাব বহুকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী ছিল।

শ্রীযুক্ত কালিদাস বিদ্যাবিনোদ

ইনি নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও অত্যন্ত মেধাবী। সুবক্তা বলিয়াও ইঁহার বিশেষ প্রসিদ্ধি আছে। ইনি একজন সুকবি। ইঁহার সরস ও সরল কবিতাবলী জনসাধারণকে চমৎকৃত করিয়া থাকে। ইনি অতিশয় শান্তপ্রকৃতি হইলেও জলধরের অন্তর্নিহিত বিদ্যুতের ন্যায় ইঁহার বিশেষ তেজস্বিতার পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি কয়েকখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। যথা—১। শিবাজী চরিত। ২। আশুব্যুৎপত্তি সাধন প্রভৃতি। ইনি কোটালীপাড়া "আর্য্যশিক্ষা সমিতি" নামক সংস্কৃত পরীক্ষা কেন্দ্রের অন্যতর সম্পাদক ও সংস্কৃত বিদ্যালয়ের অন্যতর অধ্যাপক ছিলেন। বর্ত্তমানেও ইঁহার একটী চতুষ্পাঠী আছে।

শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন কাব্যরত্ন।

ইনি কাব্যশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও সুকবি। ইনি কোটালীপাড়া "আর্য্য-শিক্ষাসমিতি" নামক সংস্কৃত পরীক্ষা কেন্দ্রের অন্যতর সম্পাদক ও সংস্কৃত বিদ্যালয়ের অন্যতম অধ্যাপক ছিলেন। অধ্যাপনায় ইনি বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। ইনি স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতির পৌরোহিত্য কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন।

৺হরিদাস কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ সিদ্ধান্তভূষণ

ইনি নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার একটী চতুষ্পাঠী ছিল, তাহাতে অনেক ছাত্র অধ্যয়ন করিত। ইনি কোটালীপাড়া "ইউনিয়ন বোর্ডের" প্রেসিডেণ্ট হইয়াছিলেন। দেশের উন্নতি কল্পে ইঁহার বিশেষ যত্ন ছিল। ইঁহার অকাল মৃত্যুতে দেশবাসী সকলেই একজন প্রকৃত কর্ম্মীর অভাবে শোকাকুল হইয়াছেন।

৺বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী

(কোটালীপাড়া, ফরিদপুর)

ইনি যাদবানন্দ ন্যায়াচার্য্যের ৬ষ্ঠ পুত্র। প্রাচীন বংশাবলীতে ইঁহার বিদ্যাবত্তা সম্বন্ধে বিশেষ প্রশংসা আছে। অনেকে অনুমান করেন, ইনিই

শ্রীমদ্ ভাগবতের টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী। ইঁহার বংশেও অনেক খ্যাতনামা পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই বংশের বর্ত্তমান পণ্ডিত গণের নাম—শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ (হেড্ পণ্ডিত), "অশ্বিনী-কুমার কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ (হেড্ পণ্ডিত)" সুরেশচন্দ্র কাব্যতীর্থ, (হেড্ পণ্ডিত) "মনোরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ (কবিরাজ) ইত্যাদি।

৺রুদ্রকান্ত বাচস্পতি

(ইঁহার সন্তান প্রাণপুর, ফরিদপুর)

ইনি স্বনাম খ্যাত গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর পুত্র। ইনি একজন সাধুপুরুষ ও নানা শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন। ইঁহার বংশে অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে একজনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য, তিনি সর্ব্বত্র সুপরিচিত ও অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন। তাঁহার নাম—

৺শশধর তর্কচূড়ামণি।

ইনি ফরিদপুর জেলার অধীন ব্রাহ্মণদী পোষ্ট আফিসের অন্তর্গত প্রাণপুর গ্রামে বাস করিতেন। বর্ত্তমানকালে বঙ্গদেশে ইঁহার মত পণ্ডিত ও অসাধারণ বক্তা অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। দেশে যখন ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের প্রবল প্লাবনে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ভাসমান হইতেছিল, যাহার প্রবল তরঙ্গের ঘাতপ্রতিঘাতে ধর্ম্মশাস্ত্রসকল বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, যাহার বিপুল আন্দোলনে ধর্ম্ম ও শাস্ত্রবিশ্বাসী হিন্দুগণ আত্মরক্ষা করিতে সংশয়াকুল হইয়াছিলেন, তখন ইঁহারা মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্মশাস্ত্রের ন্যায় বঙ্গদেশে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ইঁহাদেরই অসাধারণ চেষ্টায়, এবং শাস্ত্রীয় যুক্তিতর্কের অকাট্য উপদেশের ফলে বর্ণাশ্রম বিরোধী ব্রাহ্মধর্ম্ম বিফলপ্রয়াস ও বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। এই পণ্ডিতকেশরী সভাস্থলে উপস্থিত হইলে বিপক্ষগণ যূথভ্রষ্ট করীর ন্যায় ইতস্ততঃ পলায়ন করিত। নানাশাস্ত্রে ইঁহার এত অভিজ্ঞতা ছিল যে, ইঁহার বাগ্বজ্র পর্ব্বতের ন্যায় স্তূপীকৃত বিপক্ষপক্ষকে-

অনায়াসে খণ্ডন করিতে সমর্থ হইত। ইঁহার এমন অসাধারণ ক্ষমতা ছিল যে, ইনি সভাস্থলে উপস্থিত হইয়াই পূর্ব্বে অনালোচিত যে কোন কঠিন বিষয়ের সমাধান করিতে সমর্থ হইতেন। ইঁহার মত বাগ্মী বঙ্গদেশে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহার গ্রন্থ সমূহ অতি উপাদেয় বলিয়া বিষয়ী সমাজেও বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। ইনি শেষ বয়সে মুর্শিদাবাদ বহরমপুরের জুবিলী টোলে অধ্যক্ষতা করিয়াছেন। শাস্ত্রচর্চ্চায় ও উপাসনায়ই তিনি শেষ বয়স কাটাইয়াছেন।

ইঁহার প্রণীত গ্রন্থসকল—

১। ভবৌষধ।
২। ধর্ম্মব্যাখ্যা।
৩। সাধন প্রদীপ।
৪। বেদবিষয়ে ইংরেজী মতের প্রতিবাদ।
৫। শ্রাদ্ধান্ন বিবেক।
৬। ভক্তিসুধালহরী।

এতদ্ভিন্ন তিনি জীবনের শেষভাগে একখানি সুবৃহৎ সংস্কৃত গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। ঐ গ্রন্থখানির নাম আমরা জানিতে পারি নাই, তবে শুনিয়াছি যে, ঐ গ্রন্থে ষড়্‌দর্শনের সমন্বয় করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।

ইনি বাঙ্গালা ১২৫৭ সালের ৭ই পৌষ শনিবার জন্মগ্রহণ করেন। ১৩৩৪ সালের ১লা ফাল্গুন ইনি পরমপদ লাভ করেন।

৺কেশবচন্দ্র ন্যায়পঞ্চানন

(কোটালীপাড়া, ফরিদপুর)

ইনি সুপ্রসিদ্ধ গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর পুত্র। নানা শাস্ত্রে ইঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। এই বংশে অনেক পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান পণ্ডিতগণের নাম—শ্রীকালীকান্ত শিরোমণি (হেড্‌ পণ্ডিত), ”প্রতাপ চন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-স্মৃতিতীর্থ (হেড্‌ পণ্ডিত)। ইনি অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। যথা—

১। মালবিকাগ্নিমিত্র টীকা।
২। কিরাতার্জ্জুনীয় অনুবাদ সহ।
৩। স্মৃতিসুধাকর—শুদ্ধিচন্দ্রিকা ও প্রায়শ্চিত্তচন্দ্রিকা (যন্ত্রস্থ)।

ইনি একজন সুপণ্ডিত, এবং ইংরেজী ভাষায়ও ইঁহার অভিজ্ঞতা আছে।

৺চন্দ্রশেখর চক্রবর্ত্তী

(কোটালীপাড়া ও বারৈখালী)

ইনি মহাযশাঃ গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর পৌত্র। ইনি নিষ্ঠাবান্, সৎকার্য্য-নিরত ও তেজস্বী ছিলেন। ইঁহার বংশেও অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান পণ্ডিতগণের নাম—শ্রীজানকীনাথ কাব্যরত্ন (হেড্ পণ্ডিত), "মধুসূদন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ (হেড্ পণ্ডিত) ইত্যাদি।

৺ধরণীধর ন্যায়পঞ্চানন

(বাটাজোড়, বরিশাল)।

ইনি মহামতি গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর পৌত্র। ইনি অতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। ইনি কোটালীপাড়া হইতে বাটাজোড় আগমন করেন। ইঁহার বংশধরগণ বাটাজোড় এবং তাহার নিকটবর্ত্তী জয়শীরকাঠী ও লক্ষ্মণ-কাঠী গ্রামে কেহ কেহ বাস করিতেছেন। এই বংশেও অনেক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান পণ্ডিতগণের নাম—শ্রীউমেশচন্দ্র ব্যাকরণতীর্থ, "নিবারণ চন্দ্র ভাগবতভূষণ, "বিপিনবিহারী কাব্যরত্ন, "অনন্তকুমার কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ ইত্যাদি। ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণের নাম—শ্রীগোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি. এ. "নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি, এস, সি, "বিমলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিএ, ইত্যাদি।

খ্যাতনামাব্যক্তিগণ—

৺কৈলাস চন্দ্র জ্যোতীরত্ন।

ইনি জ্যোতিষশাস্ত্রে একজন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। ইনি "গ্রহদর্পণ" নামে একখানি জ্যোতিষের গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

৺অনাথবন্ধু স্মৃতিতীর্থ সিদ্ধান্তবাগীশ

ইনি অনেক দিন পর্য্যন্ত স্বীয় চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করিয়াছেন। ইনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ জ্যোতিষাচার্য্য।

ইনি জ্যোতিষ শাস্ত্রের ব্যবসায়ে বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছেন, এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রের কয়েকখানি গ্রন্থ ও প্রণয়ন করিয়াছেন। যথা—প্রশ্ন-কল্পতরু, জাতক বিজ্ঞান, স্বপ্নকল্পতরু, অনন্ত বিজ্ঞান, প্রগ্ধান্তবিজ্ঞান, গ্রহ-চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রভৃতি।

শ্রীযুক্ত হরিচরণ সন্ন্যাসী।

ইনি ইংরেজী বিদ্যালয়ে বি, এ, পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। ইহার পাঠ্যাবস্থাতেই সাধারণ লোকের প্রতি দয়ার ভাব বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। অনেক সময় ইনি কলেরাক্রান্ত দেশে নিজব্যয়ে রোগীর শুশ্রূষার জন্য গমন করিয়া কেবলমাত্র একখানি গামছা পরিধান করিয়া, পয়সার সংগ্রহ করিতে না পারিলে পদব্রজেই দুই তিন দিনের পথ হাঁটিয়া কলিকাতায় আসিতেন। ইনি অত্যন্ত বিনীত। ইহার উদারতা ও প্রকৃতির মাধুর্য্যে সাধারণেই বশীভূত হইয়া থাকে। ইনি বর্ত্তমানে "প্রেমানন্দ স্বামী" নামে বিখ্যাত ও বৃন্দাবনের সুপ্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী কেশবানন্দ স্বামীর শিষ্য।

৺হরি নারায়ণ তর্কালঙ্কার।

(কোটালীপাড়া, ফরিদপুর)

ইনি গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর পুত্র বলরাম তর্কভূষণ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার লিখিত বহুগ্রন্থ এখনও

বর্ত্তমান আছে। এই বংশে অনেক খ্যাতনামা পণ্ডিত ও সাধুপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই বংশের অনেকেই এখন পর্য্যন্তও জপ তপস্যা পরায়ণ, গৈরিক বসন এবং রুদ্রাক্ষমালাধারী। এই বংশের আগড়পাড়া প্রবাসী ৺নীলকান্ত তর্কবাগীশ মহাশয় একজন অদ্বিতীয় স্মার্ত্ত ছিলেন। এই বংশের বর্ত্তমান পণ্ডিতগণের নাম—শ্রীযুক্ত কালীচরণ স্মৃতি-পুরাণতীর্থ, ”বসন্তকুমার কাব্যতীর্থ (ভূতপূর্ব্ব হেড্ পণ্ডিত), ”হারাণচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতিতীর্থ, (তিলুরী চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক ও সংস্কৃত পরীক্ষাসভার সম্পাদক), ”কালীপদ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ (হেড্পণ্ডিত সিমলা), ”হরিপদ জ্যোতির্ভূষণ, ”লক্ষ্মণচন্দ্র বেদান্তশাস্ত্রী, ”হরিদাস কাব্যতীর্থ (হেড্পণ্ডিত) ”রমেশ চন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ (হেড্পণ্ডিত), ”হেমচন্দ্র কাব্যতীর্থ (হেড্-পণ্ডিত) ইত্যাদি।

ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণ—যতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি, এ ইত্যাদি।

৺রামদাস বিদ্যালঙ্কার।

(কোটালীপাড়া, ফরিদপুর)

ইনি মহাত্মা গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর পুত্র বলরাম তর্কভূষণ মহাশয়ের ৪র্থ পুত্র। ইনি একজন সুপণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার লিখিত বহুগ্রন্থ এখনও বর্ত্তমান আছে। এই বংশে অনেক খ্যাতনামা পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে ৺কাশীচন্দ্র বাচস্পতি মহাশয় একজন প্রধান বৈয়াকরণ ও উৎকৃষ্ট পুরাণপাঠক ছিলেন। তিনি স্বহস্তে রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি বহু গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই বংশের বর্ত্তমান পণ্ডিত গণের নাম—শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, ”লক্ষ্মীকান্ত বিদ্যাভূষণ, ”অশ্বিনী কুমার বেদান্তভূষণ, ”শশিশেখর কাব্যতীর্থ, ”কালীনাথ ব্যাকরণতীর্থ ইত্যাদি।

ইংরেজী শিক্ষিতগণের নাম—শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি, এ (ভূতপূর্ব্ব হেড্ মাষ্টার) ইত্যাদি। খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ—

৺হরিহর শাস্ত্রী।

ইনি অতি বিনয়ী ও মিষ্টভাষী ছিলেন। ইহার সৌম্যমূর্ত্তি সাধারণেরই চিত্ত আকর্ষণ করিত। ইনি মহামহোপাধ্যায় ৺রাখালদাস ন্যায়রত্নের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বৌদ্ধদর্শনও জৈনদর্শনে ইহার বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল। ইনি ৺কাশী হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের একজন খ্যাতনামা অধ্যাপক ছিলেন। ইহার অসাধারণ কবিত্বশক্তি ছিল। ইহার রচিত সরস ও সরল কবিতাগুলি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী বলিয়া সাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করিত। ইনি মাসিক পত্রিকাদিতে প্রায়ই সারগর্ভ প্রবন্ধ ও কবিতা লিখিতেন। অল্পদিন হইল, ইনি পরলোক গমন করিয়াছেন। ইহার অকালমৃত্যুতে সুধাংশু-বিরহিত আকাশ মণ্ডলের ন্যায় কাশ্যপ-বংশ অপরিহার্য্য বিষাদ-তিমিরে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। ইহার বিরচিত কয়েকখানি গ্রন্থ আছে। তাহা এই :—

সংস্কৃত ভাষায়

১। ন্যায়লীলাবতী টীপ্পনী।
২। তত্ত্বসার-টিপ্পনী।
৩। পঞ্চতন্ত্র-টীপ্পনী।
৪। তর্কসংগ্রহ বিবৃতি।
৫। ব্রজালী-প্রভা।
৬। কালীপ্রশস্তিঃ।
৭। ন্যায়রত্নপরিচয়।
৮। ছন্দঃপরিচয়।
৯। ব্যাপ্তিপঞ্চক টিপ্পনী।

বাঙ্গালা ভাষায়—

১০। জৈনদর্শন।
১১। জৈনন্যায়।
১২। প্রবন্ধপঞ্চক।

ইত্যাদি।

শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ

ইনি নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। ইনি বহুদিন যাবৎ নকীপুর হরিচরণ চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। ইনি অত্যন্ত মেধাবী, পরিশ্রমশীল ও শান্ত স্বভাব। ইনি শাস্ত্রজ্ঞানে পরিণত বয়স্ক হইলেও অজাতশ্মশ্রু বালকের ন্যায় বালস্বভাব এখনও ত্যাগ করিতে

পারেন নাই। ইনি একজন সুকবি বলিয়া প্রসিদ্ধ। রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে ইনি প্রাদুর্ভূত হইলে হয়ত ইনি মহাকবি বলিয়া পরিচিত হইতে পারিতেন। ইনি অনেকগুলি গ্রন্থ লিখিয়াছেন এবং বহু গ্রন্থের টীকাও লিখিয়াছেন। সম্প্রতি সটীকানুবাদ মহাভারত প্রকাশ করিতেছেন। ইহার প্রকাশিত ও বিরচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে কয়েকখানি এখনও অপ্রকাশিত রহিয়াছে। গ্রন্থগুলির নাম—

১। উত্তররামচরিতম্ (সটীকানুবাদ)।
২। মালবিকাগ্নি মিত্রম্ ,,
৩। দশকুমারচরিতম্ ,,
৪। মালতীমাধবম্ ,,
৫। কাদম্বরী পূর্ব্বার্দ্ধম্ ,,
৬। মেঘদূতম্ ,,
৭। কুমারসম্ভবম্ ,,
৮। মৃচ্ছকটিকম্ ,,
৯। অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ ,,
১০। রঘুবংশম্ ,,
১১। শিশুপাল বধম্ ,,
১২। নৈষধচরিতম্ ,,
১৩। সহিত্যদর্পণঃ ,,
১৪। মহাভারতম্ ,,
১৫। বিরাজসরোজিনী।
১৬। জানকীবিক্রমম্।
১৭। রুক্মিণীহরণম্।
১৮। স্মৃতিচিন্তামণিঃ।
১৯। বঙ্গীয়প্রতাপম্।
২০। বিয়োগবৈভবম্।
ইত্যাদি।

৺পুরুষোত্তম ন্যায়ালঙ্কার

(চাঁদসী, বরিশাল)।

ইনি মহাত্মা গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর পুত্র বলরাম তর্কভূষণ মহাশয়ের ২য় পুত্র। এই মহাতাপস মহাপুরুষ শিষ্যবর্গের নিরতিশয় আগ্রহে কোটালীপাড়া হইতে চাঁদসীগ্রামে আগমন করেন। তৎকালে চাঁদসী গ্রাম সৎকর্ম্মান্বিত তাপসগণের বাসভূমি ছিল। এই গ্রামের দাসবংশ অতিশয় প্রসিদ্ধ ছিল। তাহাদিগের অতুলনীয় কীর্ত্তিকলাপ এখনও তাহাদিগকে অমর

করিয়া রাখিয়াছে। ইহারা সাত ভাই ছিল, প্রত্যেকেরই অপূর্ব্ব কীর্ত্তি-সমূহ এখনও বর্ত্তমান আছে। তাহাদের নাম—বিষ্ণুদাস, মহীভদ্রদাস, গোবর্দ্ধনদাস, হেরম্বদাস, বালিদাস, ধুস্তুরদাস ও চম্পকদাস।

বিষ্ণুদাসের কর্ত্তিত প্রশস্ত খাল, মহীভদ্রের প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা, গোবর্দ্ধনের নামে পরিচিত গোবর্দ্ধনগ্রাম ও প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা, হেরম্বের প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা, তাহার বাড়ী সম্প্রতি "আমভিটা" নামে খ্যাত। বালিদাসের নামে বালিয়ারপাড় ও প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা প্রসিদ্ধ। ধুস্তুরদাস ও চম্পকদাসের প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা সুপ্রসিদ্ধ। দুঃখের বিষয় সংস্কারের অভাবে ঐ সকল প্রকাণ্ড দীর্ঘিকার নামও কালক্রমে বিলুপ্ত হইবে।

এই গ্রামের চক্রবর্ত্তী, সরখেল ও তালুকদার বংশ ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বিশেষ সম্ভ্রান্ত ও অবস্থাপন্ন ছিলেন। ইঁহাদের প্রত্যেকেরই বিষয় সম্পত্তি ছিল। তাঁহাদের কীর্ত্তির মধ্যে চক্রবর্ত্তীর দীঘি ও সরখেলের দীঘি বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই গ্রামের কায়স্থগণও বিশেষ সম্ভ্রান্ত এবং অবস্থাপন্ন। তন্মধ্যে বসুবংশ ও গুহবংশই বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহাদেরও অনেক কীর্ত্তিকলাপ আছে। এই গ্রামের নমঃশূদ্রবংশীয় ৺পদ্মলোচন ডাক্তার অস্ত্র চিকিৎসায় বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাহার বংশধরগণও অস্ত্রচিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শী। ইহারা ব্রাহ্মণভক্ত, বিনীত ও দরিদ্রের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

এইরূপ ভক্ত-শিষ্যবহুল, ধার্ম্মিক ও সদাচার সম্পন্ন ব্যক্তিগণের আবাসভূমি চাঁদসী গ্রামে বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া ৺ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় বিশেষ দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তিনি অতিশয় তাপস ছিলেন, প্রায়ই ইষ্টমন্ত্র পুরশ্চরণে ব্যাপৃত থাকিতেন। শিষ্যবাড়ী গিয়া মন্ত্র দান করার অবসর না থাকায় শিষ্যগণ তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া মন্ত্র গ্রহণ করিতেন। তিনি দরিদ্র ছিলেন না, প্রাচীন প্রণালী অনুসারে তাঁহার বাড়ীতে কয়েকটী ক্ষুদ্র দালান নির্ম্মিত হইয়াছিল। সর্ব্বপ্রথমে

তিনি দালান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার বাড়ী আজিও “দালান বাড়ী” বলিয়া প্রসিদ্ধ।

৺ পুরুষোত্তম ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় কোন্ সময়ে চাঁদসীতে আগমন করেন, তাহার কোন নিদর্শন নাই। কিন্তু তাঁহার জীবিত কাল সম্বন্ধে কয়েকটি বিশেষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহা এই—

১। ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের স্বহস্তলিখিত একখানি চণ্ডী আছে, তাহার লিপিকাল ১৬২২ শক ১১০৭ সন (১৭০০ খ্রীঃ)।

২। তাঁহার লিখিত গীতার শেষে এই শ্লোকটি আছে—

“দেবদ্বিট্-পূজ্য-নেত্র-দ্বি-বাহুলেয়াস্য-কৌ-শকে।
অলেখি ভগবদ্গীতা টীকয়া পুরুষোত্তমৈঃ॥” ১৬২৩ শক।

এই শ্লোক অনুসারে গীতার লিপিকাল ১৬২৩ শক ১১০৮সন (১৭০১ খ্রীঃ)।

৩। ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়কে প্রদত্ত একখানি ব্রহ্মত্রের কাগজ পাওয়া গিয়াছে। তাহার লিপিকাল ১১৫১ সাল, ৭ই শ্রাবণ (১৬৬৬ শক, ১৭৪৪ খ্রীঃ)।

৪। ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়কে প্রদত্ত আর একখানি ব্রহ্মত্রের কাগজের লিপিকাল ১১৫৪সাল (১৬৬৯ শক, ১৭৪৭ খৃঃ)।

ইহার দ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে, গীতার লিপিকালে তাঁহার বয়স আনুমানিক ৪০ বৎসর হইলে (১৬২৩—৪০=১৫৮৩) ১৫৮৩ শকে (১৬৬১ খৃঃ) তিনি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। যদি চাঁদসীতে আসিয়া তিনি গীতা লিখিয়া থাকেন, তাহা হইলে (১৮৫৪—১৬২৩=২৩১) তিনি ২৩১ বৎসর পূর্ব্বে চাঁদসী গ্রামে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। তিনি যে দীর্ঘজীবী ছিলেন, সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই। কারণ, আমাদের অনুমানে ১৫৮৩ শকে (১৬৬১ খৃঃ) তিনি জন্মগ্রহণ করিলে, ১৬৬৯ শকে (১৭৪৭ খৃঃ) তাঁহাকে যে ব্রহ্মত্র দেওয়া হয়, সেই সময়ে তাঁহার বয়স ৮৬ বৎসর হইয়াছিল। সুতরাং তিনি

যে আগমোক্ত শতায়ু পুরুষ ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার বিস্তৃত বংশাবলী ও প্রতিষ্ঠা এবং তাঁহার বংশে উৎপন্ন অনেক অসাধারণ পণ্ডিত ও সাধুপুরুষ তাঁহার অলৌকিক তপশ্চর্য্যা ও সাধুতার সাক্ষী রূপে বর্ত্তমান আছে।

ইঁহার সম্বন্ধে কয়েকটী কিংবদন্তী আছে, তাহা এই—

১। এই গ্রামে একজন সমৃদ্ধিসম্পন্ন কায়স্থ ছিলেন, তিনি বর্ত্তমান বসু মজুমদার বংশীয়দিগের পূর্ব্বপুরুষও ন্যায়ালঙ্কারমহাশয়ের শিষ্য ছিলেন। তিনি সদাচারসম্পন্ন, সৎক্রিয়ান্বিত ও অত্যন্ত গুরুভক্ত ছিলেন। ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের বাড়ী ও ইহার বাড়ী খুব নিকটবর্ত্তী, বাড়ীর সীমাস্বরূপ মধ্যে একটী আড়া (বের) মাত্র ব্যবধান ছিল। বসু মজুমদার মহাশয় প্রত্যেক দিন গুরু-পাদপদ্ম পূজা না করিয়া জলগ্রহণও করিতেন না। ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় প্রত্যেক দিন নিজের সন্ধ্যা, আহ্নিক সমাপন করিয়া খড়ম পায়ে দিয়া শিষ্যবাড়ী আসিতেন। পূজার সমস্তই প্রস্তুত থাকিত, ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের আগমন হইলেই মজুমদার মহাশয় তাঁহার পদদ্বয় ধৌত করিয়া দিয়া পায়ের উপর ইষ্টপূজা করিতেন এবং পূজা শেষ হইলে, নমস্কার করিয়া ১৲ টাকা প্রণামী দিতেন। এইরূপে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইল।

মজুমদার মহাশয়ের একটী প্রিয়তম বিশ্বস্ত ভৃত্য ছিল। সে ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের তপোনিষ্ঠা ও সাধুচরিত্র দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল। সে একদিন ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের পাদদ্বয় জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, ঠাকুর! আমাকে আপনার ত্রাণ করিতে হইবে। তিনি বলিলেন, আচ্ছা দেখা যাবে। এইরূপে বহুদিন অতীত হইল, ভৃত্যটী প্রায়ই ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের নিকট কাকুতি মিনতি করে, কিন্তু ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় তাহাকে মন্ত্র দিলেন না। ভৃত্যটী হতাশ হইয়া আর এক দিন ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, প্রভু! আমি

এবার আর আপনাকে ছাড়িব না, আপনি কেবল প্রত্যাশা দিয়াই রাখিতেছেন, কবে মরিয়া যাইব তাহার বিশ্বাস নাই, সুতরাং আমার প্রতি দয়া করিতেই হইবে। বলুন, আমাকে কবে পরিত্রাণ করিবেন, নচেৎ আমি আপনাকে ছাড়িব না। পরম দয়ালু ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় ভক্তের ভক্তিপাশে আবদ্ধ হইলেন, কিছুতেই তাহাকে ত্যাগ করিতে পারিলেন না। বলিলেন, আচ্ছা এখন যাও, ৩ দিন পরে একটী দেবপর্ব্ব আছে ঐদিন তোমাকে দীক্ষিত করিব। ভৃত্যটী হাতে আকাশ পাইল, বহুদিনের অভিলাষ পূর্ণ হইবার আশা হইল। পরে ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণের উপযোগী জিনিষ সকলের ফর্দ্দ পাইয়া আনন্দিত চিত্তে বাটীতে গেল এবং অত্যন্ত আগ্রহের সহিত সাধ্যানুসারে সমস্ত যোগাড় করিল। দীক্ষা গ্রহণের পূর্ব্বদিন সে তাহার মনিব মজুমদার মহাশয়কে বলিল, কল্য আমার বিশেষ দরকার আছে, আমি আসিতে পারিব না, আমার স্থানে আর একটী লোক পাঠাইয়া দিব। শুভদিনে মন্ত্র গ্রহণের সমুদয় উদ্‌যোগ ও আয়োজন হইল। ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় অতি প্রত্যূষে সন্ধ্যা, আহ্নিক করিয়া ভৃত্যের বাড়ী মন্ত্রদান করিতে গমন করিলেন। তাঁহাকে আবার যথাসময়ে মজুমদার মহাশয়ের বাড়ী আসিয়া পূজা গ্রহণ করিতে হইবে, সুতরাং খুব সকালেই দীক্ষাদানে প্রবৃত্ত হইলেন। ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় ভাবিয়াছিলেন, দীক্ষাদানকার্য্য শেষ করিয়া যথাসময়েই শিষ্যবাড়ীতে যাইতে পারিবেন, কিন্তু কার্য্যবাহুল্য বশতঃ তাহা ঘটিয়া উঠে নাই।

এদিকে বেলা দুই প্রহর অতীত হইল। মজুমদার মহাশয় পূজার উপকরণ সামগ্রী লইয়া গুরুর প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন, কিন্তু গুরুদেব আসিলেন না। তখন তাঁহার বাড়ীতে গুরুদেবের অনুসন্ধানের জন্য একজন লোক পাঠাইলেন, কিন্তু তিনি কোথায়, তাঁহার কোন সংবাদ কেহ বলিতে পারিল না। তখন মজুমদার মহাশয় গ্রামের প্রত্যেক

বাড়ীতে অনুসন্ধান করিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। কারণ, তিনি জানিতেন, ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় গ্রাম ছাড়িয়া অন্য কোন স্থানে গমন করেন না। গ্রামের সর্ব্বত্র তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া সেই ভৃত্যের বাড়ীতে জীর্ণকুটীরের মধ্যে ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়কে একটী লোক দেখিতে পাইল। ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় তখন দীক্ষার অঙ্গীভূত হোম আরম্ভ করিয়াছেন। সেই লোকটী মজুমদার মহাশয়ের নিকট গিয়া ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের সংবাদ বর্ণনা করিল। অভিমানী মজুমদার মহাশয় এই সংবাদ পাইয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। যাহা হউক, নিত্য অনুষ্ঠিত কার্য্যের বাধায় প্রত্যবায়ের আশঙ্কা থাকায় নিষ্ঠাবান্ মজুমদার মহাশয় গুরুর প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলেন। বেলা প্রায় ৩য় প্রহরের সময় গুরুদেব আগমন করিলেন; মজুমদার মহাশয় অন্যান্য দিনের ন্যায় এদিনও যথাবিহিত ভাবে গুরুপূজা সম্পন্ন করিলেন। পরে প্রণামীর টাকাটী দিয়া নমস্কার পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে গুরুদেবকে বলিলেন—গুরুদেব! আপনার পাদপদ্ম পূজা আমার আজ-পর্য্যন্তই শেষ! আজ তাহার দক্ষিণা করিলাম। আবার যদি কখনও সৌভাগ্য হয়, তবে সংবাদ দিব, নচেৎ ক্লেশ করিয়া এ অধম শিষ্যের বাড়ী আসিবার প্রয়োজন নাই। ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় ভক্ত শিষ্যের এইরূপ ভাবান্তর দেখিয়া কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হইয়াছে বল দেখি? তোমার এইরূপ বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটিল কেন? আমার বোধ হয়, তোমার কোন সন্নিহিত বিপদ্ এইরূপ বুদ্ধিভ্রংশ জন্মাইয়াছে। তখন মজুমদার মহাশয় ধৈর্য্য ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, ঠাকুর! আমার কাণেও যে মন্ত্র, আমার ভৃত্যের কাণেও সেই মন্ত্র! আমি ইহাতে নিতান্ত অবজ্ঞাত ও অপমানিত হইয়াছি। ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় এই কথা শুনিয়া ধীরভাবে বলিলেন দেখ, আজ তুমি ও তোমার ভৃত্য আমার নিকট তুল্য। আমার অন্যান্য যে সকল সম্ভ্রান্ত ও ধনী শিষ্য আছে, তাহারাও আজ

আমার চক্ষে তোমার ভৃত্যের সমান আসন পাইবার যোগ্য, আমার নিকট সকলেই তুল্য। যাহা হউক, তোমাদের কাণে মন্ত্র দেওয়া আমারও এই পর্য্যন্ত শেষ, ইহা বলিয়া ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় গৃহাভিমুখে গমন করিলেন।

ভগবানের কি বিচিত্র লীলা! সাত দিনের মধ্যেই মজুমদার মহাশয়ের গৃহদাহ, একপক্ষের মধ্যেই উপযুক্ত পুত্রাদি বিয়োগ প্রভৃতি দৈব উৎপাত আরম্ভ হইল। মজুমদার মহাশয় তখন নিতান্ত অনুতপ্ত ও মৃতপ্রায় হইলেন। গ্রামের লোকেরা নিতান্ত প্রমাদ গণিল ও মজুমদার মহাশয়কে ইহার প্রতিকারের জন্য উপদেশ দিল। এই অপরিহার্য্য ব্রহ্মবিষ সমূলে বংশকে ধ্বংস করিবে বলিয়া সকলেই আশঙ্কা করিল। পরে গ্রামের সমস্ত লোক একত্র হইয়া মজুমদার মহাশয়কে লইয়া ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের শরণাগত ও কৃপাপ্রার্থী হইলেন। ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় বলিলেন—আমার বাক্য কিছুতেই অন্যথা হইবে না। আমি আর ইহাদের কাণে মন্ত্র দিব না। পরে তাহারা অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের পদধূলি প্রার্থী হইলেন। বলিলেন যে, বশিষ্ঠদেব রঘুবংশীয় নরপতিগণের গুরু ও পৌরোহিত্যের কার্য্য করিয়াছেন, সুতরাং উভয়পদই তুল্যসম্মানার্হ। আপনি যদি নিতান্তই গুরুর কার্য্য করিতে অস্বীকৃত হন, তাহা হইলে অন্ততঃ পৌরোহিত্য স্বীকার করিয়া এই নিরাশ্রয় ও বিপন্ন বংশকে রক্ষা করুন। ইহাতে আপনার মর্য্যাদার হানি হইবে না। যে কোনরূপেই হউক, আপনার ইহাদের কল্যাণকামী হইতে হইবে। পূজক বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা সমুদয় ক্রিয়াকর্ম্মের সমস্ত আয়োজন করিয়া দিবে, আপনি কেবল মাত্র আসনে বসিয়া পূজাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আসিবেন। সকলের অনুরোধে ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় পৌরোহিত্য স্বীকার করিলেন। বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরাও তাঁহার শিষ্য ছিল। সমস্ত কার্য্যের আয়োজন করিয়া দিবার জন্য তাহাদের একটী বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হইল। তাহারা শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে যজ্ঞেশ্বরের ভাগ পাইবেন বলিয়া স্থির হইল। অদ্য পর্য্যন্তও এই

ব্যবস্থা বর্ত্তমান আছে। সম্প্রতি বিশেষ কোন কারণে অসন্তুষ্ট হইয়া ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের বংশধরগণের মধ্যে অনেকেই তাঁহাদের পৌরোহিত্য ত্যাগ করিয়াছেন।

২। ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের উদারতা সম্বন্ধেও অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এইরূপ প্রসিদ্ধ আছে যে, ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় কোটালীপাড়া পরিত্যাগ করিয়া চাঁদসী গ্রামে গমন করিলে, তাঁহার ভ্রাতৃগণ অত্যন্ত বিমনায়মান ও সহায়হীন হইলেন। তখন তাঁহারা চাঁদসী গ্রামে নিয়ত যাতায়াতের এমন একটী সুযোগ চিন্তা করিতে লাগিলেন, যাহাতে ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের সহিত মধ্যে মধ্যে দেখা শুনা হইতে পারে। ৺হরিনারায়ণ তর্কালঙ্কার মহাশয় মনে করিলেন, যদি চাঁদসীতে একঘর শিষ্য থাকে, তবে সেই উপলক্ষে ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার সুযোগ ঘটিবে। বলা বাহুল্য, চাঁদসী গ্রামের বারেন্দ্র শ্রেণী, সরখেল ও সমুদয় সম্ভ্রান্ত কায়স্থগণ ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের শিষ্য ছিল। তর্কালঙ্কার মহাশয় এক পর্ব্বোপলক্ষে চাঁদসী গ্রামে আগমন করিলেন এবং ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের অভিমত না লইয়াই একঘর বসুবংশ ও সরখেল বংশকে মন্ত্র দিলেন। মন্ত্র দান করিয়া ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের বাড়ী উপস্থিত হইয়া ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের সহিত লজ্জায় দেখা করিলেন না, ভ্রাতৃবধূর নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন এবং বলিলেন যে, এই মন্ত্রদান দ্বেষ বা প্রবঞ্চনামূলক নহে, কিন্তু অন্ততঃ বৎসরান্তে একবার এখানে আসিয়া সকলের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিবার একটী উপলক্ষ মাত্র। এই বলিয়া তিনি একখানি কন্থাদ্বারা সমস্ত শরীর আবৃত করিয়া কপট নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। এইরূপ প্রবঞ্চনা করিয়া শিষ্যমন্ত্র দেওয়ায় ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় অসন্তোষ প্রকাশ করেন কিনা ইহা শ্রবণ করাই ঐ কপট নিদ্রার উদ্দেশ্য ছিল। যাহা হউক; ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় বাড়ীর মধ্যে গিয়া দেখিলেন, একটী লোক সমস্ত শরীর একখানি কাঁথা দিয়া

ঢাকিয়া শুইয়া আছে। ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় সহধর্ম্মিণীর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কে শুইয়া আছে? তিনি উত্তর করিলেন, আপনার দাদা আসিয়াছেন। ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় বলিলেন, আমার সহিত দেখা না করিয়া, এরূপভাবে শুইয়া আছেন কেন, শরীর ত কোনরূপ অসুস্থ হয় নাই? ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের স্ত্রী বলিলেন তা নয়, বিশেষ কোন কারণ আছে। ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, বিশেষ কারণ আবার কি? তাঁহার পত্নী ঈষৎ হাস্য করিয়া সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন, এবং বলিলেন ইনি লজ্জায় এবং আপনি কি বলেন সেই জন্য দেখা করিতে সাহসী হন নাই। ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, দাদা! আমার শিষ্যকে মন্ত্র দিয়াছেন ইহাতে লজ্জার কারণ কি আছে? আমার শিষ্যে আপনাদের সম্পূর্ণ অধিকার আছে, আমি ও আপনি তো একই পিতার সন্তান। ইচ্ছা হইলে, আরও ২।১ ঘর মন্ত্র দিতে পারেন। এই বলিয়া তিনি তর্কালঙ্কার মহাশয়কে বিনয় ও সম্মানের সহিত বিছানা হইতে উঠাইলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় লজ্জায় অধোবদন হইলেন। পরে আহারাদি করিয়া কোটালীপাড়ায় গমন করিলেন।

৩। ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় যখন কোটালীপাড়া ত্যাগ করিয়া চাঁদসীতে আগমন করেন, তখন তাঁহার বিষয় সম্পত্তি ও বসতবাড়ী প্রভৃতি ভ্রাতৃগণকে দান করিয়া আসিয়াছিলেন। বর্ত্তমানকালে সূচ্যগ্র স্থানও কেহ কাহাকে দেয় না, বরং তাহা লইয়া চিরকালের জন্য বিরোধ স্থাপনা করে। ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় ভবিষ্যৎ বিরোধ-সূত্র ছিন্ন করিয়া যে ঐ স্থান দান করিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু বিক্রয় করেন নাই, এজন্য তাঁহার মহত্ত্ব সমধিক উজ্জ্বল হইয়াছে, এবং বংশের গৌরবও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

৪। ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের একখানি বৃহৎশিলাখণ্ড ছিল। তাঁহার সহধর্ম্মিণী সরস্বতী দেবী ঐ শিলাখণ্ডে মরিচ, লঙ্কা প্রভৃতি পাকের সমস্ত মসল্লা কুট্টন করিতেন। পরে মসল্লা পেষণের জন্য একখানি শিলা সংগৃহীত

হইলে, পূর্ব্বোক্ত বৃহৎ শিলাখানি উঠান হইতে ঘরে উঠিতে সোপানের ন্যায় স্থাপন করিলেন। ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের পত্নী প্রত্যেক দিন ঐ শিলাখণ্ডের উপর পা ঘসিয়া প্রক্ষালনপূর্ব্বক শয়ন করিতে যাইতেন। এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে পতিব্রতা সরস্বতী দেবী স্বপ্নে দেখিলেন—স্বয়ং আশুতোষ স্বমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাহাকে বলিতেছেন, "আর জ্বালায় বাঁচি না, পায়ের ঘসায় আমার গায়ের চামড়া ছিড়িয়া গেল, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাড়ীতে আমার এত অপমান হইলে, আমাকে কে সম্মান করিবে? আগে, আমার বুকের উপর লঙ্কা, মরিচ প্রভৃতি বাটনা বাটিত, সে জ্বালা আমার এখনও কমে নাই"। তখন সরস্বতী দেবী স্বপ্নাবেশে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঠাকুর! তুমি কে? তিনি বলিলেন, আমি চিরদিন তোমাদের শুভানুধ্যায়ী, আমার এত লাঞ্ছনা কেন? আমাকে চিন না? তোমার স্বামী আমার পূজা না করিয়া জলগ্রহণও করেন না। সরস্বতী দেবী স্বপ্নচ্ছলে ভাগ্যবশে সেই দেবাদিদেব মহাদেবের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া ভক্তি গদ্‌গদকণ্ঠে তন্ময় হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন—

"ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারু-চন্দ্রাবতংসং।"

তাঁহার সেই বাষ্পগদ্‌গদ কণ্ঠস্বর শুনিয়া বাড়ীর সকলে জাগরিত হইল। সরস্বতী দেবী তখন অচেতন। তিনি তন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়া বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়াছেন। কিছু ক্ষণ পরে তাঁহার সংজ্ঞালাভ হইল। রাত্রিও প্রভাত হইল। তখনও তাঁহার ভাবাবেশ রহিয়াছে, বাক্যস্ফূর্ত্তি নাই, নয়নদ্বয় হইতে অবিরল ধারায় আনন্দাশ্রু নির্গলিত হইতেছে। পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের নিকট আমূল স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় স্বপ্নবৃত্তান্ত অবগত হইয়া বলিলেন—

ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং সফলং জীবিতং মম।
যদস্য জগতামীশঃ সুপ্রসন্নো মহেশ্বরঃ॥

তিনি এই স্বপ্নবৃত্তান্তে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, এবং এই প্রকার

সাধ্বী রমণীকে সহধর্ম্মিণীরূপে প্রাপ্ত হইয়া নিজকে ধন্য মনে করিলেন। পরে শুভদিনে বিশেষ আড়ম্বর ও উৎসাহের সহিত অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া সেই শিলাখণ্ডকে শিবমন্ত্রে প্রতিষ্ঠা করিলেন। আজ পর্য্যন্ত তিনি "বুড়াশিব" নামে অভিহিত ও পূজিত হইয়া আসিতেছেন। মৎপ্রণীত শব্দরূপ-কল্পতরুগ্রন্থেও ইহা উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—

প্রগে হৃদজে স্মরণীয়-মূর্ত্তি র্দয়াবর্তী পুণ্যবতী বদান্যা।
যোচ্চাবচে সত্ত্যুপলৈকখণ্ডে দেবত্বমারোপিতবত্যবস্থে॥

ইত্যাদি।

এই বংশে অনেক সাধু পুরুষ ও খ্যাতনামা পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়া এই বংশকে উজ্জ্বল করিয়াছেন।

বর্ত্তমান পণ্ডিত গণের নাম—শ্রীহরনাথ শাস্ত্রী, "কাশীনাথ বিদ্যারত্ন, "কাশীকান্ত স্মৃতিরত্ন, "কালীজীবন ব্যাকরণ-সাংখ্যতীর্থ (জন্মান্ধ) "কালীমোহন কাব্যতীর্থ (হেড্ পণ্ডিত), "চিন্তাহরণ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ (হেড্ পণ্ডিত), "অম্বিকাচরণ স্মৃতিভূষণ, "গঙ্গাধর জ্যোতির্ভূষণ, "কৈলাস চন্দ্র জ্যোতীরত্ন, "হরিদাস বিদ্যারত্ন, "কালীকুমার জ্যোতির্ভূষণ "দেবেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, "বিশ্বেশ্বর কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ বিদ্যারত্ন ভক্তিবিনোদ পুরাণশাস্ত্রী, "দীননাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ, "সীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ ( ) "লক্ষ্মীকান্ত কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্যতীর্থ, "সতীকান্ত শিরোমণি কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ. ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে অনেকেরই টোল আছে।

ইংরেজী শিক্ষিতগণের নাম—শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি, এ, বি, এল, "কুঞ্জবিহারী ভট্টাচার্য্য বি, এ, (হেড্‌মাষ্টার), ৺ব্রহ্মানন্দ কাব্যতীর্থ বি, এ, "বরদাকান্ত ভট্টাচার্য্য বি, এ, "সুরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য্য বি, এ, "কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্য্য এম্, এ, ইত্যাদি।

খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ—

৺কমলাকান্ত তর্কবাগীশ

ইনি ৺পুরুষোত্তম ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি তাপস ও সুপণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইঁহার পুত্র রামচন্দ্র ন্যায়বাগীশ মহাশয়ের বংশধরগণের বাড়ীর দরজায় মহীভদ্র নামক দীঘীর পাড়ে একখানি সুপ্রতিষ্ঠিত পঞ্চমুণ্ডী কালী বিশেষ প্রসিদ্ধ। ন্যায়বাগীশ মহাশয়ের বংশধরগণই এই ৺কালীমাতার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা ৺কালীমাতার পাষাণময়ী মূর্ত্তি ও নূতন গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই কার্য্যে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের অসীম অধ্যবসায় বিশেষ প্রশংসনীয়। শুনা যায়, রামপ্রসাদ সাবর্ণ নামক একজন সাধক পুরুষ ঐ ৺কালীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি তীর্থভ্রমণাদি উপলক্ষে দেশান্তরে গমন করিলে, প্রতিষ্ঠিত দেবতার অর্চ্চনাবাধের ভয়ে ন্যায়বাগীশ মহাশয়ের সন্তানেরা যত্নের সহিত ৺কালীমাতার অর্চ্চনা করেন। অদ্য পর্য্যন্তও ৺কালীমাতার পূজা বিশেষ সমারোহের সহিতই তাঁহারা সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন।

এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, এই ৺কালীবাড়ীতে একজন বৈদ্য ও একজন গুহবংশীয় কায়স্থ সাধক গুরুর আদেশ অমান্য করিয়া, ভাদ্রমাসের অমাবস্যা রজনীতে সদ্যঃ সিদ্ধিলাভ করিতে গিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একজন উত্তরসাধক ভীত হইয়া পলায়ন কালে প্রায় অর্দ্ধমাইল দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া হস্তপদ ভগ্ন হইয়া অচেতন অবস্থায় পড়িয়াছিলেন। অপর সাধক বিভীষিকা দর্শনে সমাধি ভঙ্গ হওয়ায় ভীত হইয়া পলায়নোদ্যত হইলে এক আছাড়ে তাহারও জীবলীলা সাঙ্গ করিয়া মহীভদ্রের দীঘীর ঢিপির (ধাপের) নীচে তাহাকে রাখা হইল। বাড়ীর লোক সকল বিকট শব্দ শুনিয়া আলো নিয়া বিশেষ অনুসন্ধানে দুই জনকেই প্রাপ্ত হইলেন। উত্তরসাধক হস্তপদ ভগ্ন অবস্থায় কিছুদিন জীবিত ছিলেন। এখনও এই ৺কালী বাড়ী দিয়া একাকী সন্ধ্যার পরে কেহ যাইতে সাহসী হয় না।

৺গঙ্গানন্দ সার্ব্বভৌম

ইনি ৺পুরুষোত্তম ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র। ইনি একজন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। ইহাঁর স্বহস্ত লিখিত একখানি চণ্ডী এখনও গ্রন্থকারের গৃহে সযত্নে রক্ষিত আছে। উহার লিপিকাল ১৬৬৩ শকাব্দা (১৭৪১ খৃঃ)। এই পুস্তকখানি অন্ততঃ তাঁহার ৩৫ বৎসর বয়সে লিখিত হইলে, অনুমান করা যায় তিনি ১৬২৮ শকে (১৭০৬ খ্রীঃ) জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি পঞ্চমুণ্ডী ৺কালী প্রতিষ্ঠিত করিয়া তপোনিষ্ঠার বিশেষ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। এই ৺কালীমাতা শ্মশানক্ষেত্রের নিকট গহন অরণ্যের মধ্যে অবস্থিত ছিলেন। এখন আর মন্দিরের নিকটে কোন জঙ্গল নাই। কয়েক বৎসর হইল, এই মন্দিরটী ইষ্টকময় গৃহে পরিণত হইয়াছে। এই বংশে অনেক খ্যাতনামা পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই বংশের খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ—

৺উদয় চন্দ্র তর্কালঙ্কার

ইনি ৺কৃষ্ণনারায়ণ ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের পুত্র। স্বনামখ্যাত ৺ গঙ্গানন্দ সার্ব্বভৌম মহাশয়ের পৌত্র। ইনি স্মৃতিশাস্ত্রে একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার হস্ত লিখিত বহু গ্রন্থ এখনও বিদ্যমান আছে। এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, বাক্‌লা সমাজের মিলিত পণ্ডিতগণের সহিত ইনি একাকী বিচার করিয়া বিজয়লাভ করিয়াছিলেন। পণ্ডিতমণ্ডলী ইঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও সূক্ষ্ম বিচারনৈপুণ্য দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বিচারে পরাজিত হইয়া নিতান্ত অপমান বোধ করায়, বাক্‌লার পণ্ডিতসমাজ সভাস্থলেই ইহাঁকে অভিশাপ প্রদান করেন। সেই ব্রহ্মশাপেই ইঁহার অকাল মৃত্যু হয়। ইঁহার লিখিত কয়েকখানি পুস্তক গ্রন্থকারের গৃহে সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্বের লিপিকাল ১৭৪০ শক, (১৮১৮ খৃঃ) এবং বিরাটপর্ব্বের লিপিকাল ১৭৪৪ শক (১৮২২ খ্রীঃ)। তাঁহার অধ্যয়নের সময়ে প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্ব লিখিত হইলে, তখন

তাঁহার আনুমানিক বয়স ২৩ তেইশ বৎসর ধরা যাইতে পারে। সুতরাং ১৭১৭ শকে (১৭৯৫ খ্রীঃ) তিনি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। ইনি সমগ্র অষ্টাবিংশতি-তত্ত্ব স্বহস্তে লিখিয়া গিয়াছেন।

৺উদয় চন্দ্র তর্কালঙ্কার মহাশয়ের জন্ম ১৭১৭ শকে (১৭৯৫ খৃঃ) হইলে, যদি তিনি তাঁহার পিতার ৪৫ বৎসরে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে (১৭১৭ — ৪৫ = ১৬৭২) ১৬৭২ শকে (১৭৫৩ খৃঃ) কৃষ্ণনারায়ণ ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের জন্ম ধরা যাইতে পারে। তিনি তাঁহার পিতার ৪৪ বৎসর বয়সে জন্মগ্রহণ করিলে (১৬৭২ — ৪৪ = ১৬২৮) ১৬২৮ শকে (১৭০৬ খৃঃ) ৺গঙ্গানন্দ সার্ব্বভৌম মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে।

৺বিশ্বেশ্বর ন্যায়ভূষণ

ইনি স্মৃতিশাস্ত্রের একজন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। ইনি রাজসাহী বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভার আচার্য্যপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। অধ্যাপনায় ও নির্ভুল ব্যবস্থায় ইঁহার বিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল। ইনি নিষ্ঠাবান্ ও তেজস্বী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন। প্রবাদ আছে যে, ইনি কোন রাজবাড়ীর একজন কুষ্ঠ রোগীকে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। রাজপুরুষেরা বলিয়াছিলেন, শাস্ত্রবিহিত ব্যবস্থাই দিবেন, কিন্তু রোগ আরোগ্য না হইলে আর শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা মান্য করিব না। ন্যায়ভূষণ মহাশয় শাস্ত্রবিধান অনুসারে ব্রতের অনুকল্প "কড়ি" দানের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। কিন্তু শাস্ত্রের বিধান অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিয়াও সেই ব্যক্তি রোগ মুক্ত না হওয়ায় ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের নিকট পুনরায় আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং বলে যে, আপনাদের এ সবই ফাকি, কেবল একটা উপার্জ্জনের পন্থা মাত্র। এই কথা শুনিয়া ন্যায়ভূষণ মহাশয় অত্যন্ত বিষণ্ণ হইলেন, এবং বলিলেন, আপনি তিন দিন পরে আসিবেন, আমি বিবেচনা করিয়া দেখিব ব্যবস্থায়

কোন ভুল হইয়াছে কিনা। সেই ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট দিনে আসিয়া উপস্থিত হইল। ন্যায়ভূষণ মহাশয় বলিলেন, ব্যবস্থায় ভুল হইয়াছে। আপনার মত সমর্থ রাজার পক্ষে গোদান করিতে হইবে। কড়িদানে প্রায়শ্চিত্ত সিদ্ধ হয় নাই। সে ব্যক্তি বলিল, আপনি যাহা ব্যবস্থা করিয়া দিবেন আমি পুনরায় তাহাই করিব, কিন্তু যদি রোগ আরোগ্য না হয়, তাহা হইলে এই অতিরিক্ত খরচের জন্য আপনি দায়ী হইবেন, এই প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে। তিনি নির্ভীক চিত্তে উত্তর দিলেন, নিশ্চয়ই সারিবে, শাস্ত্রের একটি বর্ণও মিথ্যা নহে। যদি না সারে, প্রায়শ্চিত্তের সম্পূর্ণ খরচ আমি বহন করিব। কি আশ্চর্য্য! যথারীতি পুনরায় প্রায়শ্চিত্ত হইল, রোগী অল্পদিনের মধ্যেই বিনা ঔষধে নিরাময় হইলেন। ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের প্রতিষ্ঠা চতুর্দ্দিকে বিস্তৃতি লাভ করিল। তিনি রাজবাড়ী হইতে বিশেষরূপে পুরস্কৃত হইলেন, এবং চিরকালের জন্য তাঁহার ব্যবস্থাই রাজবাড়ীতে গৃহীত হইল।

৺কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ।

ইনি বেদান্তশাস্ত্রে একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। ইনি অসাধারণ বাগ্মী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার বক্তৃতার মাধুর্য্যে সভাস্থ সকলেই মুগ্ধ হইত। বঙ্গদেশে ইহার মত ধর্ম্মবক্তা খুব বিরল ছিল। ইঁহার দীর্ঘশ্মশ্রু ছিল. ইনি রুদ্রাক্ষমালা ধারণ করিয়া বিভূতিভূষিত অঙ্গে যখন জয় শঙ্কর জয় শঙ্কর শব্দ করিয়া বহির্গত হইতেন, তখন তাঁহার আকৃতি একটী ঋষির ন্যায় দেখাইত। ইনি অত্যন্ত তেজস্বী এবং ত্যাগী ছিলেন। ইনি কলিকাতা ৺কালীঘাটে অবস্থান করিয়া অনেক ছাত্রকে অন্নদান করিয়া পড়াইতেন। ইঁহার বাড়ীতে গিয়া আহার না করিয়া কেহই ফিরিয়া আসিতে পারিত না। ইঁহার সমকালে প্রসিদ্ধ বক্তা ৺শশধর তর্কচূড়ামণি ও শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন বঙ্গদেশে বাগ্মী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার বক্তৃতায়ও শাস্ত্র ব্যাখ্যায় বর্ণাশ্রম-

সমাজবিধ্বংসী ব্রাহ্মসমাজের প্রবল প্রয়াস সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছিল। বায়-ব্যাস্ত্রের ন্যায় ইঁহার অকাট্য যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা সকল দিঙ্মণ্ডলব্যাপক মোহজনক প্রলয়-জলদজালের ন্যায় বিপক্ষগণের মত সকলকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া উড়াইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিল। ইনি ১৭৬১ শকে (১২৪৬ সালে) ৬ই অগ্রহায়ণ বুধবার পূর্ণিমা তিথিতে জন্ম গ্রহণ করেন। এবং ১৩১২ সালে (১৮২৭ শকে) বৈশাখ মাসে সজ্ঞানে ৺গঙ্গালাভ করিয়া পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত হরনাথ শাস্ত্রী।

ইনি দীর্ঘকাল যাবৎ কলিকাতায় বাস করিতেছেন এবং বহুদিন যাবৎ অপত্য নির্বিশেষে বহু ছাত্রকে অন্নদান করিয়া অধ্যাপনায় ব্যাপৃত আছেন। কলিকাতায় এইরূপ চতুষ্পাঠী অতি অল্পই আছে। এই টোলের উৎকর্ষ দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট ও কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটী বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকেন। ইনি কলিকাতা "বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভার" অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ইঁহার মত ত্যাগী, তেজস্বী ও নির্ভীক স্পষ্টবাদী লোক পণ্ডিতসমাজে বিরল। ইনি চিরজীবন পরোপকার কার্য্যে ব্রতী রহিয়াছেন। বিশেষতঃ, কোটালী-পাড়ার প্রবল ঝটিকায় বিপন্ন ও কিছুদিন পরে তত্রত্য ভীষণ জলপ্লাবন এবং দুর্ভিক্ষে নিরন্ন নরনারীগণের সাহায্যার্থ প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। ইঁহার ন্যায় পরদুঃখকাতর মহাপুরুষ বর্ত্তমান যুগে দুর্লভ। ইনি ভট্টিকাব্যের ৪র্থ সর্গ পর্য্যন্ত একটী প্রাঞ্জল টীকা ও নিত্যকর্ম্ম-পদ্ধতি নামে একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ইনি কলিকাতা সংস্কৃত এসোসিয়েশনের মেম্বর ও গবর্ণমেণ্টের দর্শনশাস্ত্রের উপাধি পরীক্ষার পরীক্ষক ছিলেন। ইনি কলিকাতা আর্য্য বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ (প্রিন্সিপাল)। মহারাণী ৺ভিক্টোরিয়ার ৬০ বৎসর রাজত্বের জুবিলি উৎসবের সময় বঙ্গদেশের মধ্যে একমাত্র ইঁহার টোলেই ছাত্রগণের ভোজনার্থ টাকা প্রদত্ত হইয়াছিল। ইনিই বহু চেষ্টা করিয়া সর্ব্বপ্রথমে মিউনিসিপালিটী হইতে

টোলের সাহায্য প্রবর্ত্তন করেন। ইঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রবল উদ্যমের ফলে এখন বহু টোলেই মিউনিসিপালিটীর সাহায্য প্রাপ্ত হইতেছেন। ইনি একজন সুকবি ও বক্তা বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত। পণ্ডিত সমাজ ইঁহাকে বিশেষ সম্মান করিয়া থাকেন। বিষয়ী সমাজেও সকলেই ইঁহাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি দিয়া থাকেন।

৺ভগবান্‌চন্দ্র জ্যোতির্ভূষণ

ইনি একজন ভাল তান্ত্রিক ও তাপস বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ পীঠস্থান ৺তারাপুরে বাস করিয়া ইনি অনেক মহাপুরশ্চরণ করিয়াছেন। বর্দ্ধমানের রাজার পোষ্যপুত্রের মোকদ্দমায় ইনি জিদ করিয়া মোকদ্দমায় জয়লাভ করাইয়া দিবেন বলিয়া স্বস্ত্যয়ন করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, ঐ মোকদ্দমায় হাইকোর্ট পর্য্যন্ত পরাজয় হইয়াছিল। ইঁহার সাহসেই বিলাতের প্রিভিকাউন্সিলে ঐ মোকদ্দমার আপীল হইয়াছিল। ইনি বলিয়াছিলেন, এই মোকদ্দমায় আমি নিশ্চই জিতাইয়া দিব ; কিন্তু রাজ-সরকার হইতে আমার পুরস্কারের ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে। ফলতঃ, সেই মোকদ্দমায় জয়লাভ হইল। রাজসরকার হইতে বিশেষ পুরস্কারের ব্যবস্থাও হইয়াছিল। তিনি জীবিতকাল পর্য্যন্ত বর্দ্ধমানের রাজবাড়ী হইতে মাসিক বৃত্তি পাইতেন। ইঁহার স্বস্ত্যয়নের অব্যর্থ ফল বহু স্থানেই দেখা গিয়াছে।

ইনি ৺গঙ্গানন্দ সার্ব্বভৌম মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত "পঞ্চমুণ্ডী ৺কালীর" ইষ্টকময় মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া ঐহিক যশঃ ও পারত্রিক সুখলাভের অধিকারী হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র জ্যোতীরত্ন

ইনি জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। কোষ্ঠীর ফলবিচারে ইঁহার বিশেষ খ্যাতি আছে। ইঁহার গণনায় সন্তুষ্ট হইয়া, বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ লেখক ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও কবি নবীনচন্দ্র সেন

প্রভৃতি উচ্চপদস্থ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি অযাচিতভাবে ইঁহাকে প্রশংসাপত্র দিয়াছেন। ইঁহার সদ্ব্যবহার সদালাপ ও ত্যাগ স্বীকারে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। ইনি সম্প্রতি রাণাঘাটে থাকেন। শিষ্যবর্গ ইঁহাকে সিদ্ধপুরুষের ন্যায় মান্য করিয়া থাকে।

৺দুর্গানাথ জ্যোতিভূর্ষণ

ইনি জ্যোতিষশাস্ত্রে একজন বিচক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন। করকোষ্ঠী ও স্ফুটগণনায় ইঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। জ্যোতিষের অনেক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ইঁনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তন্ত্রশাস্ত্রেও ইঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল।

শ্রীযুক্ত কাশীনাথ বিদ্যারত্ন

ইনি চাঁদসী "পুরুষোত্তম চতুষ্পাঠীর" অধ্যাপক। ছাত্রদিগকে অন্নদান করিয়া দীর্ঘকালযাবৎ অধ্যাপনায় নিরত আছেন। ইনি বিষয়কার্য্যেও বিশেষ বুদ্ধিমান্ বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। ইনি একাকী নিরপেক্ষ-ভাবে সালিশী করিয়া উভয় পক্ষের তুষ্টিসাধন পূর্ব্বক অনেক গ্রাম্য বিবাদের নিষ্পত্তি করিয়াছেন। আদ্য, মধ্য ও উপাধির বহুছাত্র বহুশাস্ত্রে ইঁহার নিকট হইতে গবর্ণমেণ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইহাঁর টোলে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সাহায্য আছে। ইনি হিতোপদেশীয় মিত্রলাভের একখানি টীকা লিখিয়া ছাত্র ও পণ্ডিতসমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। ইনি একটী জন্মান্ধ ছাত্রকে পড়াইয়া বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়া গবর্ণমেণ্ট হইতে পুরস্কৃত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত কালীজীবন ব্যাকরণ-সাংখ্যতীর্থ

ইনি জন্মান্ধ হইয়াও শ্রীযুক্ত কাশীনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের যত্নাতিশয়ে সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। ইনি অনর্গল সংস্কৃত বলিতে পারেন। ইনি অত্যন্ত প্রতিভাশালী ও মেধাবী। কলিকাতা ভবানীপুরে ইহার চতুষ্পাঠী আছে।

শ্রীসীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ

ইনি দীর্ঘকাল যাবৎ অধ্যাপনাকার্য্যে ব্রতী আছেন। ইনি ইতিপূর্ব্বে চট্টগ্রাম "জগৎপুর আশ্রম" টোলে দীর্ঘকাল প্রশংসার সহিত অধ্যাপনা করিয়াছেন। অধ্যাপনায় কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য ইনি দুইবার গবর্ণমেণ্ট হইতে বিশেষ (স্পেশাল) পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। "জগৎপুর আশ্রম" হইতে দ্বাদশবর্ষীয় একটী বালককে ইনি উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করাইয়া পুরস্কৃত হইয়াছেন। ইনি ১৩০০ বঙ্গাব্দে প্রথমে চাঁদসী "পুরুষোত্তমচতুষ্পাঠী" নামক টোলের প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি "কলিকাতা আর্য্যবিদ্যালয়ের" অন্যতম অধ্যাপক ও ১৩৩৮ সালে বঙ্গদেশে সুপ্রসিদ্ধ "সংস্কৃত-সাহিত্যপরিষদের" আচার্য্য পদ গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি কলিকাতার "সংস্কৃত মহামণ্ডল" ও "সংস্কৃত পদ্যগোষ্ঠীর" সহকারী সভাপতি ছিলেন। ইনি কলিকাতা সংস্কৃত-পরীক্ষাবোর্ড ও আসাম সংস্কৃতপরীক্ষাবোর্ড কর্ত্তৃক গৃহীত পরীক্ষায় দর্শনাদি নানা শাস্ত্রের উপাধি পরীক্ষায় পরীক্ষক নিযুক্ত আছেন। ইনি কলিকাতা "সংস্কৃত এসোসিয়েসন" এবং "বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের" অন্যতম সদস্য। ইহার সঙ্কলিত কলাপ-ব্যাকরণের "চতুষ্টয়বৃত্তি" নামক গ্রন্থ ইংরেজী ১৯১৪ সন হইতে সংস্কৃত পরীক্ষাবোর্ড কর্ত্তৃক কলাপ-ব্যাকরণেয় মধ্য ও উপাধি পরীক্ষার পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে। ইনি অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকাশ ও প্রণয়ন করিয়াছেন। যথা—

১। কাতন্ত্র-সূত্রম্
২। কাতন্ত্রগণমালা (মূল)
৩। কাতন্ত্রগণমালার "শিশুবোধিনী" টীকা।
৪। সন্ধিবৃত্তিঃ (বঙ্গানুবাদসহ)
৫। চতুষ্টয়বৃত্তিঃ (বঙ্গানুবাদসহ)
৬। আখ্যাতবৃত্তিঃ (বঙ্গানুবাদসহ)
৭। কাতন্ত্রসঞ্জীবনী (কলাপটীকা)
৮। শব্দরূপ-কল্পতরুঃ
৯। ধাতুরূপ-কল্পতরুঃ (অপ্রকাশিত)
১০। সংস্কৃত-পরীক্ষাতরণিঃ (যন্ত্রস্থ)
১১। কাতন্ত্র-তদ্ধিতপরিশিষ্টম্
১২। কাতন্ত্রাখ্যাতপরিশিষ্টম্ (অপ্রকাশিত)
১৩। হিতোপদেশীয়-মিত্রলাভঃ।

১৪। কৃষ্ণমঞ্জরী
১৫। পুরোহিত প্রদীপঃ
(ত্রিবেদীয় সংস্কারকাণ্ড ও শ্রাদ্ধকাণ্ড)
১৬। কাশ্যপ-বংশ-ভাস্কর
(বঙ্গভাষায়)
১৭। দেবনাগর বর্ণপরিচয়ঃ
ইত্যাদি।

৺গদাধর তর্কসিদ্ধান্ত

ইনি ৺পুরুষোত্তম ন্যায়ালঙ্কারের তৃতীয় পুত্র। ইঁহার পুষ্করিণী, পুরাতন দালান ও ঘাটলার ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান আছে। ইঁহার শিষ্যবিভাগের একটী তালিকা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, ১১৫০ সালে (১৬৬৫ শকে, ১৭৪৩ খ্রীঃ) তাঁহার শিষ্যবিভাগ হইয়াছিল। ঐ সময়ে তাঁহার পিতা ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় বর্ত্তমান ছিলেন। ইঁহার নিকট হইতে চন্দ্রমণি দত্ত নামে এক ব্যক্তি ১৭৲ সতর টাকা কর্জ নেয়, তাহার তারিখ ১১৮৪ সন ২৪শে ফাল্গুন (১৬৯৯ শক, ১৭৭৭ খ্রীঃ)। ইহাতে সহজেই বুঝা যায় যে, শিষ্য বিভাগের সময় (১১৫০ সালে) তাঁহার বয়স অন্যূন ৫০ বৎসর হইলে, টাকা কর্জ দিবার সময় (১১৮৪ সালে) তাঁহার বয়স ৮৪ বৎসর হইয়াছিল। সুতরাং তিনিও যে দীর্ঘজীবী ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

৺গদাধর তর্কসিদ্ধান্তের পুত্র ৺কৃষ্ণনাথ ন্যায়ভূষণ তাঁহার পৌত্র শ্রীকান্ত শর্ম্মাকে যে যৌতুক দিয়াছিলেন, তাহার লিপিকাল ১২২১ সাল ৩রা ফাল্গুন (১৭৩৬ শক, ১৮১৪ খ্রীঃ)।

কৃষ্ণনাথ ন্যায়ভূষণ কর্ত্তৃক শিবপুরাণের উত্তর-খণ্ডের লিপিকাল সম্বন্ধে লিখিত আছে—

পদ্মযোনি-মুখাম্ভোজ-অঙ্কর্ত্তেন্দু গতে শকে।
পুরাণস্যোত্তরখণ্ডঞ্চ শিবাখ্যং হি দ্বিজম্মনা॥
তপস্য ষড়্ দশে ঘস্রে শ্রীকৃষ্ণনাথশর্ম্মণা।
ব্যলেখি যত্নতো যস্য শ্রবণান্মুক্তিমাপ্নুয়াৎ॥

ইহাতে বুঝা যায়, ১৬৯৪ শকে (১১৭৯ সালে, ১৭৭২ খ্রীঃ) ফাল্গুন মাসের ১৬ই তারিখে ঐ গ্রন্থ লেখা হয়। ঐ সময়ে তাঁহার বয়স অন্ততঃ ৪০ বৎসর হইলে এবং তাহার পিতা গদাধরের ৪০ বৎসর বয়সে তিনি জন্ম গ্রহণ করিলে, তাঁহার পিতার বয়স তখন ৮০ হয়। পূর্ব্বোক্ত টাকা কর্জ দেওয়ার নিদর্শনে তিনি ১৬৯৯ শক পর্য্যন্ত জীবিত থাকায় গদাধরের বয়স তখন ৮৫ বৎসর হইয়াছিল, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এই বংশের খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ—

৺আনন্দমোহন শিরোমণি

ইনি স্বনামখ্যাত মহাপুরুষ। ইনি পাথেয় না লইয়াই বাটী হইতে কলিকাতায় আসিয়া ৺কালীঘাটে বাস করেন ও বিশেষ প্রতিষ্ঠিত হন। ইনি নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন। নিজের পুরুষকারের বলেই ৺কালীঘাটে পাকা বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

৺কৃষ্ণকুমার বেদরত্ন

ইঁহার একটী চতুষ্পাঠী ছিল। ইনি অনর্গল সংস্কৃত ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিতে পারিতেন। ইনি একখানি সংস্কৃত নাটক লিখিয়াছিলেন।

৺অশ্বিনীকুমার ন্যায়রত্ন

ইনি সংস্কৃত ভাষায় অনর্গল কথাবার্ত্তা বলিতে পারিতেন। নানা শাস্ত্রে ইহার অভিজ্ঞতা ছিল। ইনি বুদ্ধিমান্ ও মিষ্টভাষী ছিলেন।

৺ভুবনেশ্বর বিদ্যাভুষণ

ইনি ৺পুরুষোত্তম ন্যায়ালঙ্কারের ৪র্থ পুত্র। ইনি শিবমন্দির ও শিব-প্রতিষ্ঠা করিয়া কীর্ত্তিমান্ হইয়াছিলেন। ইঁহারও শিষ্য বিভাগের একখানি কাগজ পাওয়া গিয়াছে। তাহার লিপিকাল ১১৬১ সাল (১৬৭৬ শক, ১৭৫৪ খ্রীঃ)। সুতরাং এই সময়ে তাঁহার বয়স ৫৭।৫৮ বৎসর হইয়াছিল। ইনিও দীর্ঘজীবী ছিলেন বলিয়া শুনা যায়। এই বংশের খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ—

৺পদ্মাচরণ ভট্টাচার্য্য

ইনি একজন ভাল তান্ত্রিক ও তাপস বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইনি ৺দশ মহাবিদ্যার মৃন্ময়ী মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। এই মূর্ত্তিগুলি দেখিবার জন্য এখানে বহু লোকের সমাগম হইত।

শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর জ্যোতির্ভূষণ

ইনি পিতার প্রতিষ্ঠিত মৃন্ময়ী ৺দশমহাবিদ্যার মূর্ত্তি ভগ্ন হইলে, পিতৃপথানুবর্ত্তী হইয়া, অষ্টধাতু নির্ম্মিত ৺দশমহাবিদ্যার মূর্ত্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইনি ভাগবত ও মহাভারতের পারায়ণ করিয়া তুলাপুরুষ দান করিয়াছেন। ইনি বুদ্ধিমান্, মিষ্টভাষী, সৎকর্ম্মান্বিত ও পরোপকারী। ইনি পিতা ও মাতার শ্মশানক্ষেত্রে অতি সুন্দর সমাধি-মন্দির স্থাপিত করিয়াছেন।

৺নিস্তারিণী দেবী

যজুর্ব্বেদীয় কাশ্যপবংশাবলীতে এমন অনেক প্রাতঃস্মরণীয়া মহীয়সী মহিলার নাম কীর্ত্তন করা যাইতে পারে, যাহাদের অসামান্য স্নেহ, দয়া, পরোপকার, পাতিব্রত্য ও সদাচারনিষ্ঠার দ্বারা কাশ্যপবংশ পবিত্র হইয়াছে। এই বংশের খ্যাতনামা সাধু ও পণ্ডিতগণ যাহাদের গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সেই রত্নগর্ভা রমণীগণের কীর্ত্তি-কাহিনী কীর্ত্তন করা পুনরুক্তির ন্যায় বিবেচনা করিয়া তাহা হইতে বিরত হইয়াছি। পুরাতন কালের কথা বাদ দিয়া বর্ত্তমান কালের একটী মনস্বিনী মহিলার কথা উল্লেখ করিব, ইঁহার নাম নিস্তারিণী দেবী। ইনি চাঁদসী গ্রামের ন্যায়ালঙ্কারের বংশধর ৺চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক ১১ বৎসর বয়সে পারিণীতা হন। ১২৬৬ সালে কোটালীপাড়ার অন্তর্গত ফেরধরা গ্রামে ইহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম ৺গোপীকান্ত ভট্টাচার্য্য। ইনি বিবাহের পর হইতেই স্বামী গৃহে থাকিয়া সুশৃঙ্খলার সহিত সাংসারিক কার্য্য সকল সম্পাদন করিয়াছেন। ইনি তেজস্বিনীও মহাপ্রাণা ছিলেন। পরের দুঃখ দেখিলে ইহার প্রাণ গলিয়া যাইত, চক্ষু দিয়া জল পড়িত। ইহার আর্থিক অবস্থা ভাল না হইলেও, ইনি

সাধ্যানুসারে পরের উপকার করিতেন। ইহার ৩টী পুত্রও ৪টী কন্যা হয়। ১৩১৮ সালের ১৬ই পৌষ ৩টী পুত্র ও ২টী কন্যা নিয়া ইনি বিধবা হন। প্রায় ২০ বৎসর কাল তিনি সেবা কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। দেশের সর্ব্ববিধ সৎকার্য্যে ইহার উৎসাহ ছিল, এবং পুত্রগণকেও ঐরূপ কার্য্যে যোগদান করিবার জন্য উপদেশ দিতেন। ইনি সর্ব্বভূতে সমজ্ঞানে আমরণ কাল ঐকান্তিকতার সহিত সেবাকার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন, সুতরাং পশুপক্ষীগণও এই সেবা পাইতে বঞ্চিত হয় নাই। ইনি সদ্যঃপ্রসূত মাতৃহীন ছাগশিশুকে দ্বাদশবর্ষাধিক কাল সন্তানের ন্যায় প্রতিপালন করিয়াছেন, এবং পিতৃমাতৃহীন বালকবালিকাদিগকে সন্তানের ন্যায় প্রতিপালন করিয়া বর্দ্ধিত করিয়াছেন। মৃত্যুর নিশ্চয়তা বুঝিতে পারিয়াও ইনি অবিচলিতচিত্তে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে গীতা দান করিয়া পারলৌকিক মঙ্গল কামনা করিয়াছেন।

ইনি ১৩৩৪ সালে পতিকুল-প্রতিষ্ঠিতা কুলদেবতার পাষাণময়ী মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা এবং নানাতীর্থ পর্য্যটন ও ব্রত, দানাদি সৎকার্য্যনিচয়ে জীবনের কর্ত্তব্য শেষ করিয়া ১৩৩৯ সালের ২২শে আষাঢ় রাত্রি ৯—২০ মিনিটের সময় ৭৩ বৎসর বয়সে ইষ্ট নাম স্মরণ করিতে করিতে নিত্যধামে গমন করিয়াছেন।

যজুর্ব্বেদীয় কাশ্যপবংশাবলীর যে সজ্ক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা হইল, তাহাতে দেখা যায়, বর্ত্তমান সময়েও এই বংশে মোট ৬৩ জন অধ্যাপক এবং ২৩ জন উচ্চ ইংরেজী বিদ্যায় শিক্ষিত ব্যক্তি শিবরাত্রির সলিতার ন্যায় নির্ব্বাণোন্মুখ বংশগৌরবের অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছেন। বর্ত্তমান অধ্যাপক ও ইংরেজী শিক্ষিতগণের সংখ্যা নিম্নে লিখিত হইল। যথা—

বংশপরিচয় ও স্থান	অধ্যাপক	উচ্চ ইংরেজীশিক্ষিত
চূড়ামণির সন্তান (কোটালীপাড়া)	৭	৩

ন্যায়াচার্য্যের ধারা		
অবিলম্বের সন্তান	৬	৩
(কোটালীপাড়া)		
বিশ্বনাথের সন্তান	৪	•
(কোটালীপাড়া)		
রঘুনাথের সন্তান	১১	৬
(কোটালীপাড়া)		
ধরণীধরের সন্তান	৪	৩
(বাটাজোড়)		
চন্দ্রশেখরের সন্তান	২	•
(কোটালীপাড়া ও বারৈখালী)		
কেশবচন্দ্র ন্যায় পঞ্চাননের সন্তান	২	•
(কোটালীপাড়া)		
তর্কালঙ্কারের সন্তান	৯	১
(কোটালীপাড়া)		
বিদ্যালঙ্কারের সন্তান	৫	১
(কোটালীপাড়া)		
ন্যায়ালঙ্কারের সন্তান	১৩	৬
(চাঁদসী)		
মোট	৬৩	২৩

এই তালিকা দৃষ্টে দেখা যায়, বর্ত্তমানে অধ্যাপকের সংখ্যা চাঁদসী গ্রামেই বেশী। ইংরেজী শিক্ষিতের সংখ্যাও কেবল রঘুনাথের সন্তানেই চাঁদসীর সমান। অন্যান্য সকল বংশেই চাঁদসী অপেক্ষা কম।

সমাপ্ত।

"কাশ্যপ-বংশ-ভাস্কর" গ্রন্থ প্রকাশের জন্য অর্থসাহায্য-কারীগণের নাম ও সাহায্যের পরিমাণ।

শ্রীযুক্ত	দেবেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ (চাঁদসী) ··· ···	৩০৲
,,	গঙ্গাধর জ্যোতির্ভূষণ, মাং—	
,,	নিশিকান্ত ভট্টাচার্য্য (ভবানীপুর) ··· ···	২৫৲
,,	সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (কালীঘাট) ··· ···	২০৲
,,	কুঞ্জবিহারী ভট্টাচার্য্য বি, এ, (কলিকাতা) ···	২০৲
,,	কবিরাজ সুরেন্দ্রমোহন কাব্যতীর্থ (কলিকাতা) ··· (প্রিন্সিপাল অষ্টাঙ্গ-আয়ুর্ব্বেদবিদ্যালয়)	২০৲
,,	পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি, এল, (কালীঘাট) ···	১৭৲
,,	অসীমকৃষ্ণ মিত্র (কলিকাতা) ··· ···	১৫৲
,,	জ্ঞানদাকণ্ঠ চক্রবর্ত্তী, মাং—	
,,	চিন্তাহরণ কাব্যতীর্থ এম্, এ, (কালীঘাট) ···	১০৲
,,	সুরেশচন্দ্র কাব্যতীর্থ (বালীগঞ্জ) ··· ···	১০৲
,,	হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ, বি, এল, (এটর্নি হাইকোর্ট)	১০৲
,,	বিশ্বেশ্বর বিদ্যারত্ন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ (ভবানীপুর)	১০৲
,,	মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় বি, এ, (রাণীগঞ্জ) ···	৮৲
,,	কালীকুমার ভট্টাচার্য্য (টালা) ··· ···	৫৲
,,	লক্ষ্মীকান্ত কাব্য-ব্যাকরণ সাংখ্যতীর্থ (ভবানীপুর)···	৫৲
,,	কালীকুমার জ্যোতির্ভূষণ (কালীঘাট) ···	৫৲
,,	মনোরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ (কলিকাতা)	৫৲
,,	জানকীনাথ কাব্যরত্ন (কোটচাঁদপুর) ···	৫৲
,,	কালিদাস বিদ্যাবিনোদ (কোটালীপাড়া) ···	৫৲
,,	রাধানাথ দত্ত ও রুক্মিণীকান্ত দত্ত (কলিকাতা) ···	৪৲
,,	কালীকুমার কাব্যতীর্থ বি, এ, (ঘাটাল) ···	৪৲
,,	কৃষ্ণকুমার কাব্যতীর্থ (বগুড়া) ··· ···	২৲
,,	জনার্দ্দন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ (ওলপুর) ···	২৲
,,	অরবিন্দকৃষ্ণ দেব বাহাদুর (কলিকাতা) ···	২৲

শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার ভট্টাচার্য্য বি, এ, (কলিকাতা)	...	২৲
,, নিবারণচন্দ্র ভাগবতভূষণ (কলিকাতা)	...	২৲
,, কালীচরণ স্মৃতি-পুরাণতীর্থ (আগরপাড়া)	...	২৲
,, রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী এম্, এ, (কলিকাতা)	...	২৲
,, শীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (কলিকাতা) ...	...	২৲
,, বিধুভূষণ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ (ভদ্রকালী)	...	১৲
,, টীকেন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায় বি, এ, (কলিকাতা)	...	১৲
,, প্রতাপচন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতিতীর্থ (কলিকাতা)	...	১৲
,, যোগেন্দ্রমোহন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ (কলিকাতা)	...	১৲

বিশেষ দ্রষ্টব্য—

শ্রীযুক্ত সীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ সম্পাদিত পুস্তকের তালিকা।

১। কাতন্ত্রসূত্রম্ ।৶০
২। কাতন্ত্রগণমালা (মূল) ।০
৩। কাতন্ত্রগণমালা "শিশুবোধিনী"টীকাসহ ১।০
৪। সন্ধিবৃত্তিঃ (বঙ্গানুবাদসহ) ॥০
৫। চতুষ্টয়বৃত্তিঃ (নামপ্রকরণ) (বঙ্গানুবাদসহ) ১৲
৬। চতুষ্টয়বৃত্তিঃ (শেষ খণ্ড) টীকা, পঞ্জী, কবিরাজ, সঞ্জীবনী ও বঙ্গানুবাদসহ ৩।০
৭। কাতন্ত্র সঞ্জীবনী (ধাতুসূত্র, সর্ব্বনামসূত্র ও নমস্কারপাদের পঞ্জী এবং কবিরাজসহ) ১৲
৮। শব্দরূপ কল্পতরুঃ ৷৵০
৯। সংস্কৃত-পরীক্ষাতরণিঃ (যন্ত্রস্থ)
১০। হিতোপদেশীয় মিত্রলাভঃ ১।০
১১। কৃদমঞ্জরী ৵০
১২। পুরোহিত প্রদীপঃ (১ম খণ্ড, ত্রিবেদীয় সংস্কারকাণ্ড) ২৲
১৩। পুরোহিত প্রদীপঃ (২য় খণ্ড, ত্রিবেদীয় শ্রাদ্ধকাণ্ড) ২॥০
ঐ দুই খণ্ড একত্র ৪৲
১৪। কাশ্যপ-বংশ-ভাস্কর (বঙ্গভাষায়) ২।০
১৫। দেবনাগর বর্ণপরিচয়ঃ ৵১০
১৬। সামবেদ (আগ্নেয়পর্ব্ব) সভাষ্য ॥০